আধুনিক ত্রিপুরা

প্রসঙ্গ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য

১৩৩৩-১৩৫৭ ত্রিং

১৯২৩-১৯৪৭ ইং

ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী

অক্ষর পাবলিকেশনস্

প্রধান কার্যালয়ঃ জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

(adhunik tripura prasanga birbikram kishore manikya
1333-1357 tring 1923-1947
by Dr. Dwijeandra Narayan Goswami)

ISBN- 81-89742-49-3

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৮

প্রচ্ছদ : স্বপন নন্দী

অক্ষর সংস্থাপন ও মুদ্রণ : ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, আগরতলা, ত্রিপুরা

□

অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা,
ত্রিপুরা এবং ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কলকাতা-১২ থেকে একযোগে প্রকাশিত।

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'বইঘর' ও অক্ষব সেলস্ কাউন্টার জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

কলকাতা কেন্দ্র : ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

সার্বিক যোগাযোগ

অক্ষর পাবলিকেশনস, "সঞ্জীব ভিলা", জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা -৭৯৯০০১

দূরভাষ □ ২৩০-৭৫০০, ২৩২-৪৫০০,

মূল্য □ ৭৫ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দত্ত, ত্রিপুর যক্ষ
সমীপেষু

সূচিপত্র

বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য

যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর ও যুবরাণী অরুন্ধতী দেবীর পুত্র বীরবিক্রম ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে আগস্ট জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে নভেম্বর বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের রাজ্যভিষেক অনুষ্ঠানে বাংলার ডেপুটি গভর্ণর লেনসিউলেট এবং মণিপুরের রাজা চূড়াচাঁদ সিংহ উপস্থিত ছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানেই গণ্যমান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বীরবিক্রম কিশোরকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন।'' যেহেতু ত্রিপুর রাজবংশের খান্দানের নিয়মানুসারে এ পক্ষের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ যুবরাজ নিয়োগ করা আবশ্যক, এবং এ পক্ষের পুত্র মহারাজকুমার শ্রী ল শ্রীমান বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মাকে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে, অত্রএব অদ্য উক্ত শ্রীল শ্রীমানকে উল্লিখিত পদে নিয়োগ করা গেল। হুকুম হইল যে অবগত্যর্থে ইহার প্রতিলিপি পলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেব সদনে এবং রাজগী ও জমিদারীস্থ প্রধান ২ অফিসে হায়ে প্রেরণ করা যায়, ইতি।[১] এই ঘোষণার তারিখ ১৩১৯ ত্রিপুরাব্দের ৯ ই অগ্রহায়ণ। সে সময়ে বীরবিক্রম এক বৎসরের বালক।

দেশীয় রাজ্যের রাজপুত্রের দেশের সাধারণ বা বিশেষ স্কুলে লেখাপড়া করাবার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের আপত্তি ছিল। তাঁদের ব্রিটিশ গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে উপযুক্ত করে আজমীড়ের রাজ কলেজে বা ঐরূপ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত স্কুলে পড়ান হত। ফলে রাধাকিশোর মাণিক্যের পুত্র ব্রজেন্দ্র কিশোর নিজে অত্যন্ত আগ্রহী হলেও বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে লেখাপড়া করতে পারেন নি। বীরবিক্রমের ক্ষেত্রেও সেজন্য ইউরোপীয় গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হল। এই শিক্ষকের নাম Lt Col.O.C.Pulley এবং তার পদবী হল Guardian Tutor। তাঁর তত্বাবধানে বীরবিক্রমের শিক্ষা ও প্রশাসনিক ট্রেনিং সমাপ্ত হয়েছিল। তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে Political Agent ও সমস্ত প্রকারের সহায়তা করেছিলন। পুলে সাহেবের সঙ্গে বীরবিক্রমের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও খুব ভাল ছিল। '' গুরু শিষ্যে গরমে থাকেন শিলং নগরে এবং শীতে থাকেন কুমিল্লাতে। ''[২] পুলে সাহেব বীরবিক্রমের বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ছিলেন। বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে

পত্রালাপে কর্ণেল পুলের উল্লেখ ও কর্মতৎপরতার বীরবিক্রমের প্রশাসনিক ট্রেনিং এর ব্যাপারে সহায়ক হবে বলে স্বয়ং বীর বিক্রম লিখেছিলেন।[৩] শিক্ষা সমাপনান্তে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ কালে যে অভিষেক উৎসব হয়েছিল তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে নির্বাহক সভা গঠন করা হয়েছিল তাতে সভ্যদের মধ্যে প্রথম নাম শ্রীযুত কর্ণেল পুলে অবশ্যই বীরবিক্রমের পুলে প্রীতির পরিচয় বহন করে। শ্রীযক্ত পুলেকে ইউরোপীয় অতিথি ক্যাম্পের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৪]

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ই আগস্ট বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য পরলোকগমন করেন। বীরবিক্রম তখন ১৫ বৎসরের বালক। ১৩৩৩ ত্রিং সনের ৩২ শে শ্রাবণ যুবরাজ বীরবিক্রমের এক রোবকারীতে জানা যায় -"যেহেতু ২৮ শে শ্রাবণ অপরাহ্ন ১ঘটিকায় পিতৃদেব মহারাজ" বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন, আমি খান্দানের রীতি ও এই রাজ বংশের চিরপ্রসিদ্ধ কুলাচার মতে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে তৎত্যজ্য রাজগী ত্রিপুরা এবং জমিদারী চাকলে রোশনাবাদ ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক দখলদার হইয়াছি। এইক্ষণ হইতে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে আমার পক্ষে পরিচালিত হইবে।"[৫] ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বীরবিক্রমকে ত্রিপুরার রাজারূপে স্বীকৃতি দেয় এবং ২২শে সেপ্টেম্বর রাজসভাতে স্বীকৃতিপত্র পাঠ করে জনগণের গোচরে আনা হয়।

বীরবিক্রমের ২০ বৎসর বয়স কালে ১৯ শে আগস্ট ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্যমতে রাজ্যভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বাংলার গভর্ণর Jackson সাহেব গণ্যমান্য অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ১২৫ টি স্বর্ণমোহর পেশকাশ রূপে ভারত সরকারের প্রতিনিধি গভর্ণরকে প্রদান করা হয়। গভর্ণর একটি মুক্তার হার উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। গভর্ণর রাজাকে সিংহাসনে বসাবার কালে ১৯ বার তোপধ্বনী করা হয়। রাজা ও গভর্ণর উভয়েই মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে বর্তমানে অদৃশ্য তুলসীবতী স্কুলের সামনের বাস্তাব দক্ষিণদিকের তোরণটির নামাকরণ করা হয়েছিল Jackson gate বলে।[৬] ২৯শে জানুয়ারী ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৫ই মাঘ ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দে) হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে বৈদিক রীতিতে বীর বিক্রমের পুনরায় রাজ্যভিষেক হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশাল জনস্রোতে আগরতলা নগরী ভরপুর হয়েছিল। অতিথিদের থাকা, খাওয়া ও আপ্যায়নের বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল। নগর পরিক্রমা, নগরকীর্ত্তন, ৮০ টি সুজ্জজিত হস্তীর পথ পরিক্রমা, নাচগান তৎসঙ্গে লক্ষীনারায়ণ পূজা, বেদমন্ত্র পাঠ, মণিপুরী কীর্ত্তন, উপধিদান, এবং দান-দক্ষিণা ভোজনে উৎসব সার্বিকভাবে ভারতীয় রূপ নিয়েছিল। উৎসবের অনুষ্ঠানসূচি ও কৃত্যকর্মাদি বিষয়ক রাজকীয় বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হল।[৭]

বীরবিক্রমের বিবাহ হয় ১৬ ই জানুয়ারী ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। পাত্রী কীর্তিমণিদেবী, অযোধ্যার নিকটবর্তী বলরামপুরের রাজদুহিতা। ১২ ই জানুয়ারী প্রচুর বরযাত্রী নিয়ে, হাজার খানেক হবে, বীরবিক্রম আগরতলা ত্যাগ করে রেলযোগে আখাউড়া থেকে চাঁদপুরে পৌঁছে, জলপথে গোয়ালন্দ পৌছে, সেখান থেকে রেলযোগে কলকাতা, কাশী, লক্ষ্মৌ হয়ে বলরামপুবে পৌছেন। ১৬ ই জানুয়ারী বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এত অতিথিদের জন্য বাসস্থান ও রসদ জোগান দেয়া হয়েছিল অতি আভিজাত্য সহকারে। বীরবিক্রম প্রচুর টাকা নগদ যৌতুক,

কয়েকলক্ষ টাকা, পান। দুইটি অতি বিশাল রূপার থালায় রূপার টাকা পরিবেশিত ছিল। ২৩শে জানুয়ারী বরযাত্রী সহ রাজারানী আগরতলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই বিবাহের ফলে ভারতের পূর্ব প্রান্তের নবক্ষত্রিয় এক নৃপতির সঙ্গে আর্যবর্ত্তের প্রধান প্রাচীন ক্ষত্রিয় পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হবার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের সামাজিক মান ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই বিবাহ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি কারণ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২ রা নভেম্বর (১৩ ই কার্ত্তিক ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দ) তারিখে মহারানী কীর্ত্তিমনি দেবী পরলোক গমন করেন। অতঃপর রাজার পুণরায় বিবাহের উদ্যোগ নেয়া হয়। এবারের পাত্রী কাঞ্চন প্রভাদেবী, মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহুর নিকটবর্তী পান্নারাজ যাদবেন্দ্র সিংহের কন্যা। ২৮শে মে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে) এই বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়।[৮]

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ ত্রিং সনে (১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) কলকাতায় ভূমিষ্ঠ হয় বীরবিক্রম ও কাঞ্চনপ্রভার পুত্র কিরীট বিক্রম। ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৪০ খৃষ্টব্দে (২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ত্রিং) বীরবিক্রম কিরীট বিক্রমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রাজকীয় নিমন্ত্রণপত্র নিম্নরূপ -

" বিহিত সম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন-

সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের আগামী ২৯ শে অগ্রহায়ণ (১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪০ইং) তারিখে স্বাধীন ত্রিপুরার চিরাচরিত খান্দানে এবং শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী মদীয় পুত্র পরম কল্যাণবর মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীমান কিরীট বিক্রম কিশোর দেববর্মার ত্রিপুরার যৌবরাজ্যে শুভাভিষেক সংক্রান্ত দরবার ও উৎসবাদি অত্র রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হইবে।

অতএব বিনীত প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক উক্ত শুভানুষ্ঠানে উপলক্ষে মমালয়ে আগমন করতঃ উৎসবের শ্রাবর্দ্ধন করিয়া অনুগৃহীত ও কৃতাথ করিলে অত্যন্ত আনন্দের কারণ হইবে, ইতি সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ১৪ কার্ত্তিক।

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ　　　　শ্রী বীরবিক্রম মাণিক্য"[৯]

রাজধানী আগরতলা

ত্রিপুরা রাজ্য

ত্রিপুরার রাজা হিসাবে বীরবিক্রম ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সম্মানিত ক্যাপ্টেন, লেফটান্যান্ট কর্ণেল, এবং কর্ণেল উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁকে K.C.S.I(Knight Commander of star of Indian Empire) ১৩৪৫ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯৩৫খৃঃ দেয়া হয়েছিল করন ১৩৪৫ ত্রিংসনের ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের এক মেমোতে দেখা যায় ঐ সম্মান প্রদান উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করার জন্য ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ রাজ্যে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল।[১০] ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষ উপলক্ষে তাঁকে G.B. E উপাধিতে ভূষিত করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ফলে যথারীতি রাজ্যে ২৩ শে পৌষ সোমবার ১৩৫৫ ত্রিং সনে আনন্দ প্রকাশের জন্য অফিস আদালত ও স্কুল ও জমিদারীতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল।[১১] স্যার উপাধি লেখা প্রথম ঘোষণা পত্র দেখা যায় ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দে এবং ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দে কার্ত্তিক মাসের ঘোষণাতে 'স্যার' উপাধি দেখা যায়

না।[১২] ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের পর থেকে সকল আদেশ ও ঘোষণা পত্রে 'স্যার' উপাধি লিখিত হয়েছিল দেখা যায়। ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের ২ রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ ই মে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে) তারিখে তাঁর মহাপ্রয়ান ঘটে।

-ঃ তথ্য নির্দেশ ঃ-

১। দত্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ও সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় (সম্পা) ঃ রাজগী ত্রিপুরা সরকারী বাংলা, আগরতলা, ১৯৭৬, পৃ ঃ৪১। পরে রাজগী।

২। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ ত্রিপুরার ইতিহাস, আগরতলা, ২০০০, পৃ ঃ১৭০।

৩। পরিশিষ্ট — দ্রষ্টব্য।

৪। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পূ.উ.পৃঃ ৫০

৫। ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ৪৯

৬। Sur H K .British Relation with the state of Tripura, Agartala, 1986.p.163.

৭। Abhishek Ceremony 29 th January, 1928,15 th Magh 1337 TE See Appendix-1

৮। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ পূ. উ. পৃঃ ১৭৭

৯। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পূ.উ.পৃঃ ৭৪

১০। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন, পৃ ঃ ২৮৭।

১১। ঐ ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ৩১০।

১২। ঐ ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ১৫১।

বীরবিক্রম ঃ পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক

ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদে কিছু সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী দেশান্তরী হয়েছিলেন বিশেষ করে বীরচন্দ্র মাণিক্য ও রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে। তাঁরা ব্যক্তিগত গুণে সমৃদ্ধ তো ছিলেনই এবং প্রশাসনিক দক্ষতাও তাঁদের ছিল। এই পারিবারিক বিবাদের ফলে তৎকালীন ত্রিপুরা বাজসরকার তাঁদের সেবায় বঞ্চিত হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য। দুই পুরুষ পরে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর তাঁদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন তাঁর ভ্রাতা ব্রজেন্দ্র কিশোর। বীরবিক্রমের আমলেও সে প্রয়াস অব্যাহত থাকে। এই নিবন্ধে সে সব পূর্বপুরুষ যথা নবদ্বীপ চন্দ্র, সমরেন্দ্র দেববর্মার, সঙ্গে বীরবিক্রমের সম্বন্ধের আলোচনা করা হবে। তাঁদের সঙ্গে ব্রজেন্দ্র কিশোরকেও অন্তর্ভূক্ত করা হল কেননা এই রাজপুত্র বীরবিক্রমের সমগ্রকাল ধরে রাজ্যের প্রশাসন তরণীর অন্যতম প্রধান কর্ণধার ছিলেন।

নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা ঃ নবদ্বীপ চন্দ্র ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র। ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর ত্রিপুরার রাজা হন তাঁর ভাই বীরচন্দ্র দেববর্মা। বীরচন্দ্র মাণিক্য রাজা হয়ে তাঁর ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীদের জন্য ত্রিপুর সিংহাসন দখল করার পথ নিষ্কন্টক করার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপকে নানা প্রকার উৎপীড়ন করে রাজ্য ত্যাগে বাধ্য করেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ বীরচন্দ্র' মাণিক্য গ্রন্থে করা হয়েছে।[১] বীরচন্দ্র মাণিক্যের পরে রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলেও নবদ্বীপ চন্দ্র উপেক্ষিত রাজপুত্র রূপে ব্রিটিশ ত্রিপুরার জেলা সদর কুমিল্লা শহরে বাস করতেন। সেকালে তিনি স্বীয় জনপ্রিয়তা ও কর্মকুশলতার জন্য কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন।[২] রাধাকিশোরের পুত্র বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে বীরেন্দ্র কিশোর নির্বাসিত বা রাজ্যের বাইরে বাসরত তাঁর পূর্বজ ত্রিপুর রাজপুত্রদের দেশে ফিরিয়ে এনে রাজ্যের উন্নতিকল্পে কাজ করবার সংকল্প নিয়ে ভ্রাতা ব্রজেন্দ্র কিশোরকে তাঁদের মনোভাব বুঝে সাদরে আমন্ত্রণ করার জন্য নিয়োগ করেন। উল্লেখ্য যে মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরও তাঁদের রাজ্যে ফেরাতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ব্রজেন্দ্র কিশোর রাজ্যের আর্থিক অবস্থায় উন্নয়ন, সুশাসন ও সংস্কার সাধনের জন্য নবদ্বীপ চন্দ্রের নিকট আবেদন জানালে তিনি

সম্মত হন এবং রাজ্যে ফিরে আসেন। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য তাঁকে রাজমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেছিলেন।[৩]

পারিবারিক সম্পর্কে নবদ্বীপচন্দ্র বীরবিক্রমের পিতামহ। বীরেন্দ্র কিশোরের মত বীরবিক্রমও তাঁকে মহাসমাদর করে রাজ্যের কল্যাণে বিভিন্ন উচ্চতম পদে নিযুক্ত করেছিলেন। বীরেন্দ্র কিশোরের মৃত্যুর সময়ে বীরবিক্রম মাত্র ১৫ বৎসরের বালক। সে জন্য নাবালকের পক্ষে রাজ্য শাসনের জন্য একটি শাসন পরিষদ গঠন করা হয়। " পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মণ মাণিক্য বাহাদুর স্বয়ং কার্য্যভার গ্রহণ করা সাপেক্ষে তৎপক্ষে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য পরিচালনার জন্য ভারত গভর্ণমেন্টের অনুমোদন মতে কাউন্সিল অব এডমিনিষ্ট্রেশন নামক একটি শাসন পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এবং পার্শ্বোক্ত ব্যক্তিগণ এই পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়া অদ্য ১৩৩৩ ত্রিপুরাব্দের ২৩ শে অগ্রহায়ণ তারিখে রাজ্য ও জমিদারী প্রভৃতির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ..... ইতি সন ১৩৩৩ ত্রিং ২৩ শে অগ্রহায়ণ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর প্রেসিডেন্ট

শ্রীযুক্ত রায় জ্যোতিষচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ,বি সি এস, ভাইস প্রেসিডেন্ট

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ বাহাদুর সদস্য।

শ্রীযুক্ত ঠাকুর প্রতাপ চন্দ্র রায় সদস্য।"[৪]

১৩৩৩ ত্রিং অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১.১২.১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত নবদ্বীপচন্দ্রের নেতৃত্বে শাসন পরিষদ সফলতার সঙ্গে অনেক কাজ করে কৃতিত্ব অর্জন করে। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে বিগত রাজ আমলের সমস্ত দেনা পরিশোধ, খাস আদালত গৃহ নির্মাণ, কারাগার নির্মাণ, মহাকরণের সম্প্রসারণ, আগরতলা আখাউড়া সড়ক নির্মাণ, বিশালগড়-উদয়পুর সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।

তারপরের ঘটনা বীরবিক্রমের রাজ্যভিষেক। বীরবিক্রম এই অভিষেক উৎসব উপলক্ষে সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবার উদ্দেশ্যে এক সভা গঠন করেন। এই সভার সাধারণ তত্বাবধায়ক রূপে নবদ্বীপচন্দ্রকে নিয়োগ করে সম্মান প্রদর্শন করেন-" শ্রী শ্রী যুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের শুভ অভিষেক সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা একটি সভা গঠিত হইল। উক্ত সভার তত্বাবধানে অভিষেক সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

সভাপতি -শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর

সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক-শ্রীল শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণ বাহাদুর"[৫]

অভিষেক কার্যাদি সম্পন্ন হবার পরে বীরবিক্রম রাজ্যে সুশাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রনা সভা (Advisory Council) গঠন করেন। এই মন্ত্রনা সভার মুখ্য ব্যক্তিরূপে নবদ্বীপচন্দ্রকে বহাল করে তিনি তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। ১৪ই ভাদ্র ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দের এক রোবকারীতে দেখা যায়-" যেহেতু রাজ্য ও জমিদারী সম্পর্কিত এপক্ষের আদেশ সাপেক্ষ গুরুতর বিষয়গুলির মীমাংসার সহায়তা কল্পে একটি মন্ত্র না সভা (Advisory Council) গঠন করা এ পক্ষের অভিমত, এতএব এতদ্বারা নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করা গেল। ১) নিম্নলিখিত ৫ জন সদস্যদ্বারা একটি মন্ত্রণা সভা গঠিত হইল ঃ-

(১) মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুত নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর

★ ★ ★ ★ ★

(২) এপক্ষ স্বয়ং সভাপতি হইবেন এবং মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা সভার সহকারী সভাপতি হইবেন।

★ ★ ★ ★ ★

(৪) ★ ★ এ পক্ষের অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি সভাপতির কার্য্য করিবেন।

★ ★ ★

(১০) আপাতত: দুই বৎসরের জন্য এ মন্ত্রণা সভা গঠন করা গেল।"[৬] রাজ্যশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপে বীরবিক্রম ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) গঠন করে। এখানেই নবদ্বীপচন্দ্রকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে নিযুক্ত ১৯ জন সদস্যগণের প্রথম জন রূপে নিযুক্ত করেন। ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দের ১৭ ই ভাদ্র তারিখের রোবকারীতে দেখা যায়-" যেহেতু একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হওয়া আবশ্যক, অতএব নিম্নলিখিত রূপ ব্যবস্থা সভা গঠন করা গেল ঃ-

১। এই সভার নাম ব্যবস্থাপক সভা বা Legislative Council হইবে।

★ ★ ★

২। নিম্নলিখিত সদস্যগণ দ্বারা এই সভা গঠিত হইল—

শ্রীল শ্রীযুত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর।

★ ★ ★

৫। শ্রীল শ্রীযুত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর ও শ্রীল শ্রীযুত মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বাহাদুর এই সভার সহকারী সভাপতির কার্য্য করিবেন।

৬। এ পক্ষের অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতিদের মধ্যে একজন সভাপতির কার্য্য নির্বাহ করিবেন।"[৭]

তারপরেই দেখা যাচ্ছে ৩ রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে বীরবিক্রম মন্ত্রী পরিষদ বা Executive Council গঠন করেন। এই মন্ত্রী পরিষদে নবদ্বীপচন্দ্রকে সভাপতি পদে নিযুক্ত করে প্রধান মন্ত্রীর মর্যাদার প্রদান করেন। " যেহেতু নিজ তহবিল ব্যতিত এ রাজ্য ও জমিদার সংসৃষ্ট এ পক্ষের করণীয় যাবতীয় কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত এ সমিতি গঠন হওয়া আবশ্যক, অতএব নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করা নেল ঃ-

১। এই সমিতির নাম মন্ত্রী পরিষদ বা Executive Council হইবে।

২। নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্য দ্বারা মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হইবে।

১। মহামান্যবর মহারাজ কুমার শ্রীল শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর সভাপতি"[৮]

★ ★ ★

এই পদে নবদ্বীপ চন্দ্র জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজ করেছেন। এখানে একটি বিভ্রান্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন। বীরবিক্রমের রাজত্বকালে রাজ্যের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ, উত্তম প্রশাসন, শিল্পী

প্রভৃতিদের বিশেষ উপাধি প্রদান করে সম্মান জানাবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। উপাধি প্রাপকদের রাজদরবারে উপস্থিত হবার কালে নির্দিষ্ট পোষাক পরিধানের নিয়মও নির্দিষ্ট করা হয়। উপাধি পদকেও অন্যান্য পরিচিহ্নদিতে সোনার জলে উপাধি নাম এবং " কিল বিদুর্বীররতা সারমেকং" লিখিত থাকত। এই মেমোটি ২ রা কার্ত্তিক ১৩৪৬ ত্রিপুরাব্দে ১৪ নং মেমো দ্বারা ঘোষিত হয়েছিল। -"যেহেতু এ রাজ্যের হিতসাধন কল্পে সদানিরত এবং রাজানুরক্ত প্রসিদ্ধ সুধীগণকে বিশেষ সম্মানসূচক ও গৌরবান্বিত চিহ্নে বিভূষিত করা এ পক্ষের অভিমত, অতএব আদেশ করা যায় যে, উপরোক্ত সদগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহারা এ পক্ষের বিশেষ সন্তোষভাজন হন, তাঁহাদিগকে উহার নিদর্শন স্বরূপ দরবার কর্তৃক 'মহামান্যবর' অথবা 'মান্যবর' উপাধিসহ নিম্নলিখিত পরিচিহ্ন (decoration) প্রদত্ত হইবে।"[৯] অথচ দেখা যায় ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের ৩ রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের রোবকারীতে নবদ্বীপ চন্দ্রকে "মহামাণ্যবর" বিশেষণ সহ উল্লেখ করা হয়েছে যদিও ১৩৪৬ ত্রিপুরাব্দের ঘোষণায় এই পদবী চালু করার কথা বলা হয়েছে, তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে বীরবিক্রমের পূর্বেও এরূপ উপাধি প্রদান প্রথা চালু ছিল? অবশ্যই প্রমাণের অভাবে সঠিক কিছুই বলা যাচ্ছে না।

মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হিসেবে কাজ করতে করতেই নবদ্বীপ চন্দ্রের জীবনাবসান হয়। ২৯ শে ভাদ্র ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে তিনি কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে। শোকাহত বীরবিক্রম তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে রাজ্যে তিনদিনের ছুটি ঘোষণা করেন। "স্বর্গীয় মহামান্যবর মহারাজ কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাহাদুর গতকল্য রাত্রে কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য রাজ্যের এ জমিদারীর যাবতীয় অফিস ইস্কুলাদি অদ্য ইহতে তিন দিবসের জন্য বন্ধ থাকিবে। ইতি ৩০/৫/৪১ ত্রিং।"[১০] বীরবিক্রম তাঁর এই পিতামহকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। সেজন্যই সম্ভবতঃ শোকাহত রাজা তিনদিনের জন্য সরকারী কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছিলেন যদিও জগৎপূজ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে বীরবিক্রম একদিবসের শোকপালন ও কর্মবিরতি ঘোষণা করেছিলেন।[১১]

সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা ঃ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রিয়পুত্র সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের কনিষ্ঠভ্রাতা, মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের খুল্লতাত এবং বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের খুল্লপিতামহ। রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে এই গুণী, শিল্পী, রাজপুত্র বড়ঠাকুর পদ হারিয়েছিলেন এবং রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর ও তাঁর ভ্রাতা ব্রজেন্দ্র কিশোর তাঁকে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন কিন্তু সমরেন্দ্রচন্দ্র ভ্রাতা রাজা রাধাকিশোরের আদেশ ভঙ্গ করবেন না বলে তাঁদের প্রস্তাবে অসম্মত হন। বীরেন্দ্র কিশোর সঙ্গে সমরেন্দ্র চন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালই ছিল। কারণ আমরা সাক্ষ্য পেয়েছি যে সমরেন্দ্রচন্দ্র ভাইপোদের স্নেহ করতেন। এবং বীরেন্দ্র কিশোর এই স্নেহের প্রতিদানে তাঁর মাসিক ভাতা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করেছিলেন।[১২]

স্বভাবতই ঃ বীরবিক্রম সমরেন্দ্রচন্দ্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অতীব গুণী, বিদ্বান, বহুমুখীকর্ম প্রতিভার অধিকারী সমরেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতাতে বর্তমান 'ত্রিপুরা হাউসে' বাস করতেন।

কারণ ঐ জমি ও বাড়ী বীরচন্দ্র মাণিক্য শেষ বয়সে সমরেন্দ্র চন্দ্রের নামেই কিনেছিলেন। রাজ্য থেকে নির্বাসিত রাজকুমার এ বাড়ীতেই উঠেন রাজ্যত্যাগের পরে। "বালিগঞ্জ সার্কুলার রোর্ডের বাড়ীটি মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে মহারাজা বীরচন্দ্র সমরেন্দ্র চন্দ্রের নামে কিনেছিলেন। তখন সাধাসিধে একটি বাড়ী ছিল। কিন্তু জমি ছিল অনেক। একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে নিলামে বাড়ীটি কিনেছিলেন তিনি। এ সম্পত্তি তাঁর নিজস্ব। এখানে নিশ্চিন্তে থাকার হক আছে এখানেই এসে উঠেছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন বড়ঠাকুর সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণ।"[৩]

বীরবিক্রমের সঙ্গে সমরেন্দ্র চন্দ্রের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি উভয়ের মধ্যে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে। এসব পত্রে দেখা যায় বীরবিক্রম ব্যক্তিগত ও রাজ্যের নানা সমস্যার ব্যাপারে 'দাদা' সমরেন্দ্রচন্দ্রকে অবহিত করতেন এবং ঐ সব সমস্যা সমাধানে তাঁর উপদেশ চাইতেন। একটি পত্রে বীরবিক্রম লিখেছেন—

"My dear Dada,

Received your affectionate letter I am very sorry to see your write" I have no connection with the state" Is it my fault? please kindly keep any connection with the state you like. Did you no hear 1) about the stamp forgery 2) the Manu vatial forgery 3) Nazar Misappropriation 4) rumer of Lushai raid 5) Thakur agitation. These are partially due to my long absence from the state. As it is my father's raj so it is your fathers raj. Am I not your grand child ? Kaka Lalu was really willing to do me some good but umfortunately he is in great trouble. H.E. the Governor has come to calcutta and he will soon decide about my administrative training. If you and kaka lalu can not help me now please tell me what I can do and where I can go for help. You might have heard that Calcutta High court recognised me as Major and Government also recognised me. ★

Yours affcctionately"[৪]

এই পত্র থেকে আমরা জানতে পারছি সমরেন্দ্র চন্দ্রের লিখিত পত্রের জবাবে বীরবিক্রম এই পত্র লিখেছেন। ১৯২৪ খ্রীঃ নাবালক থাকাকালে শাসন পরিষদের রাজ্যশাসনকালে স্টাম্প জালিয়াতি, মনুতে ভাটিয়ালা জালিয়াতি, নজরের প্রদত্ত অর্থ অবৈধভাবে আত্মসাৎ প্রভৃতি কেলেঙ্কারী ঘটেছিল যা সমকালীন কোন ইতিবৃত্তে প্রকাশ করা হয়নি বা গেজেটেও এব্যাপারে কোন বিজ্ঞপ্তি বা ঘোষণা দেখা যায় না। অপরদিকে ঐ সময়ে ঠাকুরদের আন্দোলন ও লুসাই আক্রমণের গুজব প্রভৃতির কথাও কোথায়ও আলোচিত হয়নি। ঠাকুরদেব আন্দোলন কি কারণে ঘটেছিল তাও আজ সাক্ষ্যের অভাবে জানা যাচ্ছেনা তাঁর প্রশাসনিক ট্রেনিং তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার বিষয় হলেও অন্য ঘটনাগুলি সামগ্রিকভাবে রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিল। সেজন্যই তিনি এব্যাপারে সমরেন্দ্র চন্দ্রকে জানিয়েছিলেন এবং নাতি সদৃশ অভিমান প্রকাশ করে তাঁর মন্ত্রণা ও সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। পত্র খানা ১৫ বৎসরের বালকের লেখা হলেও প্রমাণ করে যে ঐ বালক সে সময়েই রাজ্যের সমস্ত খবরাখবর রাখতেন এবং তাঁর বাস্তব বুদ্ধি তাঁকে বিজ্ঞজনের অভিমত জানতে প্ররোচিত করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

এবারে আমরা দেখছি সমরেন্দ্র চন্দ্র পৌত্রকে কি উপদেশ পাঠিয়েছিলেন। সমরেন্দ্র চন্দ্র লিখেছেন ঃ- "দাদা তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। স্টাম্প জাল ইত্যাদির বিষয় এই প্রথম তোমার পত্রে জানিলাম, ইহার পুর্বে শুনি নাই। যে বিষয়ে আমার নিকট লিখিয়াছ তাহা আমি এই বিদেশে থাকিয়া কি করিতে পারি ভাবিয়া পাইতেছি না। কলিকাতায় যদি থাকিতাম তবে অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতাম না। যাহা হউক এখান হইতে দুটি বিষয় বলিতেছি সঙ্গত বোধ করিলে করিতে পার — ১) লর্ড সিনহা শিলং-এ আছেন, তুমি নিজে যাইয়া তাহার নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করো। ২) কলিকাতায় একজন বিশ্বাসী পাঠাইয়া স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্র বোসের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে তাহাদের দ্বারা কোন রূপ সুবিধা হইতে পারে কি না ইহার বিশেষরূপে চেষ্টা করা। ইহা ব্যতীত সম্প্রতি আমি আর কিছু দেখিতেছিনা। আবার শসীবাবুর সহিত সুরেন্দ্রবাবুর বিশেষরূপে জানাশোনা আছে কলিকাতায় তাদের নিকট লোক গেলেই সে সমস্ত বিষয়ের সুবিধা করিয়া দিবে।"[১৫]...

উপরোক্ত পত্রখানা পুরী থেকে ৯ ই জুলাই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। সে সময়ে সমরেন্দ্র চন্দ্র পুরীতে "শতদল বাস" নামক বাড়ীতে থাকতেন। সে সময়ে সমরেন্দ্র রাজ্যে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমরেন্দ্র চন্দ্র পুর্বে না জানলেও কিছু পরেই নাতির কল্যাণে জানতে পেরেছিলেন কিন্তু আমাদের জানতে খুবই বিলম্ব ঘটে গেল ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে। পত্র প্রমাণ করে যে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভূপেন্দ্র চন্দ্র বসুর সঙ্গে ত্রিপুরার এই মাণিকের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু মাধ্যম 'সসীবোস' কে চিনতে পারা যাচ্ছে না।

তারপরের যে পত্র আমার হাতে এসেছে তা ১২ ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীঃ বীরবিক্রম শিলং থেকে লিখেছেন তাঁর প্রিয় 'দাদা'কে ঃ-

'Confedential'

My dear Dada,

I have received no letter from you for some time.I hope you are well and the son of Meama Hasthver Jung. I have come to know from Colonel Pulley that he and the Political Agent are called by H. E.the Governor to discuss about my administrative training.They are going to Darjeeling with in four or five days. It is needless to say that Col. Pulley will try to inforce his own views and this may be an opportunity for him . I hope you will try so that we may be successful. I have got nothing to say to you, you know everything. Only I request you to try for me and do what you can. If Kaka Lalu be at Calcutta please show him this letter. My pranamas to you . We are all well here.

Yours affcctionately
sd/B.B Manikya

P.S

I am sending this without stamp
because no time to register.[১৬]

B.B.M

পত্রে প্রশাসনিক ট্রেনিং পাবার জন্য তাঁর উৎসাহ ও উদ্বিগ্নতা লক্ষণীয়, সেজন্য 'দাদা'সমরেন্দ্র চন্দ্রকে অনুরোধ করেছেন যেন তিনি তাঁর যোগাযোগ সূত্র কাজে লাগিয়ে গভর্ণরকে প্রভাবিত করতে পারেন। এব্যাপারে 'কাকা' লালুকে এই গোপনীয় পত্র দেখাবার উদ্দেশে তাঁর সাহায্যও কাজে লাগান। যদিও আমরা জানতে পারছি না সমরেন্দ্র চন্দ্র কি করেছিলেন কিন্তু সে সময়েই বীরবিক্রমকে প্রশাসনিক ট্রেনিং -এ পাঠান হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে যে সমরেন্দ্র চন্দ্রের চেষ্টা সফল হয়েছিল। এই পত্রে আমরা জানতে পারি যে, সে সময়ে সমরেন্দ্র চন্দ্র ৫৯-এ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বাস করতেন যে বাড়ী বর্তমানে 'ত্রিপুরা হাউস' নামে পরিচিত। সেই ঠিকানাতেই স্টাম্পবিহীন পত্র বীরবিক্রম 'বড়ঠাকুর' সমরেন্দ্র চন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন অর্থাৎ পিতামহ মহারাজ রাধাকিশোর কর্তৃক সমরেন্দ্র চন্দ্রের বড় ঠাকুর হুদ্দা বাতিল হওয়া সত্বেও বীরবিক্রম তাঁকে ত্রিপুরা রাজ্যের'বড়ঠাকুর' বলেই শ্রদ্ধা করতেন। তারপরের আর কোন পত্র আমাদের হাতে নেই। নিশ্চয়ই পত্র লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায়নি কিন্তু সে সব উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁদের সম্পর্কের বিস্তার ও পরিণতির বিষয়ে কিছু জানতে পারছি না। তবে উভয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ছিল তার প্রমাণও আমরা পাই যখন সমরেন্দ্র "মৃত্যুর পূর্বের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোর্ডের বাড়ীটি বীরেন্দ্র কিশোরের পুত্র বীরবিক্রম কিশোরকে দান করে গিয়েছিলেন।"[১৭]

ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ (লালুকর্ত্তা) ঃ ব্রজেন্দ্র কিশোর রাধাকিশোর মাণিক্যের পুত্র, বীরেন্দ্র কিশোর মাণিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং বীরবিক্রম কিশোরের 'কাকা লালু'। বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী পদে কাজ করে ভ্রাতা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরকে সাহায্য করলেও পরে মত বিরোধের ফলে ব্রজেন্দ্র কিশোর পদত্যাগ করে রাজ্য ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। এই মতবিরোধ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা'আধুনিক ত্রিপুরা-প্রসঙ্গ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য' গ্রন্থে করা হয়েছে।[১৮] কিন্তু পরে আবার রাজ্যে ফিরে আসেন সম্ভবতঃ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কারণ ১৩২৭ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সাক্ষরিত একটি মেমো দেখা যায়।[১৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩২৬ বঙ্গাব্দে আগরতলা ভ্রমণের কালে ব্রজেন্দ্র কিশোর আগরতলায়, অনুপস্থিত ছিলেন। কবিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য। কিন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্র কিশোরের মৃত্যুর পরে যে কাউন্সিল অব এডমিনিস্ট্রেশন গঠন করা হয়েছিল ব্রজেন্দ্র কিশোর তার অন্যতম সদস্যছিলেন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পাঁচ সদস্যের ঐ কাউন্সিলে মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র প্রেসিডেন্ট এবং ব্রজেন্দ্র কিশোর সাধারণ সদস্য ছিলেন।[২০]

বীববিক্রম রবীন্দ্র লালিত তাঁর এই পিতৃজকে অত্যন্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন। নিজের পারিবারিক ও রাজনৈতিক উভয় জীবনেই তিনি 'কাকা লালু'কে অভিভাবক স্বরূপ মনে করতেন। তাঁর কাকা সম্পর্কে উক্তি আমরা সমরেন্দ্র চন্দ্রকে লেখা পত্রাবলীতে পেয়েছি। উচ্চমননশীলতার অধিকারী, বিবিধগুণ সম্পন্ন এই ব্যক্তিত্বকে বীরবিক্রম নিজের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজকীয় পদে ব্যবহার করেছেন। শাসন পরিষদ বা এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ৯.৯.১৯২৩-১৩.৮.১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। কারণ তারপরেই বীরবিক্রম অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন। রাজকীয় অভিষেক উপলক্ষে যে কার্য নিবারক সভা বীরবিক্রম গঠন করেছিলেন তাতে ব্রজেন্দ্র কিশোরকে সহকরী সভাপতি পদে নিয়োগ করে তাঁকে

সাজসজ্জা, আমোদ প্রমোদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক ও গেষ্টক্যাম্প সমূহের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন।[২১]

রাজ্যভার গ্রহণ করে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বীরবিক্রম ১৪.৫.১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দে যে Advisory Council গঠন করেছিলেন তার ২নং সদস্য ছিলেন মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ বাহাদুর।[২২] Advisory Council প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রণা সভা। ৩.২.১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে বীরবিক্রম মন্ত্রী পরিষদ বা Executive Council গঠন করেন। উহাতে নবদ্বীপচন্দ্রকে সভাপতি পদ দিয়ে ব্রজেন্দ্র কিশোরকে সহকারী সভাপতিপদে নিযুক্ত করেছিলেন।[২৩] সভাপতি এবং সহকারী সভাপতির কোন নির্দিষ্ট Protfolio ছিলে না কিন্তু তাঁরা সমস্ত বিভাগের কর্মাধ্যক্ষদের উপদেশ, পরামর্শ তত্বাবধান (Supervise)করে শাসনকার্য পরিচলনা করতেন। তারপরেই ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দের ১৭ই ভাদ্র এক রোবকারী দ্বারা বীরবিক্রম ব্যবস্থাপক সভা বা Legislative Council গঠন করেন। উক্ত ব্যবস্থাপক সভাতে রাজা ব্রজেন্দ্র কিশোরকে সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত করেছিলেন।[২৪] ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের ৩রা জ্যৈষ্ঠ বীরবিক্রম Executive Council বা মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। এই মন্ত্রীপরিষদে ব্রজেন্দ্র কিশোরকে সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত করেছিলেন।[২৫] এই মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ জন কিন্তু সভাপতি বা মহসভাপতির জন্য কোন নির্দিষ্ট Portfolio উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবতঃ অন্য মন্ত্রীগণ তাঁদের পরামর্শে ও তত্বাবধানে নিজ নিজ বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করতেন। ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ৭ ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের রোবকারীতে দেখা যায় বীরবিক্রম প্রিভি কাউন্সিল (মন্ত্রনা সভা বা রাজসভা) গঠন করেন —" যেহেতু এপক্ষের ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের ১ লা বৈশাখ শাসন সংস্কার বিষয়ক ১৬২ নং ঘোষণা অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের সুশৃঙ্খল শাসন ও বিচার কার্য এপক্ষের সহায়তা কল্পে রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল মন্ত্রণা সভা অবিলম্বে গঠন করা আবশ্যক।

অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিত সদস্যগণ দ্বারা আপাততঃ ১ বৎসরের জন্য রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল গঠন করা হইল। সদস্যগণ ঃ

মহামান্যবর মহারাজ কুমার শ্রীল শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ বাহাদুর রাজসভার সদস্যগণ রাজসভা ভূষণ আখ্যায় অভিহিত হইবেন এবং বিশেষ দরবারী বলিয়া গণ্য হইবেন। আগামী মহানবমী দরবারে তাহারা শপথ গ্রহণ করিবেন।"[২৬] রাজসভার মোট সদস্যসংখ্যা ছিল বারো উক্ত রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিলের নিম্নলিখিত ৫ জন সদস্য দ্বারা খাস আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীলের পক্ষাপক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এ পক্ষ সদনে অভিমত প্রদান করার জন্য একটি ব্যবহারিক কমিটি (Judicial Committee) গঠিত হইল। এই কমিটির কার্য প্রণালী বর্তমানে প্রচলিত প্রিভি কোউন্সিল এবং সাক্ষাৎ আপিল সংক্রান্ত বিধি বা ১৩২৬ ত্রিঃ সনের ১ আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

সদস্য

মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বহাদুর"।[২৭]

এখানে একটি ব্যাপারে লক্ষণীয় যে ব্রজেন্দ্র কিশোরের নামের পূর্বে "মহামান্যবর" উপাধি

লিখিত হয়েছে কিন্তু কবে তাঁকে ঐ উপাধি প্রদান করা হয়েছিল তা সাক্ষ্যের অভাবে আমরা জানতে পারছিনা। যদিও ১৩৪৬ ত্রিপুরাব্দে এরূপ উপাধি এ রাজ্যের হিত সাধন কল্পে সদা নিরত এবং রাজানুরক্ত প্রসিদ্ধ সুধীগণকে বিশেষ সম্মান সূচক ও গৌরবান্বিত চিহ্নে বিভূষিত''[২৮] করার জন্য এ উপাধি প্রদানের ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপরে ১৩৫৬ ত্রিং সনের ২৫ শে অগ্রহায়ণের ৩৫১ নং রোবকারীতে বীরবিক্রম ব্রজেন্দ্র কিশোরকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন।'' যেহেতু এ পক্ষের প্রধানমন্ত্রী মান্যবর রাজা সাহেব রাণা বোধজং বাহাদুরের পরলোক গমনে প্রধানমন্ত্রী পদে অচিরেই যোগ্য নিযুক্তি করা আবশ্যক।

অতএব আদেশ হইল যে,এতদ্বারা অদ্য হইতে লেঃ কর্ণেল মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রী শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বাহাদুরকে আপাততঃ১ বৎসর কালের জন্য এপক্ষের প্রধান মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা যায়।''[২৯] কিন্তু এই পদে ব্রজেন্দ্র কিশোর এক বৎসর পূর্ণ করতে পারেন নি কারণ ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দে বীরবিক্রমের মৃত্যু হলে ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দে ২২শে শ্রাবণ নাবালক রাজা কিরীট বিক্রম কিশোরের পক্ষে ব্রজেন্দ্র কিশোর কাউন্সিল অব রেজিন্সী গঠন করেন। উক্ত কাউন্সিলে রাজামাতা কাঞ্চন প্রভাদেবী প্রেসিডেন্ট ও ব্রজেন্দ্র কিশোর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে যোগদান করে রাজ্যশাসনের কাজ অব্যাহত রাখেন।[৩০]

'কাকা লালু' কে বীরবিক্রম একান্ত আপনজন হিসাবে বিশেষ মান্য ও শ্রদ্ধা করতেন। নানারকম পারিবারিক সমস্যার ব্যাপারে প্রটোকলের ধার না ধেরে সর্বদাই 'কাকা লালু'র বাড়ীতে নিজে গিয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। এরূপ সাক্ষ্য আছে কিন্তু রাজপরিবারের একান্ত গোপন ব্যাপার বলে প্রকাশ করা অসমীচিন মনে করি। ব্রজেন্দ্র কিশোর ও ভাইপো বীরবিক্রমকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং সেজন্য অতি প্রসন্ন চিত্তে শেষদিন অবধি রাজকার্য করে গেছেন।

-ঃ তথ্য নির্দেশ ঃ-

১) গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ বীরচন্দ্রমাণিক্য আগরতলা,২০০৭,পৃঃ১৩-১৮
২) ঐ (সম্পা) ঃ নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা রচিত ঃ আবর্জনার ঝুড়ি, আগরতলা, ২০০৪, পৃ ঃ৩৮।
৩) ঐ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য, আগরতলা, ২০০২, পৃঃ ৪৭-৪৮।
৪) দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পূ উ. পৃঃ ১৩৮, স্টেট গেজেট, দ্বাবিংশভাগ, অগ্রহায়ণ বিশেষ সংখ্যা।
৫) ঐ ঃ রাজগী পৃঃ ৫০।
৬) ঐ ঃ রাজগী পৃঃ ১৩৯-১৪০।
৭) ঐ ঃ রাজগী পৃঃ ৪২৬-৪২৭।
৮) ঐ ঃ রাজগী পৃঃ ১৪১।
৯) ঐ ঃ রাজগী পৃঃ ৬৫।

১০) ঐ ঃ রাজগী পৃঃ ৫৯।

১১) ঐ ঃ রাজগী পৃঃ পৃষ্ঠা ২৩৯।

১২) গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য, পৃ.উ পৃ ৪৮।

১৩) গোপাল কৃষ্ণরায় ঃ নির্বাসিত রাজকুমার, পাক্ষিক বসুমতি, ১৬ ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ইং।

১৪) এই পত্র শিলং থেকে ১লা জুন ১৯২৪ খৃঃ লিখিত। মূলপত্র সমরেন্দ্র চন্দ্রের পৌত্র শ্রীযুত পৃথ্বিবীর জঙ্গের নিকটে রক্ষিত আছে। পত্রের জেরক্স প্রতিলিপি পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্ট্রব্য।

১৫) মূল পত্রের জেরক্স প্রতিলিপি পরিশিষ্ট ২ এ দ্রষ্ট্রব্য।

১৬) মূল পত্রের জেরক্স প্রতিলিপি পরিশিষ্ট-৩ এ দ্রষ্ট্রব্য।

১৭) গোপাল কৃষ্ণরায় ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ঃ ৬৯।

১৮) গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য, পূঃ উল্লিখিত, পৃ ঃ ৪৯-৫১।

১৯) দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ রাজগী, পৃ.উ পৃঃ ১৩৪।

২০) ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১৩৮।

২১) ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ৫০

২২) ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১৩৯।

২৩) ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১৪১।

২৪) ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ৪২৬-৪২৭।

২৫) ঐ ঃ রাজগী,পৃঃ ১৪১-১৪২।

২৬) ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১৬৫।

২৭) ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১৬৬।

২৮) ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ৩৫।

২৯) ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১৬৭-১৬৮।

৩০) ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১৭০।
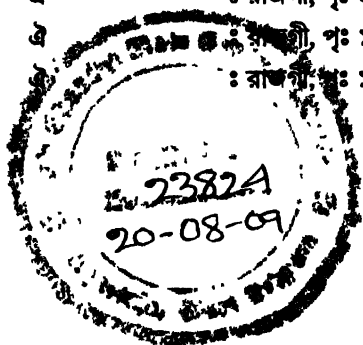
বীরবিক্রম ঃ ভ্রমণকারী

বীরবিক্রম সাংঘাতিক ভ্রমণকারী ছিলেন। একটি অতিক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যের অধিপতির অতি সামান্য আয় থেকে তাঁর এই ভ্রমণ বিলাসীতা বলে বিবেচিত হতেও পারে কেননা তিনি তো আব একা একা ঘুরে বেড়াননি, তাঁর সঙ্গে যথারীতি রাজকীয় সেবক বাহিনী(পরিমাপে কম হলেও) ঘুরে বেড়াত যাদের ব্যয় রাজ্যের আয় থেকেই বহন করা হয়েছিল। কিন্তু অপর দিকটাও বিবেচনার যোগ্য। জানার ইচ্ছা, নূতনকে দেখার ইচ্ছা তাঁব মধ্যে এমনভাবে বসতিস্থাপন করেছিলে যে তাঁর সমকালীন অনেক উচ্চ আয় সম্পন্ন রাজা মহারাজারও তা ছিল না। এভাবে ভ্রমণের ফলে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, নানাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থা, নগর সজ্জা তাঁকে উদবোধ্য করেছে নিজ ভূমিতে ঐসব প্রয়োগ করার ব্যাপারে। তাই তাঁর কাজকর্মে আধুনিক পৃথিবীর আলোক ত্রিপুরার গভীর অরণ্যে পবেশের সুযোগ লাভ করেছে এবং ত্রিপুরাবাসীদেরও শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে তাদের মানসিক পরিমন্ডল উন্নত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বীরবিক্রমের ভ্রমণ বত্তান্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন নিজভূমে ভ্রমণ, ভারতের বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ এবং বিদেশ ভ্রমণ। ছাত্রবস্থায় কর্ণেল পুলের তত্বাবধানে তাঁর ভ্রমণের সূচনা । কেননা" গুরু শিষ্য গরমে থাকেন শিলং নগরে আর শীতে থাকেন কুমিল্লাতে"।[১] তারপরেও পুলে সহ ১৯২৫ খ্রীঃ ডিসেম্বরে কলিকাতা, ১৯২৬ খ্রীঃ ডিসেম্বরে ও পুলেসহ কলিকাতা গমন করেন। ইউরোপ ভ্রমণেও পুলে সাহেব সঙ্গে ছিলেন। প্রথমে নিজভূমে ভ্রমণের বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা ভ্রমণ ঃ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাজা কুমিল্লা নগরী পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে যান। প্রাচীন রাজধানীর পুরাকীর্তি সমূহ দর্শন করে মুগ্ধ হন এবং পার্বত্য প্রজাদের ভোজন করান। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীর ৫তারিখে মহারাজ কৈলাসহর পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে ধূমাছড়াতে যান এবং পার্বত্য প্রজাদের ভোজন করান। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মহারাজ শিলং-এ ছিলেন এবং ১৮ই আগস্ট তারিখে কুমিল্লাতে যান। সেখানে আঞ্জুমান-ই ইসলামিয়া কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দন গ্রহণ করেন। এই স্থানেই অভয় আশ্রয়, হিন্দু

মহাসভা, বণিকসভা, বীরচন্দ্র গ্রন্থাগার এবং বিধবা বিবাহ সমিতি রাজাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস বীরবিক্রম ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ ভ্রমণ করেন। তিনি সাব্রুমে ও লীলাগড়ে অবস্থান করেছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারি রাজা ত্রিপুরার অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করেন। তিনি অম্পি নামক স্থানের নাম পরিবর্তন করে অম্পিনগর নামাকরণ করেন। অমরপুর বিভাগের নূতন বাজার ভ্রমনকালে উহার নাম রাখেন ডম্বুরনগর, বিলোনিয়ার লুং থুং এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন মুহুরীপুর, গোমতীর উৎপত্তিস্থল তীর্থমুখে রাজা একটি শিব মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন। ক্রমে জুলাইবাড়ী, পিলাক প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। সব স্থানেই প্রজাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। নজর স্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার নির্দেশ দেন। আরও দক্ষিণে জমিদারী ফেনীতে গমন করেন। নানা উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি ফেনী বাজারের নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন বীরেন্দ্রনগর বাজার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রাজার দান করা অর্থের পরিমাণ ৭,২০০্ টাকা।[১]

বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সোনামুড়াতে সেনা শিবির স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮-১০ ই মার্চ মহারাজ ঐ স্থানে সেনা শিবির পরিদর্শন করেন এবং সোনামুড়াতে অবস্থান করেন। ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা উদয়পুরে যান এবং সেখানে জমাতিয়া বাহিনী পরিদর্শন করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ই অক্টোবর মহারাজ চট্টগ্রামের দো-হাজারী রণক্ষেত্র পরিদর্শন করেন ১৮ই ডিসেম্বর রাজা ধর্মনগর পরিদর্শন করেন এবং সেখানে উন্নয়ন কার্য্যের জন্য ২০,০০০টাকা দান করেন। [৩] ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে ডিসেম্বর রাজা যুবরাজ সহ কৈলাসহর পরিদর্শন করেন, সেখানে সভাসমিতিতে যোগদান করেন এবং কৈলাসহরের উন্নয়নে জন্য ২০,০০০টাকা দান করেন।[৩]

ভারত ভ্রমণ ঃ বীরবিক্রমের ভারত ভ্রমণের সূচনা হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। ঐ সময়ে তিনি বিশ্রামের জন্য মুসৌরিতে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি দিল্লী, আগ্রা ও সিমলায় ভ্রমণ করেন। অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই ভ্রমণ চলে। ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ, ভ্রমণসঙ্গী কে কে ছিলেন বা কি উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছিলেন তা জানা যায়নি। দ্বিতীয়বার ভারত ভ্রমণ নিজের বিবাহ উপলক্ষে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুযারী বরযাত্রী সহ রেলযোগে আখাউড়া ত্যাগ করে চাঁদপুর, তারপরে জলপথে গোয়ালন্দ পৌঁছে পুনরায় রেলযোগে কলিকাতা, কাশী, লক্ষ্মৌ হয়ে বলরামপুরে পৌঁছেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজা অতিবাহিত করেন নৈনিতাল, মুসৌরী, কাশ্মীর, সিন্ধুপ্রদেশ এবং খাইবার গিরিপথ পরিদর্শন করে। মহারানী কীর্তিমণি দেবী বলরামপুরের কন্যা, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে পরলোক গমন করেন। তারপরে বীরবিক্রমের বিবাহ হয় মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহের নিকটবর্তী পান্না রাজ্যের রাজকন্যা কাঞ্চন প্রভাদেবীর সঙ্গে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে। বিবাহ উপলক্ষে মহারাজ নিশ্চয়ই পান্না গিয়েছিলেন। পরে নভেম্বর মাসে পান্না রাজের আমন্ত্রণে বীরবিক্রম সস্ত্রীক পান্না যান। সেখানে তিনি রাজকীয় শিকারে অংশ গ্রহণ করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী রাজদম্পতি দেবাদুন অভিমুখে যাত্রা করেন। এবারের ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ছিল কোটলাতে বিবাহিতা রাজ ভগ্নী অসুস্থ বসন্ত প্রভাকে দেখা। বসন্ত

প্রভাকে চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ডে পাঠান হয়েছিল সৌমেন ঠাকুরের অভিভাবকত্বে। ১২ই জানুয়ারী রাজা আগরতলা প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু মহারানী কাঞ্চন প্রভা মৌসুরীতে থেকে যান। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই চৈত্র তারিখে রাজা আগরতলা ছাড়েন দিল্লীর উদ্দেশ্যে। সেখানে ২৪মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত নরেন্দ্র মন্ডলের সভায় যোগদান করেন। দিল্লী থেকে তিনি মৌসুরী যান কারণ মহারানী সন্তান সম্ভবা এবং তিনি মৌসুরীতেই অবস্থান করছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস অবধি রাজা মৌসুরীতেই অবস্থান কবেন। জুন মাসে বাংলার গভর্ণরের আমন্ত্রণ মহারাজ রাণাবোধজং ও পুলে সাহেব সহ দার্জিলিংএ যান এবং জুন মাসের ২৯তারিখে তিনি আগরতলায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহারাজ কলিকাতা গমন করেন এবং তারপরে মধ্য ও পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে যথা ভবনগর, দ্বারকা, নবনগর, বরোদা, জামনগর, উজ্জয়িনী , ভূপাল, পান্না প্রভৃতি স্থান১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দেব জানুয়ারী পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। ঐ ভ্রমণে রাজা সর্বত্র প্রচুর সমাদর লাভ করেছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্ম কালে মে-আগস্ট পর্যন্ত রাজদম্পতি শিলং শৈলাবাসে অতিবাহিত করেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বীরবিক্রম খয়ড়াগড় গমন করেন, সেখানে পাঁচ দিন অবস্থান করে শিকারে অংশগ্রহণ করেন। তারপর তিনি দেরাদুন গমন করেন সুইজারল্যান্ড থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসা বোন বসন্তপ্রভাকে দেখতে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বীরবিক্রম শিকার করতে দক্ষিণ সুন্দরবনে যান এবং সেখানে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় ফিরে এসে পুনরায় মে ও জুন মাসে রাজদম্পতি মুসৌরীতে অবস্থান করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পান্না রাজ্যে বেড়াতে যান এবং সেখানে কিছু কাল কাটিয়ে ফিরে এসে রাজা ১লা ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরার অভ্যন্তর প্রদেশ ভ্রমণ করেন। জুলাইতে রাজা শিলংএ ছিলেন এবং সেপ্টেম্বরে কামাখ্যা মন্দির দর্শন করে ২০শে সেপ্টেম্বব আগরতলায় ফিরে আসেন। ৪ঠা ডিসেম্বর রাজদম্পতি কলিকাতায় গমন করেন এবং যেখান থেকে বোম্বাই মেইলে খয়ড়াগড় পৌঁছেন, উদ্দেশ্য ছিল খয়ড়াগড়ের রাজার রাজ্যভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান। ১২ই ডিসেম্বর বীরবিক্রম কলিকাতায় ফিরে আসেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর রাজারানী কলিকাতার উদ্দেশ্য আগরতলা ত্যাগ করেন এবং শীতকালে সেখানে অবস্থান করেন। ২৮-২৯ শে ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশীয় বাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্পর্কিত আলোচনা সভাতে মহারাজ যোগদান করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দেই ইউরোপ যাত্রার প্রাককালে বোম্বাইতে অবস্থান কালে তিনি পূনে ও সাঁতারা দর্শন করেছিলেন। ফেরার কালে তিনি ২২শে সেপ্টেম্বর দার্জিলিং ভ্রমণ করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ই জানুয়ারী রাজা আগরতলায় প্রত্যাবর্তন করেন। পুণরায় ১২ফেব্রুয়ারি তিনি আগরতলা ত্যাগ করে কলিকাতায় যান। ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মহারানী পান্না যান নেপালের রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর ভাই এর বিবাহ উপলক্ষে। পান্না রাজের আমন্ত্রণে বীরবিক্রম বারাণসী হয়ে নেপালে যান বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। ২রা মার্চ পান্না ফিরে এসে ৮ই মার্চ পান্না ত্যাগ করে করে ৯ই মার্চ কলিকাতায় পৌছেন, ১২ই মার্চ রাজা কলিকাতা ত্যাগ করেন

এবং আগরতলা ফিরে আসেন। ১২ ডিসেম্বর রাজা কলিকাতায় যান শীতকাল অতিবাহিত করার জন্য।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ই জানুয়ারী রাজা আগরতলায় ফিরে আসেন, পুণরায় ৩০শে মার্চ রাজা কলিকাতায় গমন করেন এবং ১১ই মে আগরতলায় প্রত্যাবর্তন করেন। গ্রীষ্মকালে রাজপরিবার শিলং গেলেন। ১৫ই আগস্ট রাজা ডিগবয়ে যান। ২৫শে নভেম্বর বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নরেন্দ্র মন্ডলের সভায় যোগদান করেন। ১লা ডিসেম্বর বীরবিক্রম বারিয়া ও রাজপিপলা ভ্রমণ করেন। ডিসেম্বরের বাকীদিনগুলি কলিকাতাতে কাটান। ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয় মহাসভায় যোগদান করেন এবং চন্দ্রবংশের রাজা হিসেবে বিশেষ অতিথিরূপে মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী বীরবিক্রম বোলপুরে যান, শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন এবং পরে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে মে পৃথিবী ভ্রমণে আগরতলার থেকে বের হয়ে বোম্বাই পৌছাবার পূর্বে রাজা পান্নাতে গমন করেন। পরে পান্না থেকে বোম্বাই পৌছান এবং ৩রা জুন যাত্রা শুরু করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী বীরবিক্রম বিশ্ব পরিক্রমা করে আগরতলায় আসেন। মে ও জুন মাসে রাজা কলিকাতায় ছিলেন। সেখানে ত্রিপুরা ভবনে মে জুন মাসে নরেন্দ্র মন্ডলের বৈঠক বসে ।জুনে বীরবিক্রম পুরীধামে গমন কবেন এবং সেখানে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বীরবিক্রম কলিকাতায় ত্রিপুরা ভবনে অনুষ্ঠিত নরেন্দ্রমন্ডলীর বৈঠকে যোগ দেন। ফেব্রুয়ারিতে বীরবিক্রম দ্বারাভাঙ্গা পরিদর্শন করতে যান। জুলাই মাসে আবার নরেন্দ্র মন্ডলীর বৈঠক বসে কলিকাতার ত্রিপুরা ভবনে। বৈঠক শেষে রাজা ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর দর্শনে বের হন এবং ৪ঠা আগস্ট বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নরেন্দ্র মন্ডলীর বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে শেষে রাজা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের প্রযাসে বের হলেন এবং পথিমধ্যে রায়চূড় থেকে গুন্টাকলের কাছাকাছি এক ছোট ষ্টেশনে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের সংবাদ শোনেন। যথাবিহিত ব্যবস্থা করে বীরবিক্রম দক্ষিণ ভারতের উদগমন্ডলম, মাদুরাই ও ত্রিচিনোপল্লী দর্শন করে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বীরবিক্রম কলিকাতায় ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী আগরতলা ছেড়ে ১৬ই জানুয়ারী ভূপালে প্রশিক্ষণরত ত্রিপুরার সেনা দল পরিদর্শন করেন। ১৪ ই নভেম্বর রাজা শিলং এ ছিলেন এবং পাতিয়ালার সেনাবাহিনীকে ভোজে আপ্যায়িত করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই মে জার্মানী আত্মসমর্পণ করে। ২৯শে মে রাজা শিলং এ ছিলেন এবং ৮ ই জুন তারিখে ত্রিপুরা ও আসামের সীমানা বিষয়ক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী বীরবিক্রম ইউরোপ ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে আগরতলা ত্যাগ করেন। তাঁর ভ্রমণ সঙ্গীরা ছিলেন কর্ণেল পুলে, রানা বোধজঙ্গ, কাপ্তান বজেন্দ্র কিশোর, কাপ্তান রানা নেপাল জঙ্গ, ডাঃ প্রমোদ দে এবং অন্য তিন জন সেবক। বোম্বাইতে তাঁকে স্বাগত জানান বোম্বাইর গভর্ণর এবং বারিয়ার রাজা। ১লা ফেব্রুয়ারি সমুদ্র যাত্রা শুরু করে ১৩ ই

ফেব্রুয়ারি নেপলসে পৌঁছেন এবং সেখানে ১৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করেন। নেপলস ত্যাগ করে ২০শে ফেব্রুয়ারি রোমে পৌঁছেন এবং সেখানে ১০ ই মার্চ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১১ ১১ই মার্চ বীরবিক্রম ফ্লোরেন্সে পৌছান এবং ১৯ শে মার্চ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ২০শে মার্চ রাজা পৌঁছান মিলানে এবং সেখানে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত ছিলেন ২৯ শে মার্চ বীরবিক্রম মন্টিকার্লো পৌছেন এবং সেখানে ১৪ ই এপ্রিল পর্যন্ত কাটান। ১৫ ই এপ্রিল রাজা প্যারিসে পৌঁছেন এবং ঐ নগরীতে ৬ ই মে পর্যন্ত অবস্থান করেন। ৭ ই মে বীরবিক্রম ব্রুসেলসে পৌছেন এবং সেখানে ১২ মে পর্যন্ত থাকেন। ১৩ ই মে রাজা লন্ডনে পৌছেন এবং ১২ জুন পর্যন্ত লন্ডনে থাকেন। ১৩ ই জুন তিনি বেলথেনহাম পৌঁছেন এবং সেখানে ৩ দিন অবস্থান করে লন্ডন নগরীর শহরতলীগুলি ভ্রমণ করেন ১৬ ই জুন থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত। ১০ ই জুলাই রাজা এডিনবার্গে পৌছেন এবং তিনদিন অবস্থান করে ১৪ই জুলাই গ্লাসগো নগরে পৌছেন। ১৫ই জুলাই তারিখে রাজা গ্লাসগোতেই অবস্থান করেন। ১৬ ই জুলাই বীরবিক্রম বেলফাস্ট পৌছেন এবং ১৭ ই জুলাই পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। ১৮ ই জুলাই তিনি ডাবলিনে পৌছেন এবং ২০ জুলাই পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। ২৫ শে জুলাই বীরবিক্রম হেগ পৌছেন এবং ২৭ শে জুলাই পর্যন্ত হেগ এ অবস্থান করেন। ২৮শে জুলাই হামবুর্গ পৌঁছেন এবং ২০ শে আগস্ট অবধি হামবুর্গে কাটান। ২১ শে আগস্ট বীরবিক্রম বার্লিনে পৌছেন এবং পুরো আগস্টমাস সেখানে থাকেন। ১লা সেপ্টেম্বর তিনি প্রেগ পৌছে ৩ রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে ছিলেন ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভিয়েনা পৌছে ১১ই সেপ্টেম্বর কাল কাটিয়ে ১২ই সেপ্টেম্বর বুদাপেস্ট পৌঁছেন। বুদাপেস্টে ১৭ ই সেপ্টেম্বব পর্যন্ত থেকে ১৮ ই সেপ্টেম্বর ভেনিসে পৌঁছেন এবং সেখানে ২৩ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করে ২৪ শে সেপ্টেম্বর ফেরা যাত্রাব সূচনা করেন এবং ৬ই অক্টোবর বোম্বাই পৌঁছান এবং সেখানে ভগ্নীপতির আতিথ্য গ্রহণ করে ১৮ ই অক্টোবর আগরতলা প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারী থেকে ৬ ই অক্টোবর ১৯৩০ খৃ পর্যন্ত প্রায় ৮ মাস ১৭ দিন ধবে ইউরোপ ভ্রমণ করে তিনি কি কি দ্রষ্টব্য দেখেছিলেন তা আমরা জানিনা। তবে এই দীর্ঘ প্রবাস কালে তিনি পোপ, ইতালীর রাজা, মুসোলিনি, মোনাকোর যুবরাজ, বেলজিয়ামের রাজা, ব্রিটেনের রাজা ও রানী, ওয়েলস নৃপতি, কন্নটের ডিউক, অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং আলাপ আলোচনা করেছিলেন।[৮]

দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ ঃ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বীরবিক্রম দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। মহারাজের দিদি বসন্ত প্রভাদেবী যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ডে অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে নিয়মিত চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখাই ছিল এবারের ইউরোপ যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। মে মাস থেকে সেপ্টেম্বরর মাস পর্যন্ত প্রায় ৪ মাসের ভ্রমণে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী, রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর, ক্যাপ্তান ব্রজলাল দেববর্মণ, ডাঃ প্রমোদ দে, ঠাকুর নরেন্দ্র দেববর্মণ ও ঠাকুর মুকুন্দ দেববর্মণ। ২৭ শে এপ্রিল তারিখে আগরতলা ত্যাগ করে, কলিকাতায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে, বোম্বাই পৌছে সেখানে আরও এক সপ্তাহ অবস্থান করে Vice-roy of India নামক জাহাজে ১৬ই মে যাত্রা শুরু করে ক্রমে ২০শে মে এডেন, ২৩ শে মে পোর্টসৈয়দ অতিক্রম করে ২৭শে মে মার্সেলিস-এ অবতরণ করেন। ২৮শে মে মার্সেলিস ত্যাগ

করে২৯ শে মে Dovos Plalz বন্দরে অবতরণ করে, ৪ঠা জুন Dovos Plalz ত্যাগ করে ৫ই জুন লন্ডন বন্দরে পৌছান এবং সেখানে অবস্থান করে বহু দর্শনীয় স্থান দর্শন করেন। ১৪ই জুন লন্ডন ত্যাগ Dovos Plalz এ অবতরণ করে এবং ১৬ই জুন DOVOS PLALZ ত্যাগ করে পুনরায় লন্ডন বন্দরে অবতরণ করেন। ২৬ শে জুন লন্ডন ত্যাগ করে ডি পি বন্দরে অবতরণ করেন কিন্তু সে দিনই রাজার দিদি মারা যান। Dovos Plalz বন্দর পরিত্যাগ করেন ২৮ শে জুন এবং লন্ডন অবতরণ করে ১৪ জুলাই লন্ডন ত্যাগ করে প্যারিসে পৌঁছান। ২৭ শে জুলাই পারিস ত্যাগ করে ২৮ শে জুলাই বার্লিনে পৌঁছান এবং সেখানে অবস্থান করে দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করেন। ১১ই আগস্ট বীরবিক্রম ভিয়েনাতে আসেন এবং ১৬ই আগস্ট লিডোতে পৌঁছান। ২১ শে আগস্ট তিনি মিলানে পৌছান এবং ২২ শে আগস্ট Nice এ আগমন করে Connes এ পৌঁছান। ২৭ শে আগস্ট Cannes ত্যাগ করে মার্সেলিসে আসেন এবং ২৮ শে আগস্ট মূলরান নামক জাহাজে মার্সেলিস ত্যাগ করে ১০ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই বন্দরে পৌছান। ১৩ ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পৌছে বীরবিক্রম ২২ শে সেপ্টেম্বর দার্জিলিং ভ্রমণ করেন এবং ২রা অক্টোবর আগরতলা পৌঁছান।

এবারের ইউরোপ যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পীড়িতা ভগ্নী বসন্ত প্রভাদেবীকে সঙ্গ দেওয়া। এই ভগ্নীর সেখানেই মৃত্যু হয়। এছাড়া সস্ত্রীক ইউরোপের দৃশ্যবলী দর্শনও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কিছু কিছু সৌজন্যমূলক রাজনৈতিক কাজকর্মও করেছিলেন। তিনি ব্রিটেনের রাজা ও রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, জার্মান রাষ্ট্র প্রধান হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জার্মান চ্যান্সেলারের ভবনে গমনের কালে ও বিদায়ের কালে তাঁকে Guard of Honour প্রদর্শন করা হয়েছিল। পরে ভারতে ফিরে আসার পরে জার্মান রাষ্ট্রদূত তাঁকে হিটলারের একটি মনোজ্ঞ প্রতিমূর্তি উপহার দেন। তিনি সেবারে জার্মানীতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়াও দর্শন করেছিলেন।[১] বোম্বাইতে পৌছাবার পর স্ত্রী গৌড়ীয় মঠের শ্রীমৎ মহারাজ ও সেখানকার বাঙালী সমাজ তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

বিশ্বপরিক্রমা ঃ- ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে মে বীরবিক্রম স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশায় বিশ্ব পরিক্রমায় বের হন। এই তৃতীয়বারের যাত্রাতে তাঁর ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন তাঁর বোন বারিয়ার যুবরানী , কাপ্তান দূর্জয় কিশোর, কাপ্তান রমেন্দ্র কিশোর, কাপ্তান যোগেন্দ্র দেববর্মা, দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, কর্ণেল পুলে, ঠাকুর মুকুন্দ দেববর্মা এবং ডাঃ প্রমোদ দে। মে মাস থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৮ মাস ব্যাপি বীরবিক্রম পৃথিবী পর্যটন করেন। ৩রা জুন বোম্বাই থেকে যাত্রা শুরু করে ৩০ শে জুন তিনি লন্ডনে অবতরণ করেন। লন্ডনে কিছুদিন কাটিয়ে ১২ ই জুলাই লন্ডন ত্যাগ করে ১৭ ই জুলাই নিউইয়র্কে পৌছান। ১৬ আগস্ট তিনি নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছিলেন।

১৭ই জুলাই থেকে১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সময়ে তিনি Washington, Mount vermon, Chicago, Toronto, Niagara falls , ottwa, Montreal, California, প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং California বেতার কেন্দ্র থেকে বেতার ভাষণ দেন। ১৬ই আগস্ট আমেরিকা ত্যাগ করে ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করেন ২২শে আগস্ট Aix les Banes এ অবতরণ করে এবং জাতিসংঘের অধিবেশন দর্শন করেন। ইতিমধ্যে বিশ্ব রাজনীতি দ্রুত উত্তপ্ত হতে থাকে তাই বীরবিক্রম দ্রুত London গমন করেন এবং

২রা সেপ্টেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ৩ রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হলে জাহাজ ঘুরে যায় এবং তিনি আমেরিকাতে আশ্রয় নেন। ১০ই অক্টোবর রাজার সম্মানে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি Sun Francisco -তে ভোজদেন। ১১ই অক্টোবর Sun Francisco তেই মার্কিন সরকার রাজার সম্মানে ভোজ প্রদান করে। ১৩ই অক্টোবর বীরবিক্রম Sun Francisco ত্যাগ করে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে চলতে শুরু করেন। ২৪শে অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার মার্কিন উপনিবেশ সামোয়ার সরকার রাজার সম্মানে ভোজ প্রদান করে। ২৭শে অক্টোবর ফিজির শাসক রাজাকে ভোজে আপ্যায়িত কবেন এবং ফিজি নিবাসী ভারতীয়গণ রাজাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ২রা নভেম্বর রাজার সম্মানে Sydney তে ভোজ দেন অস্ট্রেলিযা সরকার। ২৮শে নভেম্বর বালি দেশেব রাজা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তারপরে জাভা, মালয়, সিঙ্গাপুব ও ব্রহ্মদেশ দর্শন করে বীরবিক্রম ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতা পৌছেন। সেখানে ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ২৫শে জানুয়াবী ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বীরবিক্রম আগরতলা প্রত্যাবর্তন করেন।

বীরবিক্রমের তিনবারের ইউরোপ ও বিশ্বপরিক্রমায় ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুবার অতি সামান্য আয় ও জমিদারীর আয় (যার বৃহৎ অংশ বাজার নিজ তহবিলে আসত) থেকে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা দিয়ে বাজা নিজেও পরিষদগণ আনন্দ লাভ ও শিক্ষালাভ করে থাকলেও বাজ্যের প্রজাদের কি লাভ হয়েছে তাদের কষ্টার্জিত অর্থব্যয়ে তা অবশ্যই বিবেচনা কবে দেখা দরকার। কিন্তু ১৯৩০-১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত রাজ্যে এমন কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল না যারা এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারত। সামন্ততান্ত্রিক ত্রিপুরার রাজার ইচ্ছা ও কথাই শেষ বলে বিবেচিত হত। নীরবে সহ্য করা ছাড়া প্রজাদের আব কোন উপায় ছিল না। উপরন্তু বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ব্রিটিশ রাজের রক্তচক্ষু ও তাদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে ইতিহাসকারগণ অতিমিষ্টি বাক্যে কিছু কিছু সমালোচনা করে নিজেদের বিবেকের বেদনা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। "It is true that his tours outside India proved expensive and these foreign tours were undertaken by him either on grounds of health or to satisfy his personal desire of seeing big cities of Europe and America. Such tours no doubt meant a heavy burden on the tinny state with limited resources But these Continental tours had their bright sides too "[৮] কি সেই উজ্জ্বল দিকগুলো? যা বিবেচনা করে দরিদ্র ত্রিপুরাবাসী হাসিমুখে এ খবরের দায় বহন করেছিল? এ ব্যাপারে মার্গ দর্শন করিয়েছে District Gazetteer " This no doubt, enabled him to gain first hand knowledge and ideas, of the modern world. The progress of education in those countries impressed him so much that immediately after his coming back to home her drew up a model scheme ' vidyapattan' i e establishment of Educational Institutions which includes college of Arts. Science, Technology, Agriculture, Medicine and a rural university"[৯]

১৯৪৮ খ্রীঃ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এই প্রসঙ্গে বলেছেন " He had been in Europe and America in his early youth to study Conditions in Education-

ally and industrially progressive states so that he might utilise his knowledge and experience to be benifit of his own small state with its limitation,"[১০] এসব গালভরা বাণী ও কথায় অর্ধভুক্ত নিরন্ন জুমিয়া প্রজাদের পেট ভরেছিল কি না পাঠকবর্গ বিচার করুন।

—ঃ তথ্য নির্দেশ ঃ—

১। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ ত্রিপুরার ইতিহাস আগরতলা, ২০০০ পৃঃ ১৭০

২। ঐ ঃ ঐ পৃঃ ১৮১।

৩। ঐ ঃ ঐ পৃঃ ১৯৯।

৪। ঐ ঃ ঐ পৃঃ২০০।

৫। ঐ ঃ ঐ পৃঃ১৭৮।

৬। Tripura Administration Report 1930 -1931. p p 3,4,5.

৭। Sun H K : British Relation with the state of Tripura, Agartala, 1986, p.165

৮। Ibid : p.166

৯। Menon K.D Tripura District Gazetteer, P 117

১০। Amrita Bazar Patrika, 24th June.1948 (T.K.Ghosh's Speech on memorial meeting)

বীরবিক্রম ও ব্রিটিশ রাজ

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতিপত্র খরিতা নিয়ে পলিটিক্যাল এজেন্ট আগরতলা পৌঁছেন এবং ২৩ শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজপ্রাসাদে এক বিশেষ দরবারে ঐ স্বীকৃতি পত্র পাঠ করেন। মহারাজার নাবালক অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অনুসারে কাউন্সিল অব এডমিনিষ্ট্রেশান গঠিত হয়েছিল। এই কাউন্সিল রাজ্যের সমস্ত কার্য নির্বাহ করতে পারত কেবলমাত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে পলিটিক্যাল এজেন্টের পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পলিটিক্যাল এজেন্ট উক্ত কাউন্সিল উদ্বোধন করেছিলেন।[১] পলিটিক্যাল এজেন্টের সহযোগিতায় কর্ণেল পুলের অধীনে মহারাজের শিক্ষা দীক্ষা এবং পরে প্রশাসনিক ট্রেনিং শেষ হবার পর ২৮ শে জানুয়ারী ১৯২৮ খ্রীঃ তাঁর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে সার্বভৌমের পক্ষে বাংলার গভর্ণর পেশকাশ ১২৫টি স্বর্ণমুদ্রা স্পর্শ করে মহারাজকে ব্রিটিশ সরকারের খিলাত প্রদান করেন।

ত্রিপুরা ও কোচবিহারের সঙ্গে ভারত সরকারের সরাসরি যোগাযোগের প্রশ্নপূর্বে উঠেছিল কিন্তু ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে বাংলার 'গভর্ণর ইন কাউন্সিলই' কেন্দ্রীয় যোগাযোগ রক্ষা করবে। কিন্তু রাজণ্যমন্ডলী ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে উহা পুনরায় পরীক্ষা করে এবং সিদ্ধান্তে আসে যে ১৯২৪ সালের প্রচলিত প্রথা মোটেই সুবিধাজনক নয়, সেজন্য উহা পরিত্যাগ করা উচিত কেন না ভারত সরকারের নীতি ছিল ভারতীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা। পাঞ্জাব এবং পশ্চিম ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিকে সরাসরি গভর্ণর জেনারেলের এজেন্টের অধীনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গদেশীয় রাজ্যসমূহ যথা ত্রিপুরা ও কোচবিহার এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। উপরোক্ত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ও উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বিবেচনা করে গ্যাংটক সিকিমের রেসিডেন্ট ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে ডিসেম্বর তারিখে সিকিমের পলিটিক্যাল এজেন্সী উচ্চতর করার জন্য একপ্রস্তাব প্রেরণ করে। প্রস্তাবে উহাও বলা হয় যে সিকিমের পলিটিক্যাল এজেন্সীর উন্নতি বিধান করে তার হাতে বাড়তি দায়িত্ব হিসাবে ত্রিপুরা ও কোচবিহারের ভারও দেয়া যেতে পারে। কিন্তু ভারত সরকার উক্ত প্রস্তাব বিবেচনা করেনি।[২] ফলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরা ও কোচবিহারের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের আর কোন চেষ্টা করা হয়নি।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর বাংলার গভর্ণরের হাত থেকে উক্ত দুই দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক যোগাযোগের ভার তুলে নিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেলের এজেন্টের হস্তে সমর্পণ করা হয়। ফলে গভর্ণর জেনারেলের এজেন্টের সেক্রেটারী ত্রিপুরা জেলার ডিষ্টিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বদলে রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন ১লা ডিসেম্বর ১৯৩৬ সাল থেকে। এই নূতন পরিকাঠামোতে ত্রিপুরা কোচবিহার ও ময়ুরভঞ্জ রাজ্য গভর্ণর জেনারেলের এজেন্টর সচিবের অধীনে আসে যার সদর দপ্তর তৈরী করা হয়েছিল রাঁচীতে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখে পলিটিক্যাল এজেন্সির নাম বদল করে ''রেসিডেন্টফের ইষ্টার্ণ ষ্টেটস'' করা হয় এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর উক্ত রেসিডেন্সীকে প্রথম শ্রেণীব রেসিডেন্সীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়`।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভাবতীয় জনগণনার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও ২বা ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালে জনগণনা করা হয়। দেখা যায় ১৯২১ সালের জনসংখ্যা ৩,০৪,৪৩৭ থেকে বেড়ে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের দাঁড়িয়েছে ৩, ৮২,৪৫০ জন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল বাংলার মন্ত্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলা পরিদর্শন করেন এবং গোমতী নদীব বন্যা রোধ করার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেয়া সম্পর্কে আলোচনা কবেন।[৫] ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ এক আদেশ বলে সরকারীভাবে ত্রিপুরা দরবারের পরিবর্তে 'ত্রিপুরা সরকাব' প্রচলন করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে সঙ্গে এক চুক্তির বলে ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার ১" স্কেলে টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে করতে সম্মত হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে জানুয়ারী কুমিল্লাতে অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্রে ভারত সীমান্ত বরাবর বিরোধ (dispute) মেটাবার প্রশ্ন উঠে। উক্ত আলোচনা চক্রে ১২ নং সার্ভে পার্টির প্রধান লে. কর্ণেল সি. এম. থমসন, সি. জি. বি স্টিফেন, পলিটিক্যাল এজেন্ট এবং ত্রিপুরার দেওয়ান বি. কে. সেন যোগদান করেন। ঐ সম্মেলনে রাজ্য সার্ভের সমগ্র খরচের এক চতুর্থাংশ বহন করতে সম্মত হয়। সার্ভে শুরু হলে গৌরাঙ্গলা সীমান্ত বিরোধ চাক্ষুস পরিদর্শন করতে হয়। চট্টগ্রাম পার্বত্য বিভাগের মায়ানী রিজার্ভ ফরেষ্ট ও রাজ্যের সীমারেখা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। গোমতী ও মায়নী উপত্যকার জলবিভাজিকা রেখা সার্ভিং রেঞ্জ পর্যন্ত সাধারণ সীমারেখার স্বীকৃতি পায়।[৬] জম্পুই পাহাড়ে লুসাই পাহাড় ও ত্রিপুরার ফুলডঙ্গসাই গ্রাম পর্যন্ত বিতর্কিত সীমানা যুগ্মভাবে লুসাই জেলার সুপারিটেনডেন্ট ও সোনামুড়ার বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক, ১২নং পার্টির ক্যাম্প অফিসার ও রাজ্যের সার্ভে সুপারিটেনডেন্ট পরিদর্শন করে। বেতলিং ও লংতরাই পর্যন্ত জলবিভাজিকা রেখা ও যুগ্মভাবে পরিদর্শিত হয় এবং জলবিভাজিকা রেখাতে কিছু অস্থায়ী চিহ্ন রাখা হয়। ফেনী নদীর উৎস এবং প্রবাহিকা সমন্ধের সীমা বিরোধ সার্ভে সুপারিটেনডেন্ট দ্বারা পরিদর্শিত হয়। এই সার্ভে ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা দ্বারা করা হয়েছিল এবং খরচ বাবদ ৪৫,০০০ টাকা কিস্তিতে ত্রিপুরা সরকার খরচের অংশ রূপে শোধ করে। রাজ্যের মন্ত্রী ও সার্ভে সুপারিটেনডেন্ট সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে ১৯৩৪-৩৫ সালে শিলং এ আলোচনা করে। এই আলোচনাতে সার্ভে সুপারিটেনডেন্ট, পলিটিক্যাল এজেন্ট এবং এবং আসাম সরকারের চিফ সেক্রেটারী অংশগ্রহণ করে। আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রীহট্ট, লুসাই পার্বত্য জেলা ও ত্রিপুরার ত্রিমোহনী লঙ্গাই নদীর উপরে স্থির করা।[৭] কিন্তু সমস্যা না মেটাতে ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ঐ ত্রিমোহনী সীমানা সম্বন্ধে চিঠিপত্র আদান প্রদান চলতে থাকে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে শিলং-এ থাল-থাংগাঙ্গ সীমা সম্বন্ধে আসাম ও ত্রিপররার এক আলোচনা সভা হয় যাতে বীরবিক্রম সভাপতিত্ব করেন। আসাম ও ত্রিপুরা রেসিডেন্সীর অফিসারবৃন্দ সভাতে অংশ গ্রহণ

করে। আসামের ডেপুটি ডিরেকটার ও ত্রিপুরার সার্ভে সুপারিটেনডেন্ট যে বিবরণী পেশ করেছিলেন তা পরীক্ষা ও আলোচনা হয়। সভাতে ঐক্যমতে modus operandi গৃহীত হয় যে সব কাজ সম্পূর্ণ হয় গেছে এবং অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দুইটি এলাকা সম্বন্ধে মহারাজা ছাড় দেন অতি ক্ষুদ্র এলাকা বলে। একথা রাজ্যের সুপারিটেনডেন্ট উল্লেখ করেছেন।[৯]

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ শে মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজ্যসভার অধিবেশনে বীরবিক্রম যোগদান করেন এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় দেশীয় রাজ্য সমূহের অনুসন্ধান কমিটিব সভাপতি মাননীয় J C C Davidson এর সঙ্গেও আলোচনা করেন রাজ্যের প্রদত্ত মেমোবেন্ডাম সম্পর্কে।[১০] ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে ও ২৯ শে ডিসেম্বব লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হাউসে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যবর্গের সম্মেলনে---ভাইসরয়ের বিশেষ প্রতিনিধি Mr. A C Lothian এব উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত ফেডারেশনে যোগদানের ব্যাপারে বীরবিক্রম রাজ্যেব মন্ত্রীসহ অংশগ্রহণ করেন। মহারাজা অবশ্য Mr Lothian এর সঙ্গে ৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৩৬ সালে আলাদাভাবে আলোচনা করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর বীরবিক্রম বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত রাজন্যসভা ও মন্ত্রীদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের জন্য যথেষ্ঠ পরিমানে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাজন্যসভার সংবিধানে কিছু পরিবর্তন আনতে সাফল্য লাভ করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মহারাজা পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের রেসিডেন্টকে জানান যে তিনি সর্বদাই Federation এর পক্ষে এবং যদি প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যক রাজ্য Fedration এ যোগদান করে তাহলে ত্রিপুরাও যোগ দিতে দ্বিধা করবে না। অপর এক পত্রে তিনি ভারত সরকাবকে জানান যে ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত পরিবর্তন হলে ঐ ফেডারেশন পরিকল্পনাতে যোগ দিতে তার পক্ষে কোন বাধা থাকবে না।[১১] অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেলে, যুদ্ধ প্রাধান্য পাওয়ায়, এরূপ প্রস্তাবিত All India Federation of states and the accession of the states there to অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় এবং ঐ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার রাজ্যসমূহকে জানিয়ে দেয়। মহারাজার পৃষ্টপোষকতায় G.S.Guha, রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী, পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের মন্ত্রীপরিষদে স্থান প্রাপ্ত হন।

১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফেনী নদী মহালের আমলীঘাট টোল কেন্দ্র রাজ্যসরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পূর্বে যেখানে মোট রাজস্ব আদায় হত ৬২,২২৬ টাকা যেখানে ৫ বৎসরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৩১,৩৯২ টাকাতে। কাজেই ৫ বৎসররে রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ ১,৬৯,১৬৬ টাকা। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম কমিশনারের সভাপতিত্বে ঐ টোল কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিচালনা সম্পর্কে এক আলোচনা সভা বসে। ঐ আলোচনা সভার সুপারিশ অনুসারে বাংলা সরকার রাজ্যের হস্তে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দেয়। ঐ কাল সমাপ্ত হলে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত আর এক আলোচনায় আরও ৫ বৎসরের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের হস্তে ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দেওয়া হয়। কেননা রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় আয় বেশী হচ্ছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পলিটিক্যাল এজেন্ট ও স্বীকার করেন যে ত্রিপুরা সরকার নিয়ন্ত্রিত টোল ষ্টেশন খুব ভাল কাজ করেছে এবং পুনরায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ শে নভেম্বর বাংলা সরকার ত্রিপুরা দরবার কে জানায় যে ঐ ব্যবস্থা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে মার্চ অকার্যকরী হবে তখন উভয় পক্ষ নিজস্ব স্টেশন থেকে টোল আদায় করবে এবং পন্যবাহী জলযানগুলিকে ভাটিতে নামতে

দেবে। হঠাৎ এরূপ সিদ্ধান্তে ত্রিপুরা দরবারকে হতচকিত করে কারণ সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে ত্রিপুরা দরবারের সঙ্গে কোন আলোচনা হয় নি। ত্রিপুরা দরবার পলিটিক্যাল এজেন্টের মাধ্যমে পূর্বপ্রথা আরও ৫ বৎসরের জন্য বাড়াতে পত্রযোগে বাংলা সরকারকে অনুরোধ করে। উল্লেখ করা হয় যে যদি নদীর উভয় পাড়ে অবস্থিত চেকপোষ্টগুলি শক্তিশালী না করলে বেআইনী কাজ বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব। উপরন্তু উভয় সরকার নদীর পার থেকে নদীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এলাকা আইনতঃ দেখভাল করার অধিকারী। এই প্রশ্নই ফেনী টোল স্টেশনকে রাজনৈতিক রূপ দেয়। সেজন্য ফেনী উপত্যকাতে বনজ বস্তু চলাচলে একটি সুগম কার্যকরী ব্যবস্থা অতিপ্রয়োজনীয়।[১২] তারপরে যুগ্ম পরিচালনার কথা মাঝে মাঝে উঠলেও রাজ্যের নিকটেই আমলীঘাট টোল ষ্টেশনের ব্যবস্থাপনা থাকে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এক যুগ্ম আলোচনাতে উভয়পক্ষ রাজী হয় যে বাংলা সরকারের একজন রেঞ্জার এক বছর মেয়াদে নিযুক্ত হবেন। কিন্তু যুদ্ধের কারণে বাংলা সরকার কোন রেঞ্জার ডেপুটেশান দিতে পারেনি ১৯৩৪-১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ফলে রাজ্যের একজন ফরেস্ট অফিসার টোল স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বঙ্গ সরকারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে।

রাজ্যের পূর্বপ্রান্তের লুঙ্গাই উপত্যকা অঞ্চল নিয়েও সমস্যা পূর্বের মত চলতে থাকে যদিও ব্যাপারটি পলিটিক্যাল এজেন্টের মারফৎ আসাম সরকারকে বারবার জানান হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে লুঙ্গাই জঙ্গলের ঐ সমস্যা লাঘব করতে একটি Conference এর আয়োজন করা হয়েছিল। একটি যৌথ বিবৃতিও তৈরী করা হয়েছিল যাতে সুপারিশ করা হয়েছিল (১) দামছড়াতে ব্রিটিশ চেকপোস্টের এবোলিশ (২) রাজ্যের তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের স্বীকৃতি দেওয়া (৩)উভয় পক্ষের কতিপয় ছড়াতে ব্যবসাকরণ বিনা মাশুলে প্রভৃতি। আসাম ও ত্রিপুরা দরবার উভয় পক্ষই সুপারিশগুলি গ্রহণ করে [১৩]। যদিও রাজ্য থেকে শ্রীহট্টে বনজবস্তু পাঠাতে এবং পরিবহন কালে আসাম সরকারের ঘন ঘন কাগজপত্র পরীক্ষার ফলে কিছু অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু আসাম ফরেস্ট ইনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী করার পরে সে সব অসুবিধাও দূর হয়েছিল। ফলে আসাম সরকার পূর্বে যে কর আদায় করত এবং ভাটিয়াল গ্রহণ করে চলাচলের অনুমতি দিত তা রদ হয়ে যায়। রাজপুর ও লোরাইরপোয়াতে রাজ্যের বনজ বস্তু পরীক্ষা করাও বন্ধ হয়ে যায়। আসাম সরকার কুড়াল কোপ মার্কা কাঠের লগ নিতে রাজী হয় কিন্তু ঐ মার্কা কেবলমাত্র ৩১ শে মার্চ ১৯৩০ খ্রীঃ অবধিই চালু থাকবে জানায়। তারপরে অবশ্যই হাতুরী-মার্কা মারা কাঠই রপ্তানী করতে হবে। [১৪] তারপরে বনজ বস্তু দিয়ে আর কোন বিরোধ বাধে নি।

বাংলা ও আসাম সরকার কৃষি আয় সংক্রান্ত আয়কর আইন বিধানসভাতে পাশ করিয়ে প্রবর্তন করলে দেশীয় রাজন্যবর্গ মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়ে এবং সরকার ও রেসিডেন্সীর সঙ্গে পত্রাঘাত চলতে থাকে। ত্রিপুরা, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের রেসিডেন্টের নিকট ঐ আইন তাদের প্রতি প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবেদন পাঠায়। রাজন্য সভার সভাপতি ও কার্যকরী সমিতি ও বিষয়টি বৃটিশ রাজশক্তির গোচরে আনে। মন্ত্রী সভার পরিবর্তনের ফলে বঙ্গদেশের বিল ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত হলেও বিশেষ কার্যকরী করা যায় নি। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে উহা কার্যকরী করা হয়। বিলের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি উঠে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে উহা কার্যকরী করা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠে। প্রাদেশিক সরকার যখন প্রদেশের সীমার অভ্যন্তরে অবস্থিত দেশীয় রাজাদের জমির উপসত্বের উপর আয়কর আদায় করে তখন তারা সঠিক কাজই করেছিল এবং নিজেদের ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ করেছিল। সে ক্ষেত্রে কোন দেশীয় শাসককে কর রেহাই দেবার জন্য প্রশ্নই উঠে না। অপর দিকে ১৯৩৫

খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের মধ্যেও প্রাদেশিক সরকারকে এরূপ আইন তৈরী করতে নিষেধ করার বা বাধা দেবার কোন সুযোগ ছিল না। উপরন্তু সিভিল প্রসিডিওর কোড এবং ৮৬ ধারা ভারতীয় দেশীয় রাজন্যবর্গের ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করে দিয়েছিল। ফলে কোন শাসকই এই আইনের কবল থেকে রেহাই পেতে পারেন না (no right of immunity)। শেষ অবধি আর্ন্তজাতিক আইন প্রণেতা Earl of Birkinhad তাঁর পুস্তকে লিখেছিলেন 'a sovereign in one country holding land in another could not claim any immunity from the liabilities that might be imposed on the holders of land in that other country though was a sovereign in his own state"[১০] ফলে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর একপত্রে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সমূহের রেসিডেন্ট বীরবিক্রমকে জানান যে, তাঁর ২২ শে জুন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পত্রের পরিপ্রেক্ষিপ্তে ব্রিটিশ রাজ্যসরকার তাঁকে আসাম কৃষি আইন অনুসারে কর রদ করতে অপারগ। মহারাজ পুণরায় বৃটিশ সরকারকে লিখেন এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁকে জানানো হয় যে কেন তাঁকে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের জমিদারী স্থলে কর দিতে হবে না তার কোন কারণ ব্রিটিশ সরকার খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে শেষ পর্যন্ত আদালতের আশ্রয় নিতে হয়। অবশেষে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই কলিকাতা হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত জানায় যে ত্রিপুরা মহারাজা কৃষি কর দিতে বাধ্য নন।[১১] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিভূ ৮ই জুন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সার্টিফিকেট দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্য ও ব্রিটিশদের সম্পর্কের (Maharaja Bir Bikram Manikya vs Province of Assam and Bengal in Income Tax reference case 7 of 1943 and 7of 1945) বিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্ট দ্বারা নির্দেশিত হয়ে লিখেছে Tripura is an Indian state and the Maharaja is a ruler as defined in subsection (I) of the section 311 of the Govt of India Act 1935 But though His Highness is not thus Independent his Majesty's Government accord to him the status of a sovereign ruler under the suzerianity of His Majesty exercised through His Majesty's Representatives for the exercise of the function of the crown in its relation with Indian states. As such he possess various attributes of sovereigngty including internal sovereignty which is not derived from British law,but is inherent in the ruler, subject, however, to the suveranity of His Majesty and to the exercise by his Majesty's Representative of such Rights, authority and Jurisdiction as have by treaty, grant,usage, sufference or otherwise, passed to and are exerciseble by His Majesty.These include the conduct of international relations, the exercise of juridiction over European and American interference to settle dispute as to the succession of the state, the supression of gross misrule in the state and the regulation of armaments and strength of the military forces. The Maharaja is inregard to proceedings in the Civil Courts in India, covered by section 85 and 86 of the Indian code of civil procedure "[১১]

এই certificate এ রাজ্যের শাসকদের প্রকৃত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। কাজেই স্বাধীন ত্রিপুরা কেবল ত্রিপুরা রাজ্যের স্ট্যাম্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে

মনে করলে খুব বেশী ভুল করা হবে না কারণ সার্বভৌমত্ব ব্যতীত কোন শাসকই প্রকৃত স্বাধীন শাসক হতে পারে না। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে বীরবিক্রমের সম্পর্ক ও তার ফলে ব্রিটিশ সার্বভৌমের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আলাদা অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

ঃ তথ্য নির্দেশ ঃ-

১। Tripura Administration Report 1923-24, Para 10-11.
২। Foreign political 1929, File No- 577-P.36
৩। T.S.A.R. 1936-37.P.3
৪ T.S.A.R. 1943-46,P.20
৫। T.S.A.R. 1937-40. P.12
৬। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন পৃঃ ১৬২
৭। T.S.A R. 1932-33. P.3-4
৮। T.S.A.R. 1934-35. P.2
৯। T.S.R.A. 1943-46. P.13
১০। T.S.A.R. 1931-32. P.3
১১। Agartala Secretariate Pol.B 2 Correspondence regarding.draft instrument of accession.
১২। Agartala Secretariat Pol. B.02.5.15 Amlighat toll No $\frac{1161P}{1-8}$ dt 23.7.1930
১৩। T.S.A.R 1925-26 PQ. 21, 22.
১৪। T.S.A.R. 1929-30 P.24
১৫। International law, 6th Edition, P.127
১৬। Agartala Secretariate Pol. B-28 Acquisition of zemindary by East Bengal Govt Chakla Roshnabad Estate.1948-49
১৭। Certificate of Political Department Signed by L.C.L Griffin, Sec retary to His Excellency the crown representative on 8th June 1945 at New Delhi and submitted to Calcutta High Court for determining the status of the Ruler of Tripura State.(Agartala Secretariate B-18-s-2.Agricultural Income Tax reference case to Calcutta High Court.

বীরবিক্রম ঃ কর্মচারীবর্গ

নিয়োগ ঃ বীরবিক্রমের আমলে ত্রিপুরা রাজ্য প্রশাসনে বহু কর্মচারীর লকব দেখা যায়। মোট কর্মচারীর সংখ্যা কত ছিল তা সাক্ষ্যের অভাবে আমরা জানতে পারছিনা। সাধারণতঃ কর্মখালীর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ করা হত। এরূপ কর্মখালীর বিজ্ঞপ্তিতে পদের নাম, সংখ্যা, বেতন, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি গেজেটিয়ার সঙ্কলনে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যই বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই উচ্চতর পদে লোক নিযুক্ত হত। বিশেষ করে মন্ত্রী, হাইকোর্টের জজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি দৃষ্ট হয়না। কিন্তু ডাক্তার উচ্চতর পদের লোক হলেও তাদের নিযুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেখা যায়।[১]

লকব Designation ঃ রাজ্যসরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের লকব বা পদের নাম যথাসাধ্য চেষ্টা করে যা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, দেওয়ান, সিনিয়ার নায়েব, দেওয়ান, স্টেট ইঞ্জিনীয়ার, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, স্টেট ফিজিসিয়ান, ষ্টেট হোমিওপ্যাথ নায়েব দেওয়ান, ষ্টেট পাবলিশার, ম্যানেজার (চাকলা), সেক্রেটারী, আন্ডার সেক্রেটারী, মিলিটারী সেক্রেটারী, প্রাইভেট সেক্রেটারী, চিফ অব স্টাফ, নিজ তহবিল সেক্রেটারী, এডি কঙ্গ, চিফজাজ, জাজগণ, সহকারী স্টেট ফিজিসিয়ান, বেকট্রিওলজিস্ট, এস্টিরেবিক ফিজিসিয়ান, রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান, রাজবৈদ্য, পুলিশ কমিশনার, পুলিশ সুপার, সহকারী পুলিশ সুপার, সুপারভাইজার, ডেপুটি ম্যানেজার (চাকলা), সদর ম্যাজিস্টেট, সদর কালেক্টার, ট্রেজারী অফিসার, কৃষি সুপার, সার্ভে সুপার, সিভিল সার্ভিস কর্মচারীবৃন্দ ও প্রবেশনারগণ পার্সোনাল অফিস এসিষ্টেন্ট, সুপারটিচার কুমার বোর্ডিং হাউস,স্টেট এডভোকেট, লিগেল এডভাইসার, সদর রেজিস্ট্রার, রাজপন্ডিত, দ্বার পন্ডিত, রাজ্য মিলিটারী অফিসারবৃন্দ, চিফ দেওয়ান, ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক, নার্স, প্রেসম্যান, পেস্কার, হেডক্লার্ক, মোহেরার, সেরেস্তাদার, নায়েব, অডিটার,লাইব্রেরীয়ান, ফরেষ্ট ইন্সপেক্টর, স্কুল ইনসপেক্টর, স্কুল সাব ইনসপেক্টার, হেড মাস্টার, ডি.পি.আই, সঙ্গীত শিক্ষক, ট্রান্সলেটার, টিউটর, ক্রীড়া শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, শিক্ষক, বোর্ডিং টিউটর, অ্যাংলো সংস্কৃত শিক্ষক, অ্যাংলো পার্শী শিক্ষক, মৌলবী, ভূগোল শিক্ষক, কম্পাউন্ডার, প্যালেস সুপারিনটেনডেন্ট,

জমাদার, দারোগা, নায়েব দারোগা, জমাদার, পিয়ন, কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল, টিউট্রেস (মহারাজ কুমারী), খাজাঞ্চী, Geological Advisor, আর্দালী, বরকন্দাজ, বাজে চাকরান, রেভিনিও ইনসপেক্টার, কাস্টম ইনসপেক্টার, ফরেস্ট অফিসার, ফরেস্টার, রেঞ্জার, ওভারসিয়ার, সুপার ভাইজার (পূর্ত), নকল নবীশ, সেহানবীশ, প্যালেস লাইব্রেরীয়ান প্রভৃতি।

বেতনক্রম Pay Scale :- এই সব অধিকারী ও কর্মচারীবর্গের সকলের বেতনক্রম বা Pay Scale উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, তবে কিছু উদ্ধার করা গেছে যেমন- ডাক্তার ১৫০-১০-২৫০, নার্স ৪০-২-৮০, ফরেস্ট ইনসপেক্টার ৬০/৫/২/৮০, ডি. পি. আই ২০০-১০-৩০০, টিউটর মহারাজ কুমারী ১৫০টা ৩৫০ টাকা ভাতা, সঙ্গীত শিক্ষক ১৫, ক্রীড়া শিক্ষক ২০,সহকারী শিক্ষক ৪০-২-৬০ এবং ৫০-৫-৭৫, বোর্ডিং টিউটর ৪০-২-৬০, অ্যাংলো সংস্কৃত শিক্ষক ৩০-২-৫০, হিল সাবইন্সপেক্টার অব স্কুল ১৫+১০ ডি. এ. আংলো পার্শী শিক্ষক ৩০-৪০ টাকা, মৌলবী ২০, ভূগোল শিক্ষক ৭০, সহকারী শিক্ষক ৩০-২-৫০, প্রেসম্যান ১০-১-২০, নায়েব ২০-২-৩০, চিফ জজ ৫০০-৭০০, প্যালেন লাইব্রেরীয়ান ৬০, ফিনান্স মিনিস্টার ১২০০ ইত্যাদি বেতন ক্রম ভোগ করত।

ভাতা (Dearness Allowance) : ১৩৩৭ সনের শ্রাবণ মাস থেকে রাজকর্মচারীদের দুর্মূল্য ভাতা দেবার নির্দেশ দেখা যায়। মহামান্য শাসন পরিষদের ২৯/৩/৩৭ তারিখের ১২ নং অধিবেশনের এক নং নির্দ্ধারণ দ্বারা বর্তমান সনের লাগায়েত শ্রাবণের দুর্মূল্যের এলাউন্স মঞ্জুর হইয়াছে। চিকিৎসা ও পুলিশ সম্বন্ধে চূড়ান্ত আদেশ হয় নাই। অতএব উহা বাদে অন্যান্য বিভাগের উপরিউক্ত সময়ের এলাউন্স পূর্ব নিয়মানুসারে খরচ লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক।[২]" এখানে "পূর্ব নিয়মানুসারে" খরচ লেখার নির্দেশে বুঝা যায় পূর্বেও দুর্মূল্যভাতা দেওয়া হত তবে কবে এই প্রথার সূচনা হয়েছিল এবং কি পরিমাণে ভাতা দেওয়া হত তা সাক্ষ্যের অভাবে আমরা জানতে পারছি না।

পাথেয় ভাতা (Travelling Allowance) : সরকারী কর্মচারীদের নিজ কর্মস্থল থেকে দূরে সরকারী কাজে পরিভ্রমণ কালে পাথেয় ভাতা (T.A) দেওয়া হত। T.Aর হার না জানা গেলেও ভাতা সম্বন্ধীয় সাতই কার্ত্তিক ১৩৪৩ ত্রিং সনের মেমো থেকে জানা যায়- "ভাতা পাথেয় সম্বন্ধীয় সংশোধিত নতুন নিয়মাবলীর ৩৯ ধারায় "কোন কর্মচারী পরিভ্রমণ কালে হস্তী ও অশ্ব ব্যতীত অপর সকল সরকারী যান ব্যবহার করিলে এবং তাহা চালাইবার ব্যয় সরকার হইতে প্রাপ্ত হইলে কোন মাইলেজ পাইবেনা" এবং ৪০ ধারায় সরকারী ব্যয়ে ভাড়া করা হস্তী বা অশ্বযোগে মফঃস্বল পরিভ্রমণ করিলে নিয়মিত হারের অর্দ্ধেক মাইলেজ পাইবে বিধান আছে।"[৩]

সিভিল সার্ভিস :- ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিস বীর বিক্রমের শাসন কালের পূর্বেই গঠিত হয়েছিল। উহা মোট ৪ গ্রেডে বিভক্ত ছিল যথা ১ম, ২য়, ৩য় ও চতুর্থ। ১৩২৬ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠন করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. বা তদুর্দ্ধ পরীক্ষায় পাশ ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিদের উক্ত সার্ভিসে গ্রহণ করা হত। মোট বাইশটি পদ এই সার্ভিসের অন্তর্গত ছিল- যেমন চিফ জজ, খাস আদালত, দ্বিতীয় জজ খাস আদালত, চিফ দেওয়ানের প্রথম সহকারী, চিফ দেওয়ানের দ্বিতীয় সরকারী, মাণিক্য বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী, চাকলার এসিস্টেন্ট ম্যানেজারগণ, কালেকটার, ম্যাজিস্ট্রেট মুন্সেফগণ, জেনারেল ট্রেজারী অফিসার,পুলিস

সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী পুলিশ সুপারিটেনডেন্ট, নায়েব দেওয়ান (সংসার) বন্দোবস্ত কার্য্যকারক (Settelment officer), সহকারী বন্দোবস্ত কার্য্যকারক, বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের সহকারীগণ (Second officers), সদর ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারীগণ, বনকর অফিসার, স্কুল ইন্সপেক্টার, অডিটর, উপবিভাগীয় কর্মচারী (S.D.O.), সহকারী ম্যানেজার, লাহারপুর, সাবম্যানেজার (চাকলা) এবং সদর রেজিস্ট্রার আগরতলা। `

এই সার্ভিস ৪টি গ্রেডে বিভক্ত ছিল। গ্রেড অনুযায়ী বেতনক্রম ছিল প্রথম শ্রেণী : ২৫০-১০-৩০০ পদ সংখ্যা৫। দ্বিতীয় শ্রেণী ১৫০-১০-২৫০ পদ সংখ্যা ৫, তৃতীয় শ্রেণী ১০০-১০-১৫০ পদ সংখ্যা ১০ এবং চতুর্থ শ্রেণী ৭৫-৫-১০০ পদসংখ্যা ১৫। ১ম, ২য়, ও ৩য় শ্রেণীর কার্য্যকারগণ "কালেক্টাব ও ম্যাজিস্টেট এবং ৪র্থ শ্রেণীর কার্য্যকারকগণ "সহকারী কালেক্টার ও ম্যাজিস্ট্রেট" শ্রেণীর কার্য্যকারক বলে গণ্য হত। ৪র্থ শ্রেণীর কার্য্যকারক নিযুক্তির এক বৎসরের মধ্যে বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ না করলে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারত না।[৭] বীর বিক্রমের আমলে ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ ত্রিং সনে ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠিত হয়। এবারে গ্রেড সংখ্যা দেখা যায় ৫টি যেমন সিলেকসান গ্রেড ৩টি পদ, প্রথম গ্রেড ৫টি পদ, ২১০-১০-৩০০ টাকা দ্বিতীয় গ্রেড ১০টি পদ ১৩০-১০-২০০টাকা, তৃতীয় গ্রেড ৮টি পদ ১০০-৫-১২৫ টাকা, চতুর্থ গ্রেড ৪টি পদ ৭০-৫-৯৫ টাকা। ৪র্থ গ্রেডের কার্যকারকগণ বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নত হইবার অধিকারী হইবে না। এতদ্দারা নিজ নিজ গ্রেডে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পাইতে বাধা হইবে না। তৃতীয় গ্রেডের যে সকল কর্মচারী বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে গ্রেড বৃদ্ধি বা প্রমোশন পাইতে পারিবেন না।"[৮]

গেজেটেড কর্মচারী নির্ধারণ ঃ ৯ই আষাঢ় ১৩৪৫ ত্রিপুরাব্দে বীরবিক্রম রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে কোন কোন পদের কর্মচারী গেজেটেড তা নির্ধারণ করেন এবং তাদের নিযুক্তি, পরিবর্তন ও বিদায় ইত্যাদি যথারীতি গেজেটে প্রকাশিত করার নির্দেশ দেন। মোট ৩৯ প্রকারের কর্মচারীর মধ্যে রাজমন্ত্রী, চিফ সেক্রেটারী, মিলিটারী সেক্রেটারী, প্রাইভেট সেক্রেটারী, চিফস্টাফ অফিসার, নিজ তহবিল সেক্রেটারী, এ ডি কঙ্গ, চিফ জজ, অপর জজগণ, মন্ত্রী অফিসের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ, স্টেট ফিজিসিয়ান, সহকারী স্টেট ফিজিসিয়ান, স্টেট ব্যাকটিরিওলজিস্ট, এন্টিরেবিক ফিজিসিয়ান, রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান, কৃষি সুপারিটেনডেন্ট, সার্ভে সুপারিনটেনডেন্ট, রাজঅন্তঃপুরের ডাক্তারগণ, রাজবৈদ্য কবিরাজ, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, স্টেট ইনজিনিয়ার, সুপারভাইজার, ডেপুটি ম্যানেজার চাকলা, চাকলার এসিস্টেন্ট ম্যানেজারগণ, সদর ম্যাজিস্ট্রেট, সদর কালেক্টার, মফঃস্বলস্থ বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ, সিভিল সার্ভিসের অন্যান্য কর্মচারী ও প্রবেশনারগণ, আন্ডার সেক্রেটারী, পার্সোনাল অফিস এসিস্টেন্ট, হাইস্কুলের হেড মাস্টারগণ, সুপারিনটেনডিং শিক্ষক কুমার বোর্ডিং, গার্জিয়ান শিক্ষক ঠাকুর বোডিং, স্টেট এডভোকেট, লিগেল এডভাইসার, সদর রেজিস্ট্রার, রাজপন্ডিত এবং স্টেট মিলিটারী অফিসারগণ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৯]

প্রতিজ্ঞাপত্র ঃ প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে কর্মে যোগদানের পূর্বে নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাপত্রে সাক্ষর করতে হত। "আমি এতদ্বারা ধর্ম্মত: প্রতিজ্ঞাপূর্বক শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজ মানিক্য বাহাদুরের ও তদীয় শাসন নীতির প্রতি আমার গভীর ভক্তি ও একনিষ্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেছি এবং

প্রতিজ্ঞাপূর্বক জানাইতেছি যে আমি সর্বদা শাসন বিভাগের দেওয়ান প্রবর্তিত নীতি প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইয়া নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার সহায়তা করিব।"[৮]

উদ্দীপক (Incentives) ঃ (ক) প্রশিক্ষণ ঃ- কর্মচারীদের সরকারী কার্যে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে এবং রাজ্য শাসন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করাবার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু নির্বাচিত রাজ কর্মচারীদের বীরবিক্রম বিদেশে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করতেন। বলা বাহুল্য সরকারী ব্যয়ে এরূপ অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ জুটত কিছু কিছু কর্মচারীর জন্যে। ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের (১৯৩৯ খ্রীঃ) এক আদেশে দেখা যায়-"যেহেতু রাজ্য শাসন ও রাজ্যে উন্নতি বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য প্রতি বৎসর রাজ্যের কয়েকজন কর্মচারীকে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ শাসিত প্রদেশ সমূহে এমনকি ইউরোপ, জাপান প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, অতএব আদেশ হইল যে- আলোচনাপূর্বক মন্ত্রীপরিষদ এ তৎবিষয়ে এ পক্ষ সমীপে মন্তব্য ও আবশ্যক মনে করিলে প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।"[৯]

(খ) নগদ অর্থ পুরস্কার ঃ কর্মচারীদের উৎসাহ বাড়াবার জন্য ও রাজকার্য কুশলতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য বীরবিক্রম প্রতি বছর গেজেটেড, টি সি এস এবং অন্যান্য আমলা শ্রেণীর কর্মচারীদের বার্ষিক নগদ অর্থ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। ২রা কার্তিক ১৩৪৬ ত্রিং সনের ১৫ নং মেমোতে দেখা যায়- "যেহেতু রাজ কর্মচারীগণের কর্মতৎপরতা ও কুশলতার জন্য এবং তাহদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে প্রতি বৎসর পুরস্কার বিতরণ করা এ পক্ষের অভিপ্রেত অতএব আদেশ কবা যায় যে- অতঃপর বর্ষ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করার নিমিত্ত, ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য গেজেটেড অফিসার আখ্যা ভুক্ত কর্মচারীবর্গের মধ্যে দুইজনকে এবং আমলা শ্রেণীব কর্মচারীগণ যাহারা কর্তব্যনিষ্ঠায় ও কার্যদক্ষতায় সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাদিগের মধ্য হইতে ৩ জনকে প্রত্যেক বিজয়াদশমী দরবারে এ পক্ষ কর্তৃক নিম্নলিখিত রূপ পুরষ্কার প্রদত্ত হইবে।"[১০] টি সি এস ও অন্যান্য গেজেটেড অফিসারদের জন্য প্রথম পুরষ্কার ৭০১ টাকা, দ্বিতীয় পুরষ্কার ৩০১ টাকা এবং আমলা শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য প্রথম পুরস্কার ২৫১ টাকা, দ্বিতীয় পুরষ্কার ১৫১ টাকা এবং তৃতীয় পুরষ্কার ১০১ টাকা ঘোষিত হয়েছিল।

গ) পদক ও উপাধি প্রদান ঃ কর্মকুশলতা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার স্বীকৃতি দিতে মনস্থ করে বীরবিক্রম উপযুক্ত লোকদের কিছু পদবী, পারিতোষিক উপাধি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে তিনি আশা করেছিলেন যে রাজ কর্মচারী ব্যতীত অন্যেরাও এর আওতায় এলে রাজ্যের কলা কুশলীরা সম্মানিত বোধ করবেন। ২৫শে আষাঢ় ১৩৪৫ ত্রিং সনের (১৯৩৫ ইং) এক আদেশে দেখা যায়-"যেহেতু রাজ আজ্ঞা প্রতিপালনকালে কর্মকুশলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য ও সর্বসাধারণের উপকার কল্পে কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত উৎসাহ বদ্ধনার্থ প্রতিষ্ঠা সূচক পদক প্রদান করা এ পক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ করা যায় যে অতঃ পর যাহারা রাজকার্য তৎপরতা পূর্বক সম্পন্ন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন অথবা স্বপ্রনোদিত হইয়া জনহিতকর কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া কীর্তি অর্জন করিয়াছেন এবং যাহাদিগের কার্যাবলী এপক্ষের সন্তোষের বিষয় হইয়াছে তাহাদিগকে উহার নিদর্শন স্বরূপ নিম্ন লিখিত পদক সমূহ দরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।[১১] পদকগুলি হচ্ছে (১) কর্মবীর (১ম শ্রেণী, ৪টি বেশী নয়) ২য় শ্রেণী (৮টির বেশী নয়); সম্পন্ন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন অথবা স্বপ্রনোদিত হইয়া জনহিতকর কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া কীর্ত্তি অর্জন করিয়াছেন

এবং যাহাদিগের কার্য্যাবলী এ পক্ষের সন্তোষের বিষয় হইয়াছে তাহাদিগকে উহার নিদর্শন স্বরূপ নিম্ন লিখিত পদক সমূহ দরবার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।"[১১] পদকগুলি হচ্ছে (১) কর্মবীর (১ম শ্রেণী,৪টার বেশি নয়),২য় শ্রেণী (৮টির বেশী নয); ১ম শ্রণীর ক্ষেত্রে স্বর্ণ মুদ্রা ১/ " ব্যাস বিরূদ সহ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীব ক্ষেত্রে বৌপ্য মুদ্রা ১/ " ব্যাস, বিরূদ সহ। (২) কর্মাদক্ষ (১ম শ্রেণী ১০টির অধিক নয়) বিরূদ সহ বৌপ্য মুদ্রা ১/ " ব্যাস, দ্বিতীয় শ্রেণী (১৫টির অধিক নয়) রৌপ্য মুদ্রা ১/ " ব্যাস বিরূদ সহ। (৩) কর্মনিষ্ঠ রৌপ্য মুদ্র ১/ " ব্যাস যুক্ত। বিরূদ সহ(এক সময়ে ৫০টির অধিক হবে না) (৪) পারিতোষিক রূপে বিরূদ ব্যাসযুক্ত যুক্ত রৌপ্য মুদ্রা,১

(ঘ) উচ্চ শ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্মানঃ রাজকার্যে বিশেষ কুশলতাব জন্য উচ্চ শ্রেণীব প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে দেওয়ান বাহাদুর, দেওয়ান, ও নায়েব দেওয়ান উপাধি ভূষিত করার ঘোষণা লক্ষ্য করা যায় ৪ঠা কার্তিক ১৩৪৬ ত্রিং সনের (১৯৩৬ খ্রীঃ) বীরবিক্রমের এক ঘোষণায়- "যেহেতু প্রভাবান্বিত প্রখ্যাত (meritorious and distinguished) রাজসেবার পুরস্কার স্বরূপ যোগ্য ব্যক্তিগণকে উপাধি দ্বারা ভূষিত করা এ পক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ হইল যে উল্লিখিত বিশেষ কারণ সমূহদ্বারা যাহারা এ পক্ষের সন্তোষভাজন হইবেন অবস্থালোচনায় তাহাদিগকে দেওয়ান বাহাদুর (নিম্নবর্ণিত পদকসহ) অথবা দেওয়ান কিংবা নায়েব দেওয়ান উপাধি দরবার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।"[১২]

(ঙ) বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্মান ঃ এছাড়া রাজ্যের বিশেষ সম্মানিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের (যদিও তাঁরা বাজসরকারেব অতি উচ্চ পদগুলি অলংকৃত করতেন) বীরবিক্রম, মান্যবর, মহামান্যবর উপাধি পদক ও সনন্দ প্রদান করে সম্মানিত করেছিলেন। যদিও প্রাপক ব্যক্তিবর্গ অধিকাংশই তাঁর পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়স্বজন তবু তাঁদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে বীরবিক্রম রাজনৈতিক চতুরতা ও দূরদৃষ্টির পবিচয় দিয়েছিলেন। মহামান্যবব উপাধি পিতামহ নবদ্বীপ চন্দ্রকে, মান্যবর ও পরে মহামান্যবর উপাধি খুড়া ব্রজেন্দ্র কিশোরকে এবং মান্যবর উপাধি মন্ত্রী ও মাতুল রাণা বোধজং বাহাদুরকে অর্পণ করার সাক্ষ্য বয়েছে।[১৩] রাজ পরিবারের বাইরে কেবলমাত্র কর্মদক্ষতা, রাজানুরক্ততার জন্য মন্ত্রী জ্যোতিষচন্দ্র সেনকে মান্যবর উপাধি দেওয়া হয়েছিল।[১৪]

প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রবর্তন ঃ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার প্রথম রাজা যিনি কর্মচারীকুলের জন্য জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রবর্তন কবেন। ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের ৯ই আষাঢ় (১৯৪০খ্রীঃ) এক আদেশ বলে রাজা কর্মচারীদের জন্য এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। "যেহেতু কর্মচারীগণের সুবিধার্থে রাজ্যে একটি জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড সৃষ্টি করা সমীচিন বিবেচিত হইতেছে, অতএব আদেশ করা যায় যে এতদ্বারা রাজ্যের কর্মচারীবর্গের নিমিত্ত একটি জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রবর্তন করা যায়। এই প্রভিডেন্ট ফান্ডে রাজ্যের প্রত্যেক কর্মচারীকে স্বীয় বেতনের টাকা প্রতি সর্বনিম্ন/এক আনা ৬ পাই হারে মাসিক জমা রাখিতে হইবে। কোন কর্মচারী ইচ্ছা করিলে নিয়মিত ভাবে এই হারের অতিরিক্তরূপে এই ফান্ডে টাকা জমা করিতে পারিবে। কিন্তু এ পক্ষের আদেশ ব্যতীত সর্বনিম্ন হারের ব্যতিক্রম হইতে পারিবেনা। প্রভিডেন্ট ফান্ডে প্রতি কর্মচারীর মাসিক জমা টাকার উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইবে। এই প্রভিডেন্ট ফান্ড ১৩৫০ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখ হইতে প্রবর্তিত গণ্য হইবে।"[১৫]

পেনশন ঃ ত্রিপুরা রাজসরকারের কর্মচারীগণ অবসর গ্রহণের পরে সরকারের কাছ থেকে

পেনশন পেত। অবশ্যই রাজার ইচ্ছার উপর পেনশন দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করত। বীরবিক্রমের পূর্বে একটি মাত্র পেনশনের সংবাদ গেজেটে দেখা যায়। ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে ডাক্তার রাজমোহন বসুকে পেনশন দেবার জন্য মন্ত্রী উমাকান্ত দাস সুপারিশ করেন। তিনি লিখেন-"এখানে পেনশন সম্পর্কে লিখিত বিধিনাই, শ্রী শ্রীযুতের কৃপা হইলে রাজমোহন বাবুকে মাসিক ৩০ টাকা পেনসন দেওয়া যাইতে পারে। তিনি যত্ন সহকারে দিবারাত্রি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন এবং অবস্থানুসারে যেরূপ দয়ারপাত্র তাহাতে তিনি এই পরিমাণ পেনশন পাইবার উপযুক্ত।"[১৬] অবশ্যই রাধাকিশোর পেনশান মঞ্জুর করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পেনশন আইন তৈরী হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে বীরবিক্রমের আমলে অনেক আমলা পেনশন পেতেন তা লেখক নিজেও দেখেছেন। উচ্চ শ্রেণীর বাজকর্মচারীদের মধ্যে চাকলার ম্যানেজার ও দেওয়ান শাসন বিজয়কুমাব সেন বাহাদুরকে বীরবিক্রমের ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দের ৫ই অগ্রহায়ণের আদেশে মাসিক ৩৫০ টাকা পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছিল।[১৭]

কর্ম বিভাজন ঃ (১) দৈনিক ডায়েরী লিখন ঃ- কর্মচারী অফিসে এসে দৈনিক কি কি কাজ করল তা জানার জন্য বীরবিক্রম কর্মচারীদের দৈনিক ডায়েরী লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ১৩৩৯ ত্রিং সনের ১৩ই মাঘ তারিখের মহাফেজখানার এক মোহেরার এবং নকল নবীশের ডায়েরীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। মোহেরার লিখেছেন "অদ্য অফিসে আসিয়া জেনারেল সেহনবীশ বাবুর নিকট ডাকের কাগজের দুইখানায় মোড়ক লাগাইয়া পিয়ন বহিতে ভুক্ত করত বিলি করান গেল। তৎপর দুইখানা চালান শুদ্ধ লিখা হয় এবং একখানা নকলের দরখাস্তে আদেশ লিখা হয়। ৭খানা কাগজে নোট দিয়া পেশ করা হয়, তৎপর ৪ খানা কাগজ ফাইল সামিল করা হইল। অফিসের উপস্থিতি মতে অন্যান্য কার্য করা হয়।[১৮] নকল নবীশ লিখেছেন "অদ্য অফিসে আসিয়া নকল সেরেস্তার কার্য করা হয় ও অফিসের অন্যান্য কার্যের সহায়তা করা হয়।"[১৯]

(২) সুনির্দিষ্ট কর্মবিভাজন ও ক্ষমতা প্রদান ঃ ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দে (১৯৩৯ খ্রীঃ) বীরবিক্রম বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ, সেক্রেটারী ও আন্ডার সেক্রেটারীগণের সুনির্দিষ্ট কর্ম বিভাজন ও ক্ষমতার নির্দেশ সূচক আদেশ জারী করেন যাতে দেখা যায় যে মন্ত্রীগণের অধীনস্থ সেক্রেটারীগণ নিম্নপদস্থ কর্মচারীর নিয়োগ বিদায়, পরিবর্তন, দন্ড, উন্নতি ও গ্রেড বৃদ্ধি, ব্যয় মঞ্জুর, বন্দোবস্ত বিধি, আপিল, বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকদের আদেশের পুণরালোচনা এবং সাধারণ প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত ক্ষমতার সংকোচনও করা হয়েছে যেমন মন্ত্রীর আদেশে সেক্রেটারীর ক্ষমতা প্রত্যাহার, সেক্রেটারীর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল, সেক্রেটারীগণের আদেশেব পুনবালোচনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আন্ডার সেক্রেটারীগণের কার্যস্থল দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যেমন কোন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর অধীনে এবং ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মন্ত্রীর অধীনে। সেক্রেটারীর অধীনস্থ আন্ডার সেক্রেটারীগণ ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর আদেশে ও উপদেশ অনুসারে মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণের কাজ করবেন। মন্ত্রী বা উর্দ্ধতন সেক্রেটারীর আদেশ না হলেও দৈনিক রেকর্ড, হিসাব, ক্যাশ পরীক্ষা, পেন্ডিংশিট প্রস্তুত করা, আদেশের মুসাবিদা সেক্রেটারীর নিকট উপস্থিত করা, জমা ও সেহা পরীক্ষা করা, হাওলাতের লিস্ট প্রস্তুত করা, হাওলাত আদায়ের ব্যবস্থা করা, পদাতিক

শ্রেণীর কার্যকারকদের হাজিরা রক্ষা ও পরীক্ষা করা, নিজ সেরেস্তার কার্য পরিচালনা করা, কিছু প্রি-অডিট বিল মঞ্জুর করা, অফিস স্টাফের বেতনের বিলে সেক্রেটারীর অনুমোদনে সাক্ষর করা, বিদায়ের খতিয়ান পরীক্ষা করা, প্রয়োজনে মন্ত্রীর নির্দেশে মফঃস্বল পরিভ্রমণ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারীগণ স্বভাবতঃই সেক্রেটারীর সমস্ত কাজ করবেন এবং মন্ত্রী পরিষদেব অনুমোদন সাপেক্ষে সেক্রেটারীব কোন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন।

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকদের বিশেষ, প্রথম, দ্বিতীয় এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে তাদের ক্ষমতার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, অনুরূপভাবে সেকেন্ড অফিসার ও অন্য এসিস্টেন্ট কালেক্টারদেরও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশেব ক্ষমতাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিভাগীয় কার্য্যকারকদের ক্ষমতা বিভিন্ন বিভাগের ক্ষেত্রে নিয়োগ, বিদায়, পরিবর্তন, দন্ড, ব্যয় মঞ্জুরী, বন্দোবস্ত ও বিবিধ, আইনত: ক্ষমতা ও আপীল ইত্যাদি ৮টি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।[১০]

কর্মচারী সম্মেলন ঃ রাজকার্য সুচারুরূপে পরিচালনা করা এবং রাজ্যের উন্নতির জন্য বীরবিক্রম রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে বৎসরে একবার রাজধানীতে সম্মেলন করতেন। এই সম্মেলনে কাজের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধাসমূহ আলোচনা হত। প্রত্যেক কর্মচারী কাজ ত্বরান্বিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিজ নিজ মন্তব্য সভায় উপস্থাপন করতে পারতেন। এরূপ একটি সম্মেলনের জন্য রাজার নির্দেশ দেখা যায়-''রাজ্যের কার্য্য পরিচালন ও উন্নতিকল্পে প্রতি বৎসর একবার প্রধান প্রধান সমুদায় কর্মচারীর রাজধানীতে একত্রিত হইয়া আলোচনা করা আবশ্যক মনে হওয়ায় প্রথম সম্মেলনের দিন আগামী পূজাবকাশের পরে হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত। অন্যান্য সনের তারিখ পরে জানান হইবে। এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত চিফ সেক্রেটারী করিবে। ইতি সন ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে তারিখ ১৬ই আশ্বিন।''[১১] পরে আরও এরূপ সম্মেলন হয়েছিল কি না তা সাক্ষ্যের অভাবে জানা যাচ্ছে না।

কর্মচারীদের পোষাক ঃ বীর বিক্রম রাজদরবারী, হাকিম, অন্যান্য কর্মচারীদের অফিসে কাজ করার কালে নির্দিষ্ট পোষাক (Uniform) পরিধান করার নির্দেশ দেন। দেখা যায় ২৭শে বৈশাখ ১৩৪৫ (১৯৩৫ ইং) ত্রিং সনের এক আদেশে বাজদরবারের পোষাক সম্বন্ধে নির্দেশ রয়েছে- " রেশম বা যেকোন প্রকার উপযোগী কালো রং ব্যতীত কাপড়ের আচকান বা চাপকান (হাঁটু হইতে ৬ ইঞ্চি লম্বা হইলে ভাল হয়) (২) চুড়িদার পাজামা (৩) সাদা অথবা কালো রং ভিন্ন অন্য যে কোন রং -এর পাগড়ী (৪) তলোয়ার। এবং বিশেষ দরবার উপলক্ষে ১) বেনারসী কিংখাপ বা তাস ঢাকাই বুটিদার, রেশন বা সার্টিনের ব্রকেডের আচকান কিং বা চাপকান (কালো রং ব্যতীত) ২) পায়জামা চুড়িদার ৩) সাদা অথবা কাল ভিন্ন অন্যকোন রঙের পাপড়ী (৪) তলোয়ার।[১২]

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ ত্রিং সনের (১৯৩৭ ইং) এক আদেশ দ্বারা বীরবিক্রম গেজেটেড অফিসার, উচ্চ পদস্থ ও অন্যান্য কর্মচারীদের অফিসাদিতে গমনাগমণ কালে এবং কার্য উপলক্ষে রাজবাড়ীতে আসবার কালে চুড়িদার পাজামা, আচকান চুড়িদার, পায়জামা, লম্বা পাঞ্জাবী ও গলাবন্ধ বাঠীকোট, যোধপুর ব্রিচেস ও গলাবন্ধ বাঠী কোর্ট; ঢিলা অথবা চুড়িদার পায়জামা ও চোগা চোপকান, ইংলিস সুট এবং তৎসহ টুপি অথবা পাগড়ী ব্যবহারের নির্দেশ দেন।[১৩] হাকিম ও অন্যান্য কর্মচারীদেরও নির্দিষ্ট পোষাক ব্যবহার করতে হত। হাকিমদের পোষাক চাপকান, আচকান অথবা কোর্ট পেন্টালুন

অথবা পায়জামা এবং পাগড়ী অথবা টুপি। সেরেস্তাদার, পেস্কার, হেডক্লার্কগণ ও জেনারেল ট্রেজারীর খাজাঞ্চীদেরও পোষাক ছিল পেন্টালুন, বা পায়জামা, আচকান বা কোট এবং টুপি বা পাগড়ী।"[২] রাইটার, নায়েব দারোগাদের পোষাক ছিল "মাথায় কালো গোল টুপি পিতলের মনোগ্রাম যুক্ত,হেড কনস্টেবলের কোটেব অনুরূপ খাকি কোটপিতলের I.T P ব্যাজ যুক্ত হাফ পেন্ট, বুট জুতা এবং পট্টী।"[২৫]

-ঃ তথ্য নির্দেশ ঃ-

১। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন		ঃ	স্টেট গেজেট সংকলন, আগরতলা, ১৯৭১, পৃ: ৩৫১
২।	ঐ	ঃ	ঐ, পৃ: ৩২৭
৩।	ঐ	ঃ	ঐ, পৃ: ৩২৯
৪।	ঐ	ঃ	ঐ, পৃ: ৭১
৫।	ঐ	ঃ	ঐ, পৃ: ৭২
৬।	ঐ	ঃ	ঐ, পৃ: ২৬৩
৭। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায়		ঃ	রাজগী, পৃ: ২১৭-২১৮
৮।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ১৪৫
৯।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ২২০
১০।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ৬৬
১১।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ৬৩
১২।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ৬৭। পদকের বিবরণের জন্য মেমো নং ৯৬, ৪.৭ ১৩৪৬ ত্রিং দ্রষ্টব্য।
১৩।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ১৩৬
১৪।	ঐ	ঃ	রাজগী পৃ: ১৪৭। ২.৭.১৩৪৬ ত্রিং এর আদেশ বয়েছে বাজগী পৃ: ৬৫ তে যেখানে মান্যবর ও মহামান্যবর পদকের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।
১৫। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন		ঃ	গেজেট সংকলন-পৃ ঃ ১৫৭
১৬।	ঐ	ঃ	পৃঃ ৬
১৭। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায়		ঃ	রাজগী, পৃ: ১৪৫
১৮।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ৪২৮
১৯।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ৪২৯
২০।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ১৫৫-১৬৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্য উপরোক্ত পৃষ্ঠা সমূহ দ্রষ্টব্য।
২১।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ৫৮
২২।	ঐ	ঃ	রাজগী, পৃ: ৬১
২৩। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন		ঃ	গেজেট সংকলন, পৃ: ১৪৯
২৪।	ঐ	ঃ	ঐ, পৃ: ৩৭২-৭৩
২৫।	ঐ	ঃ	ঐ, পৃ: ৩৮০

বীরবিক্রম ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও প্রজারক্ষা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার কালে বীরবিক্রম বিশ্বপরিক্রমায় নিউইয়র্কে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি ভারতের ভাইসবয়কে কেবল যোগে নিজের ব্যক্তিগত সেবা (Personal Services) এবং রাজ্যের সমস্ত সম্পতি মহাযুদ্ধের সফল সমাপ্তি প্রত্যাশায় বৃটিশ রাজা ও সার্বভৌম সম্রাটের নিকট প্রদান করেন। পুনবায় লস এঞ্জেলস থেকে ক্যালিফোর্নিয়া রেডিও তে এক বেতার ভাষণে তিনি তাঁর সংকল্প ব্রিটিশ বাহিনীর জয় কামনা করেন। তাঁর এই ভাষণ আমেরিকান প্রেস কর্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল।[১]

যুদ্ধ কমিটি ঃ- ২৫শে জানুয়ারী ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভ্রমণ সেরে বীরবিক্রম আগরতলায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ৩০ শে বৈশাখ ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ যাত্রার পূর্বেই তিনি ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলাকালীন উদ্ভুত সমস্যা সমূহ সমাধান করার প্রয়াসে একটি যুদ্ধ কমিটি গঠন করেন-" ইউরোপীয় সমরানলের জন্য আজ সমস্ত জগতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পবিবর্তন চলিতেছে। মিত্র পক্ষ যে উদ্দেশ্যে বর্তমান সমরে যোগাদান করিয়াছেন তাহার সহিত সমস্ত ভাবতেব ভাগ্য বিশেষভাবে জড়িত সন্দেহ নাই। মিত্র পক্ষের পরাজয় ভারতবাসীর চির পরাজয়, তাহাদিগের জয়লাভ আমাদিগের বিজয়। বর্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবী বিশেষতঃ ভারতবর্ষ সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে রূপ অগ্রসর হইতেছে মিত্রশক্তির বিজয়দ্বারা সে ক্রমোন্নতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসাধন অবশ্যম্ভাবী। অতএব মিত্রশক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা যে দেশবাসীর মূল কর্তব্য তাহা বলা বাহুল্য।"[২]

এই সাহায্য করার জন্য দুর্জয় কিশোর দেববর্মাকে সভাপতি করে আদিত্য কিশোর, হেমন্ত কিশোর, রমেন্দ্র কিশোর, রাণা ডাহালজঙ্গ বাহাদুর, উজীর কমলকৃষ্ণ, ঠাকুর হিরণ কুমার দেববর্মা, ঠাকুর যোগেন্দ্র দেববর্মা ও অনিল কুমার সেনকে নিয়ে যুদ্ধ কমিটি গঠিত হয়েছিল।

যুদ্ধভান্ডার সৃষ্টি ঃ পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত করে আগরতলায় ফিরে এসে বীরবিক্রম ২৪শে ফাল্গুন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে একটি ত্রিপুরা রাজ্য যুদ্ধ প্রচেষ্টা ভান্ডার গঠন করেন। আদেশে বলা হয় যেহেতু যুদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যয় নির্বাহ উপলক্ষে রাজ্যের বাজেটের সহায়তা কল্পে

এবং অন্য অনুরূপ কার্য্যে একটি উপযুক্ত যুদ্ধভান্ডার সৃষ্টি করা আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে। অতএব আদেশ করা যায় যে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা রাজ্য যুদ্ধ প্রচেষ্টা ভান্ডার নামে একটি ভান্ডার সৃষ্টি করা যায়।"[৬] এই উদ্দেশ্যে রাজার সভাপতিত্বে এবং মহামান্যবর ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, মান্যবর রাজা বোধজঙ্গ বাহাদুর, মেজর প্রফুল্ল কুমার দেববর্মা, কাপ্তেন মহারাজকুমার আদিত্য কিশোর দেববর্মা, কাপ্তেন মহারাজকুমার দুর্জয় কিশোর দেববর্মাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

কর্মচারীদের দান : ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের ১৮ ই জ্যেষ্ঠ এক আদেশে রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের যুদ্ধের খরচ বহন করার জন্য আব্যশিকভাবে চাঁদা দিতে বলা হয়। পুনরায় ৫ ই জুলাই ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দের এক আদেশে "ঐ চাঁদার টাকা ৬ কিস্তিতে আদায় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এতোদ্দেশ্যে বেতনের বিলের সঙ্গে ইরশালী চালান গ্রথিত করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক বিলের সঙ্গে একখানা মাত্র চালান দিতে হইবে এবং প্রয়োজনস্থলে এষ্টাব্লিসমেন্ট বিলে এই চালানের সহিত কর্মচারীদের নামের একটি পরিশিষ্ট টাকার অঙ্ক সহ যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। ট্রেজারীতে যুদ্ধের কনট্রিবিউসানের টাকা আমানত স্বরূপ রক্ষিত হইবে।"[৭] এই বাবদে মোট ১৪,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়ে ট্রেজরীতে জমা পড়েছিল।

রাজ্যের দান : রাজ্য কর্তৃক বিভিন্ন যুদ্ধ তহবিলে (ভাইসরয় যুদ্ধ তহবিল, রেডক্রস সোসাইটি, সেইন্ট দুনষ্টোন ফান্ড) মোট ৫৭০০০ টাকা, কর্মচারীদের ১৪০০০ টাকা, এবং সাধারণ নাগরিকদের ৪৪০০০ টাকা জমা হয়েছিল। ডিফেন্স বন্ড কেনা হয়েছিল ১,৭৫০০০ টাকার এবং রাজ্য প্রতিবছরে ৫০,০০০টাকা ও কর্মচারীগণ ৭০০০টাকা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। রাজ্যের সামরিক বিভাগেব খরচ ৫০০০০০টাকার উপরে পৌছেছিল। First Tripura Bir Bikram Rifles রাজ্যত্যাগ করে বাইরে পাঠান হয়েছিল এবং রাজ্যে দ্রুত সেবা বাহিনী গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সংখ্যক রাজ্যের সেনা কর্মকর্তাদের ভারতীয় বাহিনীতে সমুদ্রের ওপারে যুদ্ধ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং কিছু সংখ্যক রাজ্যসেনা কর্তাদের সেনা ছাউনীর কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। যুদ্ধ কমিটি প্রতি ডিভিশনে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল।[৮] মহারানী সাহেবার আবেদনে সাড়া দিয়ে লেডী লিনথিনগোর সিলভার মহারানী ফান্ডেও টাকা জমা পড়েছিল।

রাজার সম্মান : ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্ম দিনে মহারাজকে Knight Commander of the most exalted order of the star of India পদবীতে ভূষিত করা হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ মহারাজা তারকা ও ব্যজ ভাইসরয়ের নিকট থেকে গ্রহণ করেন।[৯] ১৯৩৭ খ্রীষ্টব্দে মহারাজাকে সম্রাটের বাহিনীর সাম্মানিত কাপ্তেন পদে নিযুক্ত করা হয় এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে আগস্ট তাঁকে Bengal Urban Infantry র সম্মানিক কর্ণেল পদে নিযুক্ত করা হয়।[১]

রক্ষীবাহিনী গঠন : রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্মত করা হয়েছিল এবং প্রয়োজনে আইন রচনা করে প্রয়োগ করা হয়েছিল। আগরতলা শহরে ARP সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল। শহরকে ৫টি Sector এ ভাগ করে ARP কাজ করত। পুলিশ ও মিলিটারী ও অসামরিক প্রতিরক্ষার সহযোগে কাজ করত। রক্ষী বাহিনী নাগরিকদের বিমান

আক্রমণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দিত। বিমান আক্রমন সতর্ক বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিত পুলিশ কমিশনার। সমস্ত অসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মীদের উহার অধীনে আনা হয়। সাইরেণ বাজাবার ব্যবস্থা করা হয়। সাইরেণ বাজাবার ব্যবস্থা রাজপ্রাসাদের সিংহ দরজায় স্থাপন করা হয়েছিল যাতে ঘটনাকালে জনগণ সতর্ক হয়ে নিরাপদ আশ্রয় চলে যেতে পারে। ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ২বা পৌষ থেকে বাজার নির্দেশে রাজধানীতে Blackout হতে থাকে। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালের রক্ষীদের রীতিমত First Aid এর ট্রেনিং দেয়া হয়। সাধারণ নাগরিকদের পরিচিতিপত্র ও চক্রসংগ্রহ করতে নির্দেশ দেয়া হয় যাতে কেউ আঘাত প্রাপ্ত হলে শনাক্ত করণে আত্মীয়দের অসুবিধা না হয়। রাজ্যে 'বেঙ্গল টাইম' প্রবর্তন করা হয়।[৮]

উৎসাহ প্রদান ঃ- ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে ডিসেম্বরের ঘোষণাতে বীরবিক্রম যুদ্ধে কর্মরত ত্রিপুরাবাসীর সন্তানদের (ছেলে ও মেয়ে) বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পাঠ গ্রহণ, বৃত্তি প্রদান এবং দরিদ্রদের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকও দেবার কথা বলেন।[৯]

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ গঠন ঃ- মহাযুদ্ধের প্রভাবে রাজ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য হঠাৎ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পারার ফলে রাজসরকার বাধ্য হয়ে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেয়- "বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির ফলে খাদ্যশস্যদিব দুমূর্ল্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্যা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সমাধানের জন্য এ রাজ্যে Food Control Department (খাদ্য শস্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ) গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধ হইতেছে। এ রাজ্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা ক্রমে এবং ব্রিটিশ ভারতে প্রবর্তিত Foot grain Control order এর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বিভাগ হইতে কার্য্য পরিচালিত হওয়া পরিষদ সমীচিন বোধ করে।"[১০]

দ্রব্যমূল্য নির্দিষ্ট করণ ঃ ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দে স্টেট কাউন্সিলের ৬ নং আদেশ দ্বারা খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যবসায়ীগণ অনেকেই নির্দিষ্ট দরে মজুত থাকা জিনিসপত্র বিক্রয় করতে অস্বীকার করলে রাজসরকার ৬.৩.১৩৫২ ত্রিপুরাব্দে এক আদেশ জারী করে বলে-"(১) নিম্ন তপশীলের লিখিত দ্রব্যাদি যে কোন ব্যবসায়ী কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে কিম্বা বিক্রীত জিনিসের মূল্যে রসিদ কেহ গ্রহণ করিতে চাইলে তাহা দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেনা। (২) এই সমুদয় দ্রব্যের ব্যবসায়ীগণকে বিক্রয়ার্থ সর্বদা মাল মজুত রাখিতে হইবে অথবা বিশেষ কারণ ব্যতীত নিজ নিজ ব্যবসায় ইচ্ছামত পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। (৩) কোন ব্যবসায়ী উল্লিখিত ১ম ও ২য় দফার আদেশ অমান্য করিলে তাহার অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ড এবং তদুপরি অর্থদন্ড হইতে পারিবে। তপসিল জিনিষের তালিকা-গম, আটা, ময়দা, লবন, চিনি, কোরোসিন তৈল, ম্যাচবাতি, সরিষার তৈল, ডাইল, নারিকেল তৈল, কয়লা, সাগু, সুপারী, কাপড় কাচাসাবান, সোডা, কাগজ ওষধপত্র বস্ত্রাদি।[১১]

দেখা যাক সে সময়ে দ্রব্যমূল্য কিরূপ ছিল? মন্ত্রীপরিষদের ২৮-৪-১৩৫৪ ত্রিং তারিখের সপ্তদশ অধিবেশনের ২ নং নির্দ্ধারণ অনুসারে ফুড কন্ট্রোল কমিটি আগরতলা শহর মধ্যে খাদ্য বস্তুর নির্দ্ধারিত মূল্য ঘোষণা করে ৩রা ভাদ্র ১৩৫৪ ত্রিং সনে যা ৭ই ভাদ্র থেকে কার্যকরী হবে বলে আদেশে বলা হয়। এ সকল তালিকাতে বিভিন্ন ডাল, মশলা, বিভিন্ন তৈল, পানের মশলা শিশুখাদ্য, সাবান, আটা, লবন, ছাতু, চিড়া, ক্ষীর, দুগ্ধ, মাখন, ছানা নানা প্রকার সবজি, বিভিন্ন

মাছ, সিদল, শুটকী, মাংস, জ্বালানী কাঠ প্রভৃতি নিদিষ্ট দর দেখা যায়।[১২] উল্লেখ্য যে সেকালে মাংস ২ টা প্রতিসের, ডিম ৪ টা পাঁচ আনা, রুই-মৃগেল ১।। সের, পেঁয়াজ।। আনা সের, ঘি ৫।। আনা সের, , আলু।। আনা সের, ছানা ২ টাকা সের, চিড়া ১- আনা সের, ডাল দশআনা সের দরে পাওয়া যেত। এ সবই সর্বোচ্চ মূল্য বলা হয়েছে। পরে ১৩৫৪ ত্রিং সনের ১৩ ই ভাদ্র তারিখের আদেশে সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে জিনিস বিক্রয় আগরতলা শহর ছাড়িয়ে সমগ্র সদর এলাকায় বিস্তৃতি করার নির্দ্দেশ দেখা যায়। বিভাগগুলিতে সরকার নির্দ্ধারিত দরে পণ্য বিক্রীর নির্দেশ দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে খোয়াই বিভাগের কালেক্টার প্রদত্ত ১৪.১২.৪৯ ত্রিং সনের আদেশের মধ্যে পণ্যের তালিকা ও দ্রষ্টব্য[১৩]। ১৩৫৬ ত্রিং সনের ৯ ই ভাদ্র গেজেটে প্রকাশিত এক আদেশে দেখা যায় যে চাউলের মূল্য নির্দিষ্ট করে দেখা হয়েছিল নিম্ন তালিকা মত ঃ[১৪]

ডিবিসনের নাম	উৎপাদনকারীর	ডিবিসনের	ডিলার কর্তৃক
	বিক্রয়মূল্য(প্রতিমণ)	সদরে (প্রতিমণ)	বিক্রয়মূল্য
ধান	চাউল	ধান	চাউল
ধর্মনগর..............৩ টাকা ৮ আনা	৭ টা	৩ টা ১২ আনা	৭টা ৮আনা
কৈলাসহর............৪টাকা	৮ টা	৪ টাকা৪ আনা	৮ টা ৮ আনা
খোয়াই................ ৪টাকা৪ আনা	৮ টা ৮ আনা	৪ টাকা ৮আনা	৯টাকা
সদর.....................৪টা.৮ আনা	৯ টাকা	৪ টা.১২ আনা	৯ টা. ৮আনা
সোনামুড়া............ ৪টা. ৪ আনা	৮ টাকা	৪ টা. ৮ আনা	৯টাকা
উদয়পুর..............৪টাকা	৮ টাকা	৪ টা.৪ আনা	৮টাকা ৮ আনা
অমরপুর.............৩টা.৮ আনা	৭ টাকা	৩ টা. ১২ আনা	৭টাকা ৮ আনা
বিলোনীয়া........... ৪টা.৪ আনা	৮টা.৮ আনা	৪ টা.৮ আনা	৯টা
সাব্রম................. ৩টা.৮ আনা	৭ টা	৩ টা,১২ আনা	৭টা.৮আনা

রেশন ব্যবস্থা ঃ বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। তখন সকল শ্রেণীর লোকদের রেশন দেওয়া হত নির্দিষ্ট দরে। কিন্তু ১৩৫৩ ত্রিং সনের ১৫ই আষাঢ়ের এক আদেশে দেখা যায় যে " 1) Ration coupon will not be issued to any person who earns more than Rs.250/- per month in a family jointly or seperately 2) No of private servent is limited to two 3) Coupons will be issued for those members only who are really dependent as relation on tha income of the person who are entitled to get supply of rice and paddy from the state granary under this revised order(4) The maximum number in each coupon is fixed at 12 members irrespective of the amount of Income "[১৫]

১৩৫৬ ত্রিং সনে দাঙ্গায় বিধ্বস্ত সমতল জেলার অধিবাসীবৃন্দের আগমনের ফলে রাজধানীর লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। জিনিস পত্রের অভাব ঘটতে থাকে। অনেক জিনিস

দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। ফলে ১০ ই কার্তিক ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দে এক আদেশ বলে মিউনিসিপ্যালিটির প্রত্যেক ওয়ার্ডে জনগণের জন্য পারমিট কার্ড দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কার্ডের সাহায্যে নাগরিক কন্ট্রোল দরে বিক্রেতাদের নিকট থেকে চাউল বা আটা পেত। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক সাপ্তাহিক ৪ সের চাউল বা ২ সের চাউল ও দুইসের আটা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা দের সাপ্তাহিক ২ সের চাউল বা ১.৫সের চাউল ও ১/২ সের আটা বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।[১৬]

ছুৎমার্গ পরিত্যাগ উৎসাহ ঃ এছাড়াও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সামাল দিতে রাজ্যে চাষাবাদ বাড়াতে এবং কিছু ছুৎমার্গীয় অপসংস্কৃতি পরিত্যাগ করে হাঁস, মুরগী ও অন্যান্য মাংসদানকারী পশুপালনে প্রজাদের উৎসাহ বৃদ্ধি কল্পে বীর বিক্রম আদেশজারী করেন ১৩৫২ ত্রিপুরাব্দের ২৪ শে চৈত্র তারিখে যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। ঘোষণার পূর্ণ বয়ান গেজেট সংকলনে দ্রষ্টব্য।[১৭]

গৃহে গৃহে চাষাবাদের আহ্বান ঃ যুদ্ধকালে খাদ্যভাব দূর করতে রাজ্য খাদ্যশষ্য উৎপাদন বাড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ীতে বাড়ীতে চাষাবাদ করার জন্য বীরবিক্রম ১৩৫২ত্রিং সনের ১৫ই অগ্রহায়ণ এক আদেশজারী করে বলেন,- I express my earnest desire that every individual house holder with a stern determination shall devote his unstinted enengy to the growing of more food production in every inch of land at his disposal. The country Vegetables and fruits viz Brijial, Reddish Bean Gourd, melon, Potato Pagapya it need no great experiecnce of cultivation to grow and can be produced in a small piece of land.

In every homestead of this capital town of Agartala and nearby villages there are fallow land more or less. In the compounds of Government office Building and other houses such land are not sufficient. Food crops can be grown easily in all such lands and it is essential that to thal end in veiw steps should be taken forth with.

I am fully confident that realising the seriousness of the problem of high soaring prcies and all round searcity of provisions this earnest desire of mine shall forth with be implemented"[১৮]

বলা বাহুল্য যে, রাজকীয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে নাগরিকবৃন্দ 'কিচেন গার্ডেন' শুরু করেছিল এবং অফিসের সামনের খালি জমিতেও খাদ্যশষ্যের চাষ শুরু হয়েছিল।

-ঃ তথ্য নির্দেশ ঃ-

১। Sur H.K. : British Relation with state of Tripura Agartala 1986 P-166.

২। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ স্টেট গেজেট সঙ্কলন,পূ.উ,পৃঃ ৩০২-৩০৩।

৩। ঐ ঃ তদেব, পৃঃ ৩০৭।

৪। ঐ ঃ তাদেব, পৃঃ ৩৩০।

৫। ঐ ঃ তাদেব, পৃঃ ৪১৫।

৬। Tripura Adiministration Report 1935-36, PP 2 and 4

৭। Ibid 1937-40, P 12

৮। বন্দ্যোপাধ্যয় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন , পৃ ঃ ৪১৬।

৯। ঐ গেজেট সংকলন পৃ ঃ৪১৭।

১০। ঐ গেজেট সংকলন পৃঃ ১৬৮।

১১। ঐ গেজেট সংকৃলন পৃঃ১৬৩।

১২। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পৃঃ ৩১৯-৩২১,বিস্তৃত দরের তালিকা দ্রষ্টব্য।

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ২৭৩-২৭৪।

১৪। ঐ ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ২৭৭।

১৫। ঐ ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ৪২০।

১৬। ঐ ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ৪০৯।

১৭। ঐ ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ১৬৬-১৬৭।

১৮। ঐ ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ৪১৮।

১৯। ঐ ঃ গেজেট সংস্কলন, পৃঃ ১৬৪-১৬৫।

২০।. Tripura Adiministration Report 1943-1946,P-35

বীরবিক্রম ঃ শাসন সংস্কার

১) শাসন পরিষদ ঃ ১৩৩৩ ত্রিপুরাব্দের (১৯২৩ খ্রীঃ) ২৮ শে শ্রাবণ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য পরলোক গমন করলে তাঁর পুত্র যুববাজ বীরবিক্রম কিশোর ৩২শে শ্রাবণ ১৩৩৩ ত্রিং সনে এক বোবকারী দ্বাবা ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারীর শাসন ভার গ্রহণ করেন। উক্ত ঘোষণায় উল্লেখ থাকে যে রাজ্য ও চাকলা রোশনাবাদে তাঁর পিতার প্রবর্তিত শাসন প্রণালী অব্যাহত থাকবে এবং কর্মরত আধিকারিকগণ পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ পদে বহাল থেকে কর্ম কবে যাবেন। ১৩৩৩ ত্রিং সনে তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। সেজন্য তাঁর নাবালক অবস্থাকালে রাজ্য ও জমিদারীর শাসনকার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য কাউন্সিল অব এডমিনিষ্ট্রেশান গঠন করা হয়" পঞ্চশ্রীযুক্ত মহাবাজ বীরবিক্রম কিশোব দেববর্মণ বাহাদুর স্বয়ং কার্য্যভার গ্রহণ সাপেক্ষে তৎপক্ষে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা জন্য ভাবত গভর্ণমেন্টের অনুমোদন মতে" কাউন্সিল অব এডমিনিট্রেশান" নামক একটি শাসন পরিষদ গঠিত হইয়াছে এবং পার্শ্বোক্ত ব্যক্তিগণ এই পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়া অদ্য ১৩৩৩ ত্রিপুরাব্দের ২৩ শে অগ্রহায়ণ তারিখে রাজ্য ও জমিদারী প্রভৃতির শাসনভার গ্রহণ কবিয়াছেন।" এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা, রায় জ্যোতিষ চন্দ্র সেন বাহাদুব ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ ও ঠাকুর প্রতাপ চন্দ্র রায় সদস্যরূপে কাজ করেছিলেন।

১৩৩৩ ত্রি সনেব ১৬ই চৈত্র তারিখে মহামান্য কাউন্সিল এক আদেশ জারী করেন যা ১৩৩৩ ত্রিং সনের ২১শে চৈত্র গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং ১লা বৈশাখ ১৩৩৪ ত্রিং সনে কার্যকরী হয়। উক্ত আদেশে বলা হয় যে বিশালগড়, কমলপুর, এবং কল্যাণপুর বিভাগগুলি তুলে দিয়ে সেখানকার এলাকাসমূহ পূর্বের ন্যায় সদর, কৈলাসহর ও খোয়াই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হল। অমরপুর বিভাগের ট্রেজারী ও বিচারক্ষমতা তুলে দিয়ে ঐ বিভাগ উদয়পুরের অন্তর্ভক্ত করা হয়। কল্যাণপুর, আশারামবাড়ী, বীরেন্দ্রনগর যাত্রাপুর এবং জম্পুই থানা তুলে দেওয়া হয়। জম্পুই, অমরপুর ও কল্যাণপুরের মিলিটারী গারদ তুলে দেওয়া হয়। বীরেন্দ্রনগরের ডিসপেনসারী, ধলেশ্বর মৌজায়

স্থানান্তরিত করা হয় এবং কল্যাণপুরের ডাক্তার পদ এবোলিস করা হয়।[২] ১৩৩৬ ত্রিংসনে ১৯ শে আগস্ট বীরবিক্রম কিশোরের পাশ্চাত্য মতে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলে রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করার ফলে কাউন্সিল অব এডমিনিষ্ট্রেশানের অবসান ঘটে। উক্ত তিন বৎসরে কাউন্সিল কর্তৃক "উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রাজ্যের ঋণ পরিশোধ, খাস আদালত গৃহনির্মাণ, কারাগার নির্মাণ, মহাকরণ সম্প্রসারণ, আগরতলা আখাউড়া সড়ক নির্মাণ ও উদয়পুর বিশালগড় সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি"[৩] হয়েছিল।

২। মন্ত্রণা সভা ঃ ১৩৩৭ ত্রিং সনের (১৯২৭খ্রীঃ) ১৪ই ভাদ্র এক রোবকারী দ্বারা শাসন পরিষদের স্থানে ৫সদস্যের এক মন্ত্রণা সভা (Advisory Council) গঠন করা হয়। এই পরিষদের সদস্যগণ হলেন মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা, মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, উজীর ব্রজকৃষ্ণ দেববর্মা, রায় জ্যোতিশ চন্দ্র সেন বাহাদুব এবং দেওয়ান বিজয় কুমার সেন। সভার সভাপতি ছিলেন রাজা স্বয়ং এবং মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র সহসভাপতি পদে বৃত হয়েছিলেন।[৮] ১৩৩৭ ত্রিং সনের ২রা ভাদ্র তারিখে অর্থাৎ Advisory Council গঠনের পূর্বেই জ্যোতিশ চন্দ্র সেনকে রাজমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং Advisory Council গঠিত হলে তাঁকেও উক্ত মন্ত্রণা সভার সভ্য করা হয়। ১৩৩৭ ত্রিং সনের ১২ ই ভাদ্র তারিখে রাজমন্ত্রীর ক্ষমতা বিষয়ক কারনামার রোবকারী প্রচারিত হয়। উক্ত কারনামায় দেখা যায় যে মিলিটারী, রাজমালা অফিস, চিড়িয়াখানা, সংসার, দেবার্চন, নিজ তহবিল, প্যালেস সুলতানৎ ও তৎসংসৃষ্ট অফিসাদি ব্যতীত রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বর্তমান যাবতীয় বিভাগের শাসন সংরক্ষণ করার ভার তাঁর উপর অর্পণ করা হয় কিন্তু কিছু বিষয়ে রাজার আদেশ বা মঞ্জুরী ব্যতীত মন্ত্রী কিছুই করতে পারবেন না। যেমন সিভিল সার্ভিস ভুক্ত কর্মচারী, ১০০ টাকা বা তদুর্দ্ধ বেতনের কর্মচারী নিয়োগ, অবসর, উন্নতি,উক্ত বেতনে স্থায়ী পদ সৃষ্টি, খাস আদালতের বিচারপতি নিয়োগ, অবসর, উন্নতি, বার্ষি ক আয় ব্যয়ের বাজেট পাশ, বাজেটের হেড পরিবর্তন, ৫০০০ টাকার অতিরিক্ত পূর্ত্ত কার্যের এষ্টিমেন্ট মঞ্জুরী, বাজেট বন্দ্বানের অতিরিক্ত ব্যয় কায়েমী বাত সখিচি তালুকে ৫০০০ টাকা জমাব অতিরিক্ত ইজারা বন্দোবস্ত, নতুন কোন আইন প্রচলন বা প্রচলিত আইন রহিত পরিবর্তন বা সংশোধন; ১০০০ টাকার অতিরিক্ত ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া; নতুন স্কীম চালু করা, বার্ষিক Administrativeপ্রচার বা বার্ষিক অডিট রিপোর্ট পাশ করা কোন অপরাধীর প্রাণদন্ডের আদেশ কার্য্যকর করা, রাজখান্দান সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের মীসাংসা, পেনশন ও খরপোষ মঞ্জুর করা ইত্যাদি।[৫] বস্তুত মূল ক্ষমতার চাবি কাঠি নিজের হাতে রেখেই বীরবিক্রম মন্ত্রীকে রাজ্য পরিচালনায় নিযুক্ত করেছিলেন। এরূপ কারনামা আমরা পরবর্তী কালে মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের কালেও দেখতে পাব। কিছুটা উদার মনোভাব দেখালেও বীরবিক্রম তাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার রেখা পরিস্কার টেনে দিয়েছিলেন। ১৪ ই ভাদ্র ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দে Advisory Council গঠনের পরে সেদিনই আর এক রোবকারী দ্বারা বীরবিক্র.[৬] মন্ত্রণা সভার ক্ষমতা ঘোষণা করেন[৭] এই ঘোষণায় বলা হয় রাজার চিফ সেক্রেটারী রাজার দ্বারা নিষ্পত্তি যোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে এই স্থায়ী আদেশের বলে একদা মন্ত্রণা সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থিত করতে পারবেন। যথা - সিভিল সার্ভিসভুক্ত ও ১০০ টাকা উর্দ্ধের বেতনের কার্যকারকদের প্রতি রাজমন্ত্রী বা চিফ সেক্রেটারীর প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল, রাজ্য ও জমিদারীর কায়েমী ও তসখিচি বন্দোবস্ত সম্পর্কিত এবং ৫০০০ টাকা

উর্দ্ধের ইজারা বন্দোবস্তের প্রস্তাব, নতুন আইন বা আইন সংশোধনের বিল মঞ্জুরীর প্রস্তাব, রাজ্য ও জমিদারীর বাজেট, বাজেটের এক হেড হতে অন্য হেডে খারিজ মঞ্জুরী, বার্ষিক রিপোর্ট ও অডিট রিপোর্ট প্রচার মৃত্যুদন্ড কার্যে পরিণতি, সর্বপ্রকার নাজাইদাবী ও হাওলাত বাদের প্রস্তাব। বস্তুত উপরোক্ত বিষয়গুলি মন্ত্রীর ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়েছিল এবং চিফ সেক্রেটারী মন্ত্রণা সভাকে দিয়ে ঐ বিষয়গুলি পাশ করালে রাজার সম্মতিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে বলে বলা হয়েছে।

৩। **মন্ত্রী পরিষদ ঃ** এই Advisory Council দুই বৎসর কাজ করার পর ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৯ খ্রীঃ) এক রোবকারী দ্বারা বীর বিক্রম মন্ত্রী পরিষদ তথা Executive Council গঠন করেন ৫জন সদস্য যথা মহামান্যবর নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মন সভাপতি, মহামান্যবর ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মন সহকারী সভাপতি, দেওয়ান শাসন ও চাকলার ম্যানেজার বিজয়কুমার সেন, চিফ সেক্রেটারী মান্যবর রাণা বোধজঙ্গ এবং সংসার বিভাগের দেওয়ান কমলা প্রসাদ দত্তকে নিয়ে।[৮] এই রোবকারীতে বলা হয়েছে যে সভাপতি ও সহকারী সভাপতির কোন নির্দিষ্ট Protfolio থাকবেনা কিন্তু অন্য সদস্যদের কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যেমন দেওয়ান ও চাকলার ম্যানেজারের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল পলিটিক্যাল ও এপয়েন্টমেন্ট সহ মোট ১৮টি বিভাগ, চিফ সেক্রেটারীর জন্য পাবলিসিটি সহ মোট ৭টি বিভাগ এবং প্রাইভেট সেক্রেটারীর জন্য সংসার, দেবার্চ্চন ইত্যাদি সহ মোট ৪টি বিভাগ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মত পার্থক্যের জন্য মতসংখ্যার সমতা হলে সভাপতিকে Casting vote প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে কতকগুলি বিষয়ে (যেমন ৩০০০্ টাকার অতিরিক্ত এবং ৭০০০্ টাকার অনধিক পূর্ত কাজের এস্টিমেট পাশ, বিভিন্ন বাজেটের আদিষ্ট এক মেজর গ্রুপ হতে অন্য মেজর গ্রুপে পরিবর্তন, সিভিল সার্ভিসভুক্ত অন্য শ্রেণীব ১০০্ টাকার উর্দ্ধ ২০০্ টাকার ন্যুন বেতনের কর্মচারীর বিরুদ্ধে দন্ডাদেশের আপিল সদস্যগণ কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি করা, ৩০০০্ টাকার উর্দ্ধে ও ৭০০০্ টাকার ন্যুন ম্যাদি ইজারা জমার বন্দোবস্তের আদেশ প্রদান করা, এক চাপে ৫০ দ্রোণের অধিক এবং ৭৫ দ্রোণ পর্যন্ত ম্যাদি জোত বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা, ১০০০্ টাকার উর্দ্ধে ৫০০০্ টাকা পর্যন্ত নাজাই দাবী হাওলাত বাদ দেওয়া, আইন নির্দিষ্ট মন্ত্রীর করণীয় আইনাধীন নিয়মাবলী মঞ্জুর করা), 'সদস্যগণের কারনামার অতিরিক্ত যে সমুদায় বিষয় শ্রী শ্রীযুতের আদেশের জন্য প্রেরিত হয় তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ চিফ সেক্রেটারী কর্ত্তৃক পরিষদে একদা উপস্থিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক চূড়ান্তরূপে মীমাংসীত হইবে এবং সংসৃষ্ট সদস্য এই মীমাংসা অনুসারে নিজ স্বাক্ষরে আদেশ প্রদান করিবেন''[৯] উক্ত ঘোষণায় বলা হয়েছে যে চিফ সেক্রেটারী নিম্নোক্ত বিষয়গুলি শ্রী শ্রীযুতের আদেশ গ্রহণে মন্ত্রীপরিষদে উপস্থিত করে মন্তব্য গ্রহণ করতে পারবেন। বিষয়গুলি হচ্ছে রাজ্যের ও জমিদারীর কারনামা যুক্ত বিভাগ সমূহের ব্যয়ের বাজেট, কোন প্রাণদন্ডাদেশ কার্যে পরিণত করা, সর্বপ্রকার নাজাইদাবী হাওলাত বাদের প্রস্তাব, শ্রী শ্রীযুতের আদেশ অন্য যে কোন বিষয় আলোচনার জন্য মন্ত্রী পরিষদে প্রেরণ করলে তাহা এবং বাজেট বন্ধানের অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য সদস্যগণের বিশেষ কার্যের প্রস্তাব। একই তারিখে অর্থাৎ ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে আর ও একরোবকারীতে শাসন বিভাগের দেওয়ানের কারনামা (ক্ষমতা নির্দেশন) ঘোষণা করা হয়।[১০] ঐ ঘোষনাতেও রাজমন্ত্রীর কারনামার মত ১৮ টি বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি কেবল

টাকার অঙ্ক ৩০০০ এর অতিরিক্ত এবং জমির পরিমাণ ৫০ দ্রোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল।

৪) প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন ঃ পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল ১৩৪৮ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯৩৮খৃঃ রাজ্য প্রশাসনের প্রচলিত পদ্ধতির সংস্কার সমন্ধে বিবেচনার জন্য বীরবিক্রম ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দের ২৬শে শ্রাবণ তারিখে এক কমিটি গঠন করেন'' যেহেতু যাবতীয় অবস্থার বিবেচনায় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত শাসন পদ্ধতির সময়োপযোগী সংস্কার করা এ পক্ষেব অভিপ্রেত অতএব চিরাচরিত খান্দানের অবিরোধীভাবে কি উপায়ে উপরোক্ত উদ্দেশ্য সুসাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে অবস্থাদি পর্যালোচনা পূর্বক মন্তব্য প্রদান করিবার জন্য পার্শ্বোক্ত সাতজন সরকারী ও বেসরকারী সদস্য দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা যায়। কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও অবস্থাদি বিবেচনা করিয়া তিন মাস কাল মধ্যে এপক্ষ সদনে স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করিবেন'' সদস্যগণ হলেন রাজমন্ত্রী, দেওয়ান সংসার, চিফজাষ্টিশ, সিনিয়াব নায়েব দেওয়ান, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, ঠাকুর প্রতাপ চন্দ্র রায় এবং মহামান্যবর ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ।

৫) শাসন সংস্কার ঘোষণা পত্র ঃ ১লা বৈশাখ ১৩৪৯ ত্রিং সনে (১৯৩৯) বীরবিক্রম ত্রিপুরা রাজ্য শাসন সংস্কার সম্বন্ধে একটি রাজকীয় ঘোষণা করেন-"যেহেতু রাজ্যভার গ্রহণাবধি এ পক্ষ শিক্ষা ও গঠনমূলক ব্যবস্থাদি প্রবর্তন দ্বারা পুত্রতুল্য প্রজাবৃন্দের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন এবং স্বাবলম্বন, সহযোগিতা রাষ্ট্রানুরাগ প্রভৃতি আদর্শ নাগরিকের ধর্ম্মে নিয়ত তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এবং যেহেতু রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় এবং যুগধর্ম্মপ্রভাবজাত তদীয় অন্তরস্থ স্বাভাবিক আশা আকাঙ্খার যথাসম্ভব পূরণ কল্পে, বর্তমানে শাসন কার্য্যে অধিকতর মাত্রায় প্রজাসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করা এ পক্ষের একান্ত অভিপ্রেত এবং উক্ত সঙ্কল্প বিশেষজ্ঞগণ রাজ্যের ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সহ পরীক্ষিত হইয়া নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আকারে এপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাবতীয় অবস্থা আলোচনায় এ পক্ষ অদ্য নববর্ষের শুভদিনে সর্ব্বন্তকরণে এবং আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে শাসন সংস্কারের ভিত্তি স্বরূপ এক শাসন তন্ত্র অনতিবিলম্বে এ পক্ষের মঞ্জুরীতে প্রচারিত হইয়া অতঃপর ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন কার্য নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং নিম্নোক্ত সংস্কার দ্বারা প্রতিষ্ঠান সমূহ অগৌণে গঠিত হইয়া রাজ্যে তদনুযায়ী নতুন শাসন প্রণালী প্রবর্তিত হইবে।"[১২] উক্ত ঘোষণাপত্রে রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল, হাইকোর্ট বা সর্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ, মন্ত্রীপরিষদ, ব্যবস্থাপক সভা, গ্রাম্য মন্ডলী, রাজ্যের আয় ও বাজেট, মন্ত্রীপরিষদ নিয়োগ প্রভৃতি স্থাপন ও সংস্কার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। মন্ত্রীপরিষদ গঠন ঃ "রাজ্যের শাসন কার্য্য তৎপরতার সহিত সুনিবার্হের নিমিত্ত জনৈক প্রধান মন্ত্রী ও অনধিক ৪জন মন্ত্রী গঠিত বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং মন্ত্রী পরিষদ অবিলম্বে নিযুক্ত হইয়া অর্পিত ক্ষমতার অনুবলে যৌথভাবে রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালনা এবং আদিষ্ট শাসন সংস্কার ক্ষিপ্রতার সহিত কার্যে পরিণত করিবে।"[১৩] এই আদেশ ১৩৪৯ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখের ঘোষণার অঙ্গ এবং উহা কার্যে পরিণত করার জন্য মান্যবর জ্যোতিষ চন্দ্র সেন প্রধানমন্ত্রী; রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর শাসন সংস্কার শিক্ষা প্রভৃতি; ঠাকুর কামিনী কুমার সিংহ, পল্লী সংস্কার, কৃষি,রায় যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়, ফাইনান্স এবং ডাক্তার মণিময় মজুমদার সাধারণ স্বাস্থ্য,চিকিৎসা প্রভৃতি বিভাগের ভার অর্পণ করে ৯ই বৈশাখ ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দে এক রোবকারী বের হয় যাতে বলা হয়েছে-"অতএব এতদ্বারা পার্শ্বলিখিতমন্ত্রীগণ গঠিত এক শাসন পরিষদ নিয়োগ ও যৌথভাবে

উক্ত মন্ত্রী পরিষদের প্রতি নিম্নখিলিত শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা গেল। মন্ত্রীগণের পদোচিত ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও কার্য বিভাগ স্বতন্ত্র কারনামা ভূক্ত হইল। মন্ত্রী পরিষদের কার্য প্রণালী সম্পর্কিত নিয়মাবলী স্বতন্ত্র আদেশমূলে প্রচারিত হইতেছে।''[১৮]

মন্ত্রীপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও ঐ ঘোষণায় কারনামাতে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কারনামগুলির সঙ্গে বর্তমান কারনামার প্রভেদ এই যে এই কারনামায় কিছু অধিক ক্ষমতা বিশেষ করে আর্থিক বিষয়ে দেওয়া হয়েছে। মোট ১৮ টি অনুচ্ছেদে মন্ত্রীপরিষদের ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মন্ত্রীবর্গের অধীনস্থ বিভাগ সমূহের কার্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সংবাদ সংগ্রহ করা, অন্যবিভাগ সমূহের যে কোন বিষয় বিচার বিবেচনার জন্য মন্ত্রীপরিষদের উপস্থিত করাব আদেশ প্রদান করা, মন্ত্রীপরিষদের সভাপতি রূপে রাজার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করা, রাজ্যের শাসন বা পলিটিক্যাল বিভাগ সংসৃষ্ট কোন বিষয় রাজার নিকট উপস্থাপন করা, মন্ত্রীর আদেশের বিরুদ্ধে প্রচলিত নিয়মানুসারে মন্ত্রীপরিষদে আপীল হলে নিয়মানুযায়ী নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা, পরিষদে মতদ্বৈত হলে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য রাজ্যেশ্বরের নিকট উপস্থাপন করা এবং মন্ত্রীগণের মধ্যে যাতে সহযোগিতা ও সহানুভূতি বিদ্যামান থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি।[১৯]

১৩৫১ ত্রিং সলের ৮ ই মাঘ, প্রধানমন্ত্রী জ্যোতিষ চন্দ্র সেন, অবসর গ্রহণ করলে রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুরকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা হয় এবং ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দে ২৫ শে অগ্রহায়ণ তারিখে এক ঘোষণায়, ''বোধজঙ্গ বাহাদুরের পরলোক গমনের পরে, মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়।[২০] ব্রজেন্দ্র কিশোবের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে কারনাম এবং বিশেষ ক্ষমতা নির্দেশ করে ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ৪ঠা পৌষ এক রাজকীয় ঘোষণা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৩৪৯ ত্রিং সনের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও বিশেষ ক্ষমতার কোন পরিবর্তন ১৩৫৬ ত্রিং সনের ঘোষণায় লক্ষ্য করা যায় না।

৭) প্রজা সভা ঃ ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের ১ লা বৈশাখ তারিখের ঘোষণার সঙ্গে বীরবিক্রম কিশোর রাজ্যের মাতব্বর শ্রেণীর প্রজাদের এক সভাতে আহ্বান করেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রজাদের শাসন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো। ঐ ঘোষণাকে রাজা বলেন, ''যাহাতে এ রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে সুশৃঙ্খলতার সহিত শাসনকার্য নির্বাহ হইয়া প্রজাসাধারণের অবস্থার উন্নতি এবং রাজ্যের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনার জন্য আগামী পূজারপর আগরতলা তে এক সভা আহ্বান করা আমার অভিপ্রেত। এই সভায় রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের অধিবাসী মাতব্বর শ্রেণীর প্রজাগণ আহুত হইবে। আশা করি সকলে সভায় যোগদান করতঃ সরলভাবে আমার কর্মচারীগণের সহিত সর্ববিষয়ে আলোচনা করিয়া আমার আকাঙ্খা পূরণ করিবেন।''[২১] উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিনা সাক্ষ্যের অভাবে বলা যাচ্ছে না তবে ঘোষণা অন্ততঃ রাজার মানসিক উদারতাও প্রজাদের প্রতি বর্ত্তব্য পালনে তাদের মতামত শোনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাজার উপলব্ধির ঘোষণা করে।

৮। ব্যবস্থাপক সভা ঃ (Legislative Council) ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দের ১৭ ই ভাদ্র তারিখে এক রোবকারী দ্বারা বীরবিক্রম কিশোর Legislative Council গঠন করেন। ''যেহেতু একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হওয়া আবশ্যক, অতএব নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা গঠন করা গেল।

১। এই সভার নাম ব্যবস্থাপক সভা বা Legislative Council হইবে।

২। শাসন বিভাগ হইতে উপস্থিত আইনের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ও আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে সভার প্রস্তাব ও অভিমত অনুমোদন জন্য এ পক্ষ সদনে উপস্থিত করা এই সভার কার্য হইবে।[১৮]

Legislative Council এর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯জন, সভাপতি রাজা, ও সহসভাপতিপদে ছিলেন ব্রজেন্দ্র কিশোর ও নবদ্বীপ বাহাদুর। ১৩৩৯ ত্রিং সনে ব্যবস্থাপক সভা পুর্নগঠন করা হয়েছিল এবং ১৯ জনের স্থলে ২২ জন সদস্য মনোনীত করা হয়েছিল বলে গণচৌধুরী উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোন তথ্য ভিত্তিক সাক্ষ্য তিনি প্রদান করেনি নি।[১৯] ১৩৪৯ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখের ঘোষণাতে ব্যবস্থাপক সভা পুর্নগঠনের ঘোষণা করা হয়েছিল-" আইন প্রণয়ন বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং বাজেট আলোচনা ও তৎসম্পর্কে অভিমত প্রদানে অধিকারী এ ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইবে। সভাপতিবাদে উহার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪ জন এবং তন্মধ্যে ২৯জন প্রজাবৃন্দ কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রণালীতে নির্বাচিত সদস্য ও ১৮ জন সরকারী ও ৭জন বেসরকারী মনোনীত সদস্য থাকিবে। নির্বাচিত সদস্যগণ রাজ্যের বিভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে নির্দ্ধারিত উপযুক্ত ইলেকটোরেট সমূহ হইতে প্রণালী অনুযায়ী অধিকাংশ ব্যক্তির ভোটে নির্বাচিত হইবে এবং ভোটের অধিকার যথাসম্ভব সম্প্রসারিত হইবে। ঠাকুর সম্প্রদায়, তালুকদারগণ,পল্লী অঞ্চলের গ্রাম্য মন্ডলী সমূহ শহরস্থ মিউনিসিপ্যালিটি আদি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, চা উৎপন্নকারী সম্প্রদায় এবং অনুন্নত জাতি সমূহ ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্বাচনে অধিকারী হইবে। সাধারণত যে যে স্থলে শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণ নির্দ্ধারিত ইলেকটোরেট সমূহ দ্বারা সম্ভবপর না হয় মনোনীত সদস্যগণ তদনুকুলে নিযুক্ত হইবে।"[২০]

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচনের জন্য ভোটদাতাদের তালিকাতে দেখা যায় যে বি. এ উপাধিধারী এ রাজ্যের প্রজা, রাজ্যের প্রজা না হলে যারা বিগত ৫বৎসর যাবৎ অন্ততঃ ৬মাস এ রাজ্যে বসবাস করছে এবং আন্ডার গ্রাজুয়েটগণদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে বলা হয়েছে। তাদের বয়স ২১বৎসর বা তদুর্দ্ধ হতে হবে বলেও বলা হয়েছে।[২১]

১৩৪৯ ত্রিং সনের আবার এক মেমোতে তালুকদার,দরতালুকদার, নামজারীবিহীন উপাধিধারী তালুকদার, একাধিক তালুকের অধিকারী তালুকদার, একাধিক মালিক বিশিষ্ট তালুকের অংশীদারীর লিমিটেড কোম্পানী, মন্ডলার তত্ত্বাবধানে স্কুল, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেদের নির্বাচনে ভোট প্রদান সম্পর্কে বিশদ নিয়মাবলী অনুযায়ী ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[২২]

৯। **স্বায়ত্ত শাসন ঃ** ১৩৪৯ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখের রোবকারীতে গ্রাম্য মন্ডলীর উল্লেখ প্রমাণ করে যে ১৩৪৯ ত্রিং সনের পূর্বেই গ্রাম্য মন্ডলী গঠিত হয়েছিল। বস্তুত্ত ১৩৪৮ ত্রিং সনের ১৯ শে কার্তিক তারিখের রোবকারীতে গ্রামাঞ্চলে জনহিতকর সর্বপ্রকার উন্নয়নের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে তিনটি গ্রাম্যমন্ডলী গঠন করার আদেশ দেখা যায়-"শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তন সমিতির চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ হওয়া সাপেক্ষে উপরোক্ত উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থে এতৎসঙ্গীয় হাত নকসায় প্রদর্শিত চৌহদ্দি মতে সদর এলাকায় রামনগর, রাজনগর, জয়পুর, কালিকাপুর, রামপুর, ভাটি অভয়নগর ছন মড়া, চান্দিনা মূড়া,শর্মালোঙ্গা, পূর্বভবনবন, মধ্যভুবনবন দ্বারা একটি মন্ডলী চারিপাড়া, বেলাবর লক্ষীপুর, গজারিয়া, ভট্টপুকুর, বাধারঘাট, মধুবন, বল্লভপুর, কিসমত কুড়ি ও মাধবপুর দ্বারা

একটি মন্ডলী এবং পাথালিয়া, ডুলিপুকুর, প্রমোদনগর, হীরাপুর, অমরেন্দ্র নগর ও আমতলী (জোড় পুকুর) দ্বারা একটি মন্ডলী আপাততঃ এই তিনটি গ্রাম্য মন্ডলী গঠন করা যাইতে পারে। স্বশাসন সুপরিচালনার জন্য মন্ডলী একের তত্ত্বাবধানে স্ব-স্ব এলাকার সরকারী প্রাপ্য আড্ডা এবং পূর্ত্তবতন কর আদায় উশুল এবং মন্ডলীর উন্নতি জনক যথা শিক্ষা, চিকিৎসা, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি কার্যে ব্যয় করিবার ক্ষমতা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানী ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা অর্পন করা যাইতে পারে।''[২৩]

যথারীতি রাজাদেশে গ্রাম্যমন্ডলী গঠিত হয়েছিল। ১৩৪৮ ত্রিং সনের ১৩ ই ফাল্গুন তারিখে মন্ডলীর সর্দ্দারদের প্রতি রাজার উপদেশ থেকে জানা যায়- ''স্ব স্ব মন্ডলীর জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া আমার দরবার হইতে তোমরা সর্দ্দার নিযুক্ত হওয়ায় আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তোমরা আজ আমার শত শত প্রজার মধ্যে সম্মানিত হইয়াছে। তোমরা আজ রাজ দরবারে দরবারী হইয়াছ আজ তোমরা রাজ্য শাসনের একটি অঙ্গ হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছ, অতএব তোমাদের উপরে আজ যে দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে তাহা সর্বদা মনে রাখিয়া নিয়ত স্বস্ব কর্ত্তব্য পালন করিবে।[২৪] ১৩৪৮ ত্রিং সনের ২১শে ফাল্গুন তারিখের ঘোষণায় সমগ্র সদর অঞ্চলে গ্রাম্যমন্ডলী গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। -''স্বদেশ সম্ভূত রাষ্ট্রপরিচালনের বিধিকে সর্বোপরি স্বীকার করিয়া তৎসঙ্গে কালোপযোগী সংস্কার প্রবর্তন উদ্দেশ্যে ও স্বশাসন সুপরিচালনের জন্য এ পক্ষের ১০/৭/৪৮ ত্রিং তারিখের ১৫১নং রোবকারী দ্বারা সদর বিভাগে যে রামনগর গং চারিপাড়াগং এবং পাথালিয়াগং তিনটি গ্রাম্য মন্ডলী গঠিত হইয়াছিল, তদনুসরণে এবং তাহার সম্প্রসারণে সমুদয় সদর এলাকা মধ্যে অবিলম্বে গ্রাম্যমন্ডলী গঠন করা এ পক্ষের অভিপ্রেত, অতএব পূর্বগঠিত ৩টি মন্ডলীর অতিরিক্ত সদর এলাকায় অপরাপর মন্ডলীগঠন এবং সর্দ্দার ও প্রধান নির্বাচন সমন্ধে শ্রীযুক্ত মন্ত্রীবাহাদুর অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।''[২৫]

সদর এলাকাতে মন্ডলীগুলি গঠিত হয়েছিল কিন্তু সাক্ষ্যের অভাববশতঃ মন্ডলীগুলির নাম ও এলাকার চৌহাদ্দি উল্লেখ করা গেল না। সদর বিভাগে মন্ডলী স্থাপনের সাফল্যে উৎসাহিত রাজা সমগ্ররাজ্যে মন্ডলী গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৩৪৯ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখের রোবকারীতে বলা হয়-''রাজ্যের সর্বত্র পল্লী অঞ্চলের কতিপয় গ্রামের সমবায়ে গ্রাম্য মন্ডলী বা গ্রাম্য ইউনিয়ন সমূহ গঠিত হইবে। গ্রামের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক স্ব-স্ব মন্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড নির্বাচিত হইবে। এই বোর্ড সমূহ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন পরিচালনা, নির্দেশিত ট্যাক্স বা কর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে।[২৬] ১৩৫০ ত্রিং সনের (১৯৪০) ৯ই আষাঢ় রাজকীয় আদেশে দেখা যায়- ''যেহেতু শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় এপক্ষের বিগত ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের ঘোষণায় অনতিবিলম্বে এ রাজ্যে গ্রাম্যমন্ডলী ও মন্ডলী বোর্ডগঠন ও তদায় কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা নির্দ্দেশের অনুষ্ঠান এ পক্ষের অভিপ্রেত বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত অভিপ্রায়ানুসারে গ্রাম্যমন্ডলী আইনের পান্ডুলিপি প্রস্তুত এবং এপক্ষ নিযুক্তি এক কমিটি কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়া নির্দিষ্ট আকারে মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আদেশ করা যায় যে সঙ্গীয় গ্রাম্যমন্ডলী আইনের পান্ডুলিপি মঞ্জুর হয় এবং উহা গ্রাম্য মন্ডলী আইন বা ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের আইম নামে অভিহিত হইয়া ষ্টেট গেজেটে প্রচার এবং আইন নির্দিষ্ট প্রণালীতে রাজ্যে প্রচার হয়।''[২৭]

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি রাজ্যের সমস্ত বিভাগে গ্রাম্য মন্ডলী গঠন কার্যে ও আনুষ্ঠানিক

কার্য্যারম্ভ করার ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল এবং মন্ডলী গঠনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধ পরিসমাপ্তিতে পুণরায় মন্ডলী গঠন কাজে আগ্রহী হয়ে রাজসরকার ঘোষণা করে যে " বর্তমান সদর বিভাগের ১) চারিপাড়া ২) রামনগর ৩) ইন্দ্রনগর ৪) প্রতাপগড় এই চারিটি মন্ডলীর গঠন কার্য শেষ হইয়াছে এবং শীঘ্রই উক্ত গঠিত মন্ডলীর নির্বাচনাদি কার্য আরম্ভ করা যাইতেছে।...আশা করা যায় রাজ্যের জনসাধারণ মন্ডলীগঠন ও স্বায়ত্বশাসন পরিচালনা কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।"[২৮]

১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ৩০শে ফাল্গুন এক আদেশ বলে গ্রাম্যমন্ডলী আইনের কতিপয় সংশোধনী করা হয়। যেমন 'মন্ত্রী' শব্দে (গ্রাম্য মন্ডলী আইনের ৩(গ) ধারায় উল্লিখিত) শাসন সংস্কার বিভাগের মন্ত্রী বা তৎকার্যে ভার প্রাপ্ত কার্যকারক বুঝাবে। স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের স্থলে শাসন সংস্কার বিভাগ পাঠ হবে, কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল, মন্ত্রীর বিশেষ আদেশে তা বাদ বা সময় হ্রাস করা যেতে পারবে, আইনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে প্রচলিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং মন্ত্রী নির্দেশিত এ মত আদেশ সংশ্লিষ্ট কালেকটারী আফিসে ও তহশীল কাছারীর নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে এবং এ সম্বন্ধে আদালতে কোন মোকাদ্দমা গৃহিত হবে না ইত্যাদি।[২৯]

গ্রাম্যমন্ডলী গঠন করে রাজ্যে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করার যে প্রয়াস বীরবিক্রমের বোরকারীগুলিতে বার বার প্রকাশ পেয়েছে এবং সদর বিভাগে বিশেষ করে মন্ডলী স্থাপন করে তিনি যে তৎপরতা প্রদর্শন করেছেন তার মূল উদ্দেশ্য মোটেই প্রজামঙ্গল ছিল বলে সমালোচকগণ মনে করেন না।"It was rather viewed that the law was ennacted to countract the popular movement and to mobilise the loyal chiefs of the plane"[৩০]

১০। শাসনতন্ত্র রচনা :- বিশেষজ্ঞ আইনবিদদের নিযুক্তি করে বীরবিক্রম ত্রিপুবা রাজ্যের শাসনতন্ত্র (Constitution)রচনা করান। ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে (১৯৪১খ্রীঃ) সংশোধিত পান্ডুলিপি রাজার নিকটে পেশ করা হলে বীরবিক্রম ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ২০শে আষাঢ় তারিখে এক রোবকারী প্রকাশ করেন বলেন, -"যেহেতু শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় এপক্ষের বিগত ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের শুভ নববর্ষের ঘোষণায় ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রণার্থে অগৌনে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র প্রচার সম্পর্কে এ পক্ষের প্রিয় প্রজাবৃন্দকে প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং যেহেতু এপক্ষের উক্ত সঙ্কল্প বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক বাজ্যের ও পারিবার্ষিক যাবতীয় অবস্থা সমূহ পরীক্ষিত হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের এক শাসনতন্ত্র রচিত ও আইনের পান্ডুলিপি আকারে এ পক্ষের মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত হইয়াছে; এতএব অতি আনন্দের সহিত আদেশ করা যায় যে, সঙ্গীয় শাসনতন্ত্রের পান্ডুলিপি মঞ্জুর হয় এবং উহা আগামী ১লা শ্রাবণ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনতন্ত্র বা ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ১ আইন নামে রাজ্যের সর্বত্র প্রবল হয়।"[৩১] ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেটের ১লা শ্রাবণ ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের বিশেষ সংখ্যাতে এই শাসন তন্ত্র প্রচারিত হয়। উহার ইংরেজী অনুবাদ ও প্রকাশিত হয় ঐ শ্রাবণের বিশেষ সংখ্যাতেই। কিন্তু মহাযুদ্ধজনিত সংকট ও ডামাডোলের মধ্যে উহা কার্যকরী করা হয়নি[৩২]

১১। জাতীয় পতাকা : বীরবিক্রম সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি জাতীয় পতাকার আবশ্যকতা অনুভব করে ১৩ই ভাদ্র ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে (১৯৩১খ্রীঃ) এক আদেশ জারী করে জাতীয় পতাকার স্বরূপ নির্ধারণ করে সাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দেন। অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্যে বহুকাল পূর্ব থেকেই 'শ্বেতবর্ণ কপি ধ্বজ' রাজ পতাকা রূপে ব্যবহৃত হত, এরূপ সাক্ষ্য

আঁকর গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ কালে বিভিন্ন রঙ এর পতাকা ব্যবহার করত। কিন্তু সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পারে এরূপ কোন পতাকা বা জাতীয় পতাকার অস্তিত্ব ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল না। বীরবিক্রম নির্দেশিত পতাকার স্বরূপ নিম্নরূপ ঃ পতাকা দীর্ঘে যে পরিমাণ হইবে প্রস্থে তাহার দুই তৃতীয়াংশ হইবে। পতাকা তিন বর্ণের হইবে যথা (১) পীতবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ), (২) শ্বেতবর্ণ (রৌপ্যবর্ণ) (৩) রক্তবর্ণ পতাকাব সমগ্র দৈর্ঘের প্রথম অর্ধাংশ রক্ত বর্ণের হইবে এবং ঠিক মধ্যেস্থলে দৈর্ঘের অর্ধাংশ ব্যাস (diameter) বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের একটি বৃত্ত থাকিবে।" [১৬]

১২। জাতীয় সঙ্গীত ঃ- বীরবিক্রম একটি জাতীয় সঙ্গীত ও রচনা করান। সঙ্গীতটি ককবরক ভাষাতে রচিত হয়েছিল এবং বাজদরবারের শুরুতে ব্যান্ডে উহা বাজান হত। বিশেষ করে নববর্ষ দরবার, বিজয়াদশমী দববাব ও জন্ম তিথি দববার উপলক্ষে ব্যান্ডে জাতীয় সঙ্গীত বাজত। গেজেট সংকলন জানাচ্ছে এই সব দরবার উপলক্ষে তিপ্রা ভাষায় লেখা একটি জাতীয় সংগীতের উল্লেখ ও গেজেটে পাওয়া যায়। বিশেষ কবে সরকারী অনুষ্ঠানে মহারাজর উপস্থিতিতে ব্যান্ডে এই গানের সুরধ্বনী শোনা যেত। [১৭] স্বভাবতঃই আশা কবা যেতে পারে যে মিলিটারী ব্যান্ডেই ঐ সঙ্গীত বাজান হত। অন্য কোন অনুষ্ঠানে উক্ত গান বাজান হত কিনা জানা যাচ্ছে না। গানটি বর্তমানে লুপ্ত হয়েছে, চেষ্টা করে ও উহার বাণী সংগ্রহ করা যায় নি।

-ঃ পাদটীকা ঃ-

১। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৩৭-৩৮।
২। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেটিয়ার সংকলন, পূ.উ. পৃঃ ১১৯।
৩। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ ত্রিপুরার ইতিহাস, পূ.উ.পৃ.১৭১-৭২।
৪। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পূ.উ. পৃঃ১৩৯-৪০।
৫। ঐ ঃ রাজগী, পূ উ. পৃঃ ১৩৯।
৬। ঐ ঃ রাজগী পূ.উ.পৃঃ১৪০-১৪১।
৭। ঐ ঃ রাজগী পূ.উ.পৃঃ১৪০-১৪১।
৮। ঐ ঃ রাজগী পূ.উ.পৃঃ১৪১।
৯। ঐ ঃ রাজগী পূ.উ.পৃঃ১৪৪।
১০। ঐ ঃ রাজগী পৃঃ১৪৪।
১১। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেটিয়ার সংকলন, পূ.উ. পৃঃ ১৫০।
১২। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পৃঃ১৪৭।
১৩। ঐ ঃ রাজগী, পৃ ১৪৮।
১৪। ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ১৫০।
১৫। ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১৫২।
১৬। ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১৬৬-১৬৭।
১৭। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃউ. ১৫৪।
১৮। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পৃঃ ৪২৬।

১৯। গণচৌধুরী জগদীশ : ত্রিপুরার ইতিহাস, পৃঃ ১৭৫।
২০। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজগী, পৃঃ১৪৮।
২১। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন : গেজেট সংকলন, পৃঃ ২৭১।
২২। ঐ : গেজেট সংকলন, পৃঃ ২৭২-৭৩।
২৩। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজগী, পৃঃ ৪৮২।
২৪। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন : গেজেট সংকলন, পৃঃ৩০০
২৫। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজগী, পৃঃ৪৮৩।
২৬। ঐ : রাজগী, পৃঃ১৪৮।
২৭। ঐ : রাজগী, পৃঃ৪৮৪।
২৮। বন্দ্যোপাধ্যায় : গেজেটে সংকলন, পৃঃ ৩৬০
২৯। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় : রাজগী, পৃঃ ৪৪০-৪৪১
৩০। দত্ত বীরেন : ত্রিপুরা জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ ও নির্বাচনোত্তর ত্রিপুরা ত্রিপুরার কথা, পৃঃ ২২, আগরতলা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।
৩১। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন : গেজেটে সংকলন, পৃঃ ১৬২।
৩২। মেনন কে ডি (সম্পাদিত) : ত্রিপুবা ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার, পৃঃ ১১৬।
৩৩। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন : গেজেট সংকলন, পৃঃ১৪২।
৩৪। ঐ : ঐ ভূমিকা, পৃঃ ১৬।

বীরবিক্রমের আমলে রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা

ত্রিপুরা রাজ্যের বিচার ব্যবস্থায় বীরবিক্রম কিশোরের পূর্বে খাস আপিল আদালত, আপিল আদালত, দেওয়ানী, সেসন এবং ফৌজদারী নামে আদালতের নাম ১৩১৫ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাধাকিশোরের আমলে আদালত ছুটির তালিকায় দৃষ্ট হয় [১]। বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত প্রিভি কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল, কাউন্সিলের সদস্যদের নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং মোকদ্দমার নিস্পত্তি হয়েছিল বলে সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। [২] বীরবিক্রম কিশোরের আমলে খাস আদালতের সৃষ্টি হয়। উহা হাইকোর্টের সমতুল্য। সেজন্য খাস আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল ত্রিপুরা প্রিভি কাউন্সিলের মাধ্যমে রাজ্যেশ্বরের নিকট উপস্থিত করা হত। উক্ত প্রিভি কাউন্সিল ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। প্রিভি কাউন্সিল রাজসভা গঠনের কারণ সম্বন্ধে ১লা বৈশাখ ১৩৪৯ ত্রিং সনে রাজ্যের শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় এক রাজকীয় ঘোষণায় বলা হয়েছিল।''রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ বিশ্বাসভাজন কর্মচারীবৃন্দ এবং এ রাজ্যের বা ভিন্ন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মধ্য হইতে নিযুক্ত অনধিক ১৫জন সদস্য গঠিত এক রাজসভা বা প্রিভি কাউন্সিল মন্ত্রণা সভারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনানুসারে এ পক্ষের সহায়তা করিবে এবং এপক্ষ আশা করেন যে অভিজ্ঞ কর্মকুশল সদস্যবর্গ সম্বলিত এই প্রতিষ্ঠানের মন্ত্রণা সর্বদা এপক্ষের কাম্য ও হিতকর হইবে।''[৩ক] এক উক্ত আদেশেই হাইকোর্ট বা সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের কথা বলা হয়েছে ''ত্রিপুরা রাজ্যের হাইকোর্ট যা খাস আদালত বর্তমানে জনৈক সুযোগ্য চিফ জাস্টিস বা প্রধান বিচারপতি ও তদীয় কতিপয় অভিজ্ঞ সহযোগী বিচারকের অধীনে সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতায় বিচারকার্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছে এবং নিম্ন বিচাবাদলতের তত্বাবধান ও তদীয় ক্ষমতায়ত্ত্ব। অতঃপর এই সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন কল্পে ইহা গঠন সংস্কার অগৌনে অনুষ্ঠিত হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত।'[৩খ]

১৩৪৯ ত্রিং সনের ১লা বৈশাখের রাজকীয় ঘোষণা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যেই রাজসভা গঠিত হয়েছিল। ১২ জন সদস্য ব্যতীত কিছু পরামর্শকও নিযুক্ত করা হয়েছিল। সদস্যদের 'রাজসভাভূষণ' আখ্যায় ভূষিত করা হয় এবং শপথ বাক্য পাঠ করান হয়েছিল। সদস্যদের.

অভিমত অবশ্যই রাজসমীপে পেশ করা বাধ্যতামূলক ছিল কারণ রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। ঐ রাজসভা প্রিভি কাউন্সিলের ৫ জন সদস্য দ্বারা খাস আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপিলের পক্ষাপক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে রাজার নিকট অভিমত প্রদান করার জন্য একটি ব্যবহারিক কমিটি বা Judicial কমিটি গঠন করা হয়েছিল। [১] বলা হয়, ঐ কমিটি ঐ সময়ে প্রচলিত প্রিভি কাউন্সিল এবং সাক্ষাৎ আপিল সংক্রান্ত বিধি অর্থাৎ ১৩২৬ সনের ১নং আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে। উল্লেখ ঐ ১৩২৬ ত্রিং সনের ১নং আইন বীরবিক্রমের পিতা বীরেন্দ্র কিশোর কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। [২] সদর বিভাগ ভিন্ন অন্যত্র বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকগণ বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিজ অধিনস্থ বিভাগের শাসন সংরক্ষণ ও শান্তি রক্ষার জন্য দায়ী থাকবেন। উল্লিখিত ব্যবস্থায় তাঁহারা সর্বত্রই আইনতঃ বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের শাসন সংস্করণ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিতে অধিকারী'। [৩] ১৩৪২ ত্রিং সনের (১৯৩২খৃঃ) ২৮শে শ্রাবণ তারিখের এক মেমোতে দেখা যায় রাজনৈতিক ডাকাতি ইত্যাদি মোকদ্দমা বিচারের জন্য একটি বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠন করা হয়েছিল'' ফৌজদারী বিচার ও শান্তি বিধায়ক ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দের ১নং আইনের ৪, ১৫ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধারার বিধান অনুসারে পার্শ্বলিখিত মোকদ্দমা বিচারের জন্য তিনজন বিচারক দ্বারা একটি বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠিত হয়। আদালত উপরোক্ত আইনের বিধান অনুসারে এই মোকদ্দমা বিচার করিবেন।'' [৪] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে,বীরবিক্রম কিশোরের আমলে বিচার ব্যবস্থা নিম্নরূপ ছক দ্বারা প্রকাশ করা যায়।
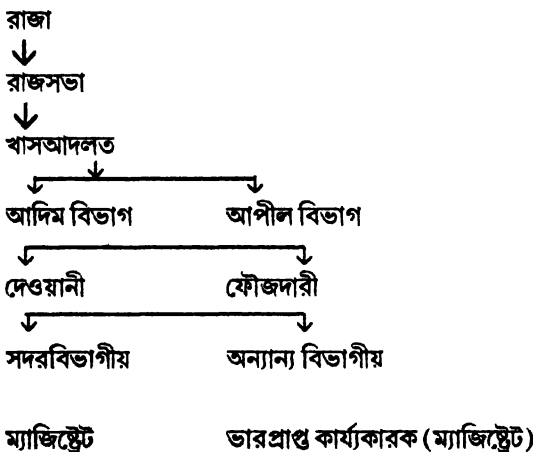
(১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণী)

বিচারক নিযুক্তির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজ্যের অবসর প্রাপ্ত বিচারকদের খাস আদালতের প্রধান বিচারক পদে নির্দিষ্ট মাসিক পারিশ্রমিকে নিযুক্ত করা হত। বিচারকদের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ আদলতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিযুক্ত হতে দেখা যায়। কার্যে   র দিনগুলিতে দৈনিক ৬০ টাকা হারে এবং অপর দিনগুলিতে দৈনিক ১০ টাকা হারে নিযুক্তির পরেও কিন্তু প্রথম শ্রেণীর পাথেয় দেবার ভিত্তিতে নিযুক্তির সাক্ষ্য রয়েছে। [৫] সাধারণভাবে আইনের ডিগ্রীসহ উচ্চ

শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বিচারকদের পদে নিযুক্ত করা হত। কিন্তু রাজ পরিবারের লোকেদের ক্ষেত্রে আইনের ডিগ্রী আবশ্যিক ছিল বলে ধারণা করা যায় না। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে উচ্চ বিচারালয়ের বিচারকগণ একমাত্র বিচার কার্যই করতেন। কিন্তু বিভাগীয় বিচারালয়গুলিতে (সদর ব্যতীত) শাসক এবং বিচারক ছিলেন একই ব্যক্তি।

বিচারকার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য অবশ্যই উকিলের প্রয়োজন। আইনজীবিদের নিয়ে ত্রিপুরা রাজসরকার অনেক বিব্রত হয়েছিলেন কারণ উপযুক্ত শিক্ষিত আইনের ড্রিগ্রীধারী কোন লোক প্রথম দিকে এ পেশায় আসতে চাইত না। ফলে অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ পেশায় আসলেও তাদের এ পেশায় জীবিকা নির্বাহ হত না বলে তারা ওকালতির সঙ্গে অন্য ব্যবসাও করত। সেজন্য ১৩৩০ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯২০খ্রীষ্টাব্দে বীরবিক্রম কিশোরের পিতা বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে উকিলদের সতর্ক করা হয়েছিল। ১৩৩০ ত্রিং সনের ১৭ই ভাদ্র তারিখে এক আদেশ জারী করে বলা হয়- "উকিলবাবুগণ সম্মানের হানিজনক কোন কার্য করিতে পারিবেন না। যারা সমাজে নিন্দনীয় হন অর্থাৎ মুদির কলুর কিম্বা সাধারণ পণ্যদ্রব্য বিক্রেতার কার্য বা তাদৃশ কোনও ব্যবসা করিতে পারিবেন না। এরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসা করিবার জন্য কোন উকিলকে ভবিষ্যতে অনুমতি দেওয়া হইবে না"।[১]

তারপরেই দেখা যায় উকিলদের শিক্ষিত করার জন্য পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৩৩৩ ত্রিং সনের (১৯২৩) ১৪ই আশ্বিন তারিখের মেমোতে দেখা যায় একটি পরীক্ষা বোর্ড গঠন। ৪ জন সদস্য যথা দেওয়ান বিজয়কুমার সেন এম. এ. বি. এল, বাবু বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. বি.এল, বাবু কমলাপ্রসাদ দত্ত এম. এ. বি. এল. এম. এ. আর এস. এফ. আর. ই. এস (লন্ডন) এবং বাবু অখিলচন্দ্র মজুমদার এম. এ. বি. এল কে নিয়ে এই পরীক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়। তাঁদের পরীক্ষা গ্রহণ করে ফল আদালতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল। I.A কিম্বা I.Sc পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে প্রথম শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষায় বসার সুযোগ ছিল না। Matriculation বা অন্ততঃ নর্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কিম্বা কোন সংস্কৃত উপাধি প্রাপ্ত না হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেয়া হত না। প্রশ্নপত্র বঙ্গভাষায় প্রস্তুত হলেও পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে উত্তর বঙ্গভাষায় কি ইংরেজী ভাষায়ও লিখতে পারতেন।[১০]

১৩৪৩ ত্রিপুরাব্দে (১৯৩৩ খ্রীঃ) ওকালতি পরীক্ষার নিয়মাবলী খাস আদালতের চিফ জাজের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়। মোট আটটিপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ১ম শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষার জন্য। সাতটি পত্র করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষার জন্য। প্রশ্নপত্র বঙ্গভাষায় রচিত হলেও উত্তর ইংরেজী ভাষাতেও লিখতে পারা যেত পূর্বে উল্লেখ করেছি। এফ. এ আই.এ: আই এস. সি পাশ না হলে প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় বসতে অযোগ্য বলে বিবেচিত হত পরীক্ষার্থী। প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় ৮টি প্রশ্নপত্রের প্রত্যেকের পাশ নম্বর ৩৩ ধার্য হলে সর্বমোট ২৭৫টি নম্বর না পেলে পাশ বলে বিবেচিত হত না। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষাতে যোগ্যতা অন্ততঃ এন্ট্রাস পাশ, ম্যাটিকুলেশান বা নর্মালস্কুলের শেষ ক্লাশ পাশ বা কোন সংস্কৃত উপাধি নির্দ্ধারিত হয়েছিল। এ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সপ্তম প্রশ্নপত্র ব্যতীত অন্য ৭টি প্রশ্নপত্রের উত্তরদান আবশ্যিক করা হয়েছিল। প্রতিপত্রে পাশের নম্বর ৩৩ রাখা হলেও তাদের সর্বমোট ২৫০ নম্বর পেতে হত তা না

হলে সাকুল্যে পাশ বলে ঘোষিত হত না। নির্দিষ্ট ফরমে ১৫ টাকা পরীক্ষার ফিস ট্রেজারিতে দাখিল করে রসিদ সহ আবেদন করার নির্দেশ দেখা যায়। ফরমে মোট ৮টি কলাম যথা নাম ও পিতার নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্বাধীন রাজ্য ও রাজধানীতে কোন আত্মীয় আছে কিনা, থাকলে তার পরিচয়. প্রশংসাপত্র দাতার পিতার নামধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়, বর্তমানের কি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা হয়, বয়স ও মন্তব্য ইত্যাদি। পরীক্ষার সিলেবাস নিম্নরূপ। [11]

প্রথম পত্র : British Cr. P. Code Chapters xxiii, xxvii,xxxi ও xxxvii বাদ.. ....৭০

ত্রিপুরা রাজ্যের ১২৯৬ ত্রিং সনের আবকারী আইন ৩০

মোট ১০০

দ্বিতীয়পত্র : British Cr.P. Code (বাদ Section 96-112,115-120 order 41-46 এবং 49)........৭০ ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩১৮ সনের ১ আইন আদালত গঠন ১৩২১ ত্রিং সনের ৩ আইনের সংশোধনসহ......১০

তৃতীয়পত্র : Indian Penal Code ৭০

ত্রিপুরা রাজ্যের চলৎ দন্ডবিধি ১৫

১৩২১ ত্রিং সনের অস্ত্র আইন ১৫

মোট — ১০০

চতুর্থপত্র : Indian Evidence Act ৭০

ত্রিপুরা রাজ্যের সাক্ষীর কমিশন বিষয়ক আইন..... .... ১৫

১২৯৬ ত্রিং সনের পুলিশ বিধি ১৫

মোট — ১০০

পঞ্চমপত্র : Transfer of property Act ৬০

Hindu Law ৪০

মোট — ১০০

ষষ্ঠপত্র Indian contract Act ৬০

Muhamedan Law ৪০

মোট — ১০০

সপ্তমপত্র : Indian Succession Act...

Act no. xxxix of 1925 .... ৩৫

(কেবল সার্টিফিকেট ও উইল প্রবেটের অংশ) ....
(ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেট বিষয়ক
১৩৩৯ ত্রিং সনের ২ নং আইন............................ ৫
Guardians and words Act
(Act viii of 1890) ২০
British criminal procedure code এর section
19-112, 115-120, order 41-46 and order 49 ১৬
British criminal Procedure Code এর chapters
xxxiii, xxviii, xvi, এবং xxxvii....................... ১৬
ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩২৬ ত্রিং সনের ১ প্রিভি কাউন্সিল
সংক্রান্ত বিধি ৮

মোট — ১০০

অষ্টমপত্র ঃ ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩১৩ ত্রিং সনের কুসিদ নিয়ামক বিধি ৫
ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩১৪ সনের তমাদি আইন....................২০
ত্রিপুরা রাজ্যের ১২৯৭ সনের রক্ষিত আইন বনভাগ...........১০
ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩৩৯ ত্রিং সনের স্টাম্প আইন ২০
ত্রিপুরা রাজ্যের তিল কার্পাস আইন ১০
ত্রিপুরা রাজ্যের রেজিস্ট্রি আইন....................... ....২০
ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩২৩ ত্রিং সনের সরকারী প্রাপ্য
আদায় সম্বন্ধীয় ৪ আইন ২০
ত্রিপুরা রাজ্যের opium and intoxicating Drug Act ৫

মোট — ১০০

কিন্তু ২২শে আষাঢ় ১৩৪৫ ত্রিং সনের (১৯৩৫ খ্রীঃ) এক মেমো দ্বারা এই সব স্বল্প শিক্ষিত উকিলদের ওকালতি করার পথ বন্ধ করে দেয়। ঐ আদেশে বলা যায় -" এ রাজ্যের ব্যবহারজীবি আইনের ১০ ধারার বিধান অনুসারে I.A.বা I.Sc পরীক্ষাত্তীর্ণ হলেই প্রথম শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অধুনা অধিকতর শিক্ষিত ব্যক্তিকে উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনায় আদেশ হইল যে অতঃপর বি. এ বি. এস. সি উপাধিধারী ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এ রাজ্যের ওকালতি পরীক্ষা দিবার অধিকারী হইবে না।" [১২]

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে উকিলদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী। ১৩১৮ ত্রিং সনের ১ নং নিয়মাবলীতে দেখা যায় প্রথম শ্রেণীর ওকিলগণ

সমস্ত আদালতেই কাজ করার অধিকারী ছিলেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণ রেভিনিউ কোর্ট, নিম্নফৌজদারী ও দেওয়ালী আদালত এবং খাস আদালতের আদিম বিভাগের কাজ করতে পারতেন। তৃতীয় শ্রেণীর উকিলবাবু রেভিনিউ কোর্ট, নিম্নফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে কাজ করতে পারতেন। এবালিসী আপিল আদালতে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল আপিলের মোকদ্দমায় বিস্তৃর্ণ কার্য (extensive practice) করেছিল এ রকম উকিল উক্ত কার্যের নিদর্শন ও তৎসহ পোষকতার উক্ত উকিলের যোগ্যতা সম্বন্ধে উক্ত কার্যের সার্টিফিকেট পেলে তাকে প্রথম শ্রেণীর ওকালতি সনন্দ দেওয়া হত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Entrance পরীক্ষায় পাশ বা নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় বৎসরের পাশ করা কর্মরত দ্বিতীয় শ্রেণীব উকিল সৎচরিত্র এবং আইনী নজীর ও সার্কুলার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হলে এবং বাচনিক পরীক্ষায় পাশ করলে তাকে প্রথম শ্রেণীর ওকালতি সনন্দ দেওয়া হত।[১৩] এরূপ সংস্কার করার ফলে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দেব পব থেকে বাজ্যে সুশিক্ষিত ব্যবহারজীবির আগমন ঘটতে থাকে এবং বিচার কার্যও ব্রিটিশ ভারতের সমতূল্য পর্যায়ে চলতে থাকে।

রাজ সরকার উকিলদের জন্য পোষাক নির্দিষ্ট করে দিতে বাধ্য হয় কেননা উকিলগণ উপযুক্ত পোষক পরিধান না করেই পূর্ব থেকেই কোর্টে মামলা পরিচালনা করত। যদিও একবার ১৩১২ ত্রিং সনের অর্থাৎ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাদের সাবধান করা হয়েছিল কিন্তু কার্য্যতঃ উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় নি। সেজন্য ১৩২২ ত্রিং সনের (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে) ২২ শে মাঘ এক আদেশ বলে উকিলদের নির্দিষ্ট পোষাক আবশ্যকীয় করা হয়—"অনেক উকিল মহাশয়ই উপযুক্ত পোষাক ব্যবহার না করিয়া সাধারণ পোষাকে কাছাড়ীতে আসিয়া থাকেন। ইহা নিযম ও সুরুচি বিরুদ্ধ। অতএব এতদ্বারা পূর্বোক্ত মেমোর প্রতি উকিল মহাশয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় যে তাহারা এখন হইতে পার্শ্বের লিখিত পোষাক ব্যবহার করিয়া কাছারিতে আসিবেন। অন্যথায় তাঁহাদের উপস্থিতি গণ্য করা হইবে না।"[১৪] এবারে দেখা যাক কি রকম বেশ উকিলদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। (১) পেন্টলুন বা ধূতি (২) চাপকান, চোগা ও চাদর, (৩) চোগা ও কোর্ট এবং (৪) শামলা (শালের পাগড়ী বা সাদা পাগড়ী)।

বর্তমান কালের ব্যবহারজীবিদের ন্যায় রাজআমলের ব্যবহারজীবিগণ নিজেদের ইচ্ছেমত পারিশ্রমিক বা ফিস গ্রহণ করতে পারতেন না। তাঁদের পারিশ্রমিক রাজ সরকার নির্দিষ্ট করে ঘোষণাপত্র বা আদেশজারী করত। ১৩২২ ত্রিপুরাব্দের ৮ই মাঘ তারিখে সরকারী মোকদ্দমায় উকিলদের ফিস সম্বন্ধে বিচার বিভাগ থেকে প্রচারিত ঘোষণা পত্রে দেখা যায় "সদরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকিলগণ সাধারণতঃ খাস আদালতের কার্য করেন বলিয়া খাস আদালত ও নিম্ন আদালতে কার্য করা হেতু ১ম শ্রেণীর উকিলগন ৪ টাকা হারে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিলগণ ২টাকা হারে দৈনিক ফিস প্রাপ্ত হইবেন। সদরের তৃতীয় শ্রেণীর উকিলগণ ২টাকা হারে দৈনিক ফিস প্রাপ্ত হইবেন। সদরের তৃতীয় শ্রেণীর এবং মফঃস্বলে সকল শ্রেণীর ওকিলগণ দৈনিক ১নং টাকা হারে ফিস প্রাপ্ত হইবেন। এতদরিক্ত মফঃস্বলে এক তারিখে একজন উকিল একাধিক মোকদ্দমার কার্য করিলে কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বিশেষ পরিশ্রম করা হইয়াছে বলিয়া বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইলে, বিচার বিভাগের আদেশে দৈনিক ফিসের দ্বিগুণ

পর্যন্ত প্রদত্ত হইতে পারিবে। সদর বিভাগে সাধারণতঃ বিচার বিভাগ হইতেই উকিল নিযুক্ত হইয়া থাকে। তথায় উল্লিখিত কার্যাধিক্য কিম্বা একাধিক মোকদ্দমার কার্য করিলে বিচার বিভাগ হইতে প্রত্যেকে মোকদ্দমায় বিশেষ আদেশ প্রচারিত হইবে।" [১৫]

এখানে দেখা যায় যে মফঃস্বলের ওকিলগণ সদরের উকিলদের চেয়ে কম ফিসে কাজ করতে বাধ্য হতেন। কেন এরূপ বৈষম্য করা হত বা জানা যাচ্ছে না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের পরে অবশ্য উকিলদের ফিস সম্বন্ধীয় আর কোন আদেশ গেজেটে লক্ষ্য করা যায় না।

তথ্যনির্দেশ

১) বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন (সম্পাদিত) : ত্রিপুরা গেজেটে সংকলন, আগরতলা ১৯৭১, পৃঃ ২৮

২) ঐ : তদেব, পৃঃ ৪২২-৪২৩।

৩) ক) দত্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন (সম্পাদিত) : রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, আগরতলা ১৯৭৬ ইং, পৃঃ ১৪৮।

৩) খ) ঐ : তদেব, পৃঃ ১৪৮।

৪) ঐ : তদেব পৃঃ ১৬৬।

৫) ঐ : তদেব, পৃঃ ১৩২, ৪২০।

৬) ঐ : তদেব পৃঃ ১৫৮।

৭) ঐ : তদেব পৃঃ ৪৩১।

৮) ঐ : তদেব পৃঃ ৪২৮, ৪৩২।

৯) বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন : ত্রিপুরা গেজেট সংকলন, পৃঃ১১০

১০) ঐ : তদেব, ১২৬।

১১) ঐ : তদেব পৃঃ ৩৭০-৩৭১।

১২) ঐ : তদেব, পৃঃ ৩৭২।

১৩) দত্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন : পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ৪১৪-৪১৫।

১৪) ঐ : তদেব, পৃঃ ৪১৬।

১৫) ঐ : তদেব, পৃঃ ৪১৬।

বীরবিক্রম ঃ রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ

বিখ্যাত ভ্রমণকারী বীর বিক্রমের রাজত্বকালে শেষ দিকে বিশ্বযুদ্ধজনিত আতঙ্ক ও উদ্বেগের মধ্যেও প্রজাদের সুখ সুবিধার জন্য পার্বত্য রাজ্যে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলন তা কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগভিত্তিক সংস্কাররূপে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

কৃষি ঃ রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে রাজ্যে কৃষি বিভাগ গঠিত হয়েছিল এবং শিল্প বিভাগই কৃষি দপ্তর পরিচালন করত।[১] ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দে বসন্ত উৎসবে রাজধানীতে শিল্প ও কৃষির প্রদর্শনী মেলা হয়েছিল। চা-কৃষি নিমিত্ত ভূমি বন্দোবস্ত শুরু হয়েছিল ১৩২৬ ত্রিপুরাব্দে এবং এই বিষয়ে আইন তৈরী হয়েছিল। বীরেন্দ্র কিশোরের আমলেই ত্রিপুরাতে চা বাগান গড়ে উঠেছিল এবং উচ্চ ভূমিতে ধান, পাট ব্যতীত চা উৎপাদনের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩০খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চা বাগানের সংখ্যা ৪০ এ পৌছায় এবং চা কৃষিতে বিভিন্ন কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রায় ১ কোটি টাকা লগ্নী করা হয়েছিল বলে জানা যায়।[২] বীর বিক্রমের আমলে বাগানের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ১৯৪৭ বঙ্গাব্দে ৫০এ পৌছায়[২ক] এবং ১৯৬৪ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে চা বাগানের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬ তে। চা উৎপাদনকারী রাজ্য সমূহের মধ্যে ত্রিপুরা পঞ্চম স্থানের অধিকারী হয়।[৩]

বীর বিক্রমের আমলে চা কৃষি সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে এক আদেশ জারী করে বলা হয় যে – "১৯৩৩ ইং সনের Indian Tea Control Act XXIV এর বিধানসমূহ সাধারণভাবে এবং বিশেষতঃ চা কৃষি সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে উক্ত আইনের ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ের বিধানসমূহ (Control Over extension of Tea and penalties and procedures) এ রাজ্যের বিধানগণ্যে এ রাজ্যের চা কৃষি সংশ্রবে প্রযোজ্য হইবে।"[৪] উক্ত আইন পুণরায় ১.১.১৩৪৪ ত্রিং সনে এবং ৩০.১২.১৩৪৭ ত্রিং সনেও পুনরাদেশ জারী করে বলবৎ করা হয়।[৫] ত্রিপুরায় উৎপন্ন চা উৎকর্ষতায় ন্যুন এবং উহা ভাল চা-তে মেশাবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। যদিও উৎপাদনকারীরা সবুজ ও কালো উভয় প্রকারের তা উৎপাদন করে তবু কালো চা বেশী মাত্রায় উৎপাদিত হয়।

বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে কৃষি ও শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা রূপে যোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী কাজ

করেছিলেন। কিন্তু রেশম শিল্পের প্রতি বেশী দৃষ্টি দেবার ফলে কৃষি বিষয়ে খুব একটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৪০খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্যাভাবের আশঙ্কা করে বীরবিক্রম কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিকতা আনয়ন করতে ব্যাপক প্রচার কার্য করা হয়। ১৩৫২ ত্রিপুরাব্দের ২৭ শে চৈত্র এক রোবকারীতে রাজ্যে সর্বপ্রকার খাদ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে আদেশ দেন। "ধান্য-চাউল, ফলমূল, তরিতরকারী ইত্যাদি খাদ্যবস্তুর পরিপোষক রূপে যুদ্ধের স্থিতিকাল পর্যন্ত রাজ্যবাসীগণ মাংসজাত খাদ্যবস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য নিজ নিজ গৃহে ছাগ, মেষ, শুকর, মোরগ, হাঁস, কবুতর প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিপালন করে যেন তদ্দ্বারা অন্যভাবে খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায় বিধান হইতে পারে।"[৬] ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বীর বিক্রম 'অধিক খাদ্য ফলাতে' আবেদন করলেন প্রজাদের কাছে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই আন্দোলন আরও জোরদার করা হয়। সেনাবাহিনীকে রসদ জোগাতে সব্জি উৎপাদন খামার ও মুরগী উৎপাদন খামার গড়ে তোলা হয়। মনতলাতে একটি দরতালুক সব্জি খামার তৈরীর জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রকেই কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য হাইস্কুল ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের চতুর্দিকে সংরক্ষিত ভূমি রেখে ছাত্রদের কৃষি কাজে উৎসাহ দেবার জন্য সার্কুলার পাঠান হয়েছিল।[৭]

রাজ্যের আয়তনের ১০,০৬৬ স্কোয়ার কিলোমিটারের মধ্যে ৭৫ ভাগ জমিই ছিল বনাঞ্চল অর্থাৎ ৮,০০,৩১৫ হেক্টার বনভূমি এবং ১,২৪,৯৭৫ হেক্টার জমিতে ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চাষাবাদ হত। এ জমিতে ধান, পাট, সরিষা, ইক্ষু, চা এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হত। Memorandum and Statistics relating to Agriculture, Forestes, Export and Import, Tripura State, 1937-38 এ দেখা যায় উপরোক্ত ফসল কোনটা কত পরিমাণ জমিতে চাষ হত এবং কি পরিমাণ ফসল ফলত তা নিচের সারণী থেকে জানা যাবে[৮]

ফসলের নাম	চাষের এলাকা	ফলন
ধান	১০৪৬০৩ হেক্টার	২০০২০১৩.৮০ কুইন্টাল
পাট	৫১৮৯ „	৬২১১৮.৩৩ „
সরিষা	৪১৩৪ „	২১৩৪৯.৩৩ „
আখ	২২৩৬ „	৪৮৩৭৬.৬৭ „
অন্যান্য	৪৫৯২ „	— „
চা	৪২২৫ „	১২৬১৯.৩২ „

মূল্য বৃদ্ধি ঃ যুদ্ধ চলাকালে শস্যের দর বেড়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হয়। ১৩৪৯ ত্রিং সনের অর্থাৎ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের পণ্যের দর এবং ১৩৫৩ ত্রিং সনের অর্থাৎ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ঐ সময়ে পণ্যের দর তুলনা করলে মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ জানা যেতে পারে। কেবলমাত্র সদর বিভাগের দরের তুলনা করা হল।[৯]

১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দ	১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে
চাউল-৫্ টাকা মণ প্রতি	চাউল-১১্ টাকা প্রতি মণ
ধান - ২" ,, ,, ,,	ধান - ৫্ ,, ,,
কার্পাস ৭্ টাকা ,, ,,	কার্পাস ৬ ,, ,,
রুই ১৭্ ,, ,, ,,	রুই ৩০্
তিল ৫ টাকা বার আনা ,, ,,	তিল ১৭্ ,, ,,

দেখা যাচ্ছে যুদ্ধের ৫ বৎসরে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হয়েছিল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বৃহৎবঙ্গ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। ইংরেজ "ভারত ছাড় আন্দোলন" দমন করতে ভারতবাসীদের হাতে না মেরে ভাতে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। লক্ষ লক্ষ টন ধান, চাউল, গম, আটা বাজার থেকে কিনে নানা স্থানে স্তূপীকৃত করে অগ্নিদগ্ধ করা হয় বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। বীরবিক্রম ত্রিপুরাতেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেজন্য তিনি অনেকগুলি বিশাল শস্যভান্ডার গড়ে তুলেছিলেন। আগরতলাতে কেন্দ্রীয় গুদাম এবং মহকুমাগুলিতে ছোট ছোট গুদাম তৈরী করে শস্য কিনে গুদাম ভর্তি করতে খরচ করলেন ১৫,৫৬,৮৫০ টাকা। চরম অভাবের সময়ে কেনা দামে ঐ শস্য প্রজাদের মধ্যে বন্টন করা হল। দাম বাড়াবার জন্য জনৈক পদস্থ কর্মচারী অনুরোধ করলে রাজা বলেন —"আমার বংশ রাজদন্ড ধারণ করিয়াছে, তুলাদন্ড ধারণ করে নাই।"[১০] রাজার ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ৬,১৩,৬০৫ টাকা। প্রচুর নিরন্ন বাঙালী সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে রাজার প্রদত্ত খাদ্য পেয়ে প্রাণে বাঁচে।

মজুরী ঃ ত্রিপুরা রাজ্যে বহিরাগত শ্রমিকগণ দিন মজুর মজুরী করত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল কেননা তাদের মজুরী বৃদ্ধি পেলেও সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৯৪৩-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মজুরী তুলনা করলেই তাদের অবস্থার স্বরূপ পরিস্কার হবে।[১১]

১৯৩০-৩১ খৃঃ	১৯৪৩-৪৬ খৃঃ
সাধারণ শ্রমিক ৬ আনা - ৮ আনা	সাধারণ শ্রমিক - ২টা - ২টা ৮ আনা
মেসন - ১২ আনা - ১টা ৮ আনা	কামার - ২টা - ৩টা
কাঠমিস্ত্রী - ১০ আনা - ১টা	মেসন - ২টা - ৩টা
ঘরামী - ৬ আনা - ১৩ আনা	
মাইটাল - ৮ আনা - ১০ আনা	

উপরোক্ত মজুরীর হার পুরুষ শ্রমিকদের কিন্তু স্ত্রীলোক শ্রমিকের হার আরও কম ছিল।

পূর্ত্ত বিভাগ ঃ বীরবিক্রমের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ত কাজের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে পাকা দালান তৈরী, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, পুকুর খনন ও পরিস্করণ ও টিউবওয়েল বসান, রাজবাড়ীর কাজ ইত্যাদি। অধিকাংশ রাস্তাই ছিল কাঁচা ও সেতুগুলি ছিল কাঠের তৈরী। সেজন্য প্রতি বছর সেতু মেরামত ও রাস্তার সংস্কারের কাজ করতে হত। ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে আগরতলা-আখাউড়া রাস্তার যে অংশ রাজ্যের ভেতরে রয়েছে তা পাকা করা হয়। ১৯২৬ সালের মধ্যে আগরতলা-

উদয়পুর সড়ক বিস্তৃত করা হয়। অবশ্যই তখন ও এই সড়ক কাঁচাই ছিল। ১৯৪২ সালে কুমিল্লা-সোনামুড়া-আগরতলা কাঁচা রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ হয়। কুমিল্লা-আগরতলা-সিমলা রাস্তা ১৯৪২ সালে শুরু করে ১৯৪৩ সালে শেষ করা হয় এবং ১৯৪৫ সালের মধ্যে পাকা করা হয়। মহকুমাগুলিতেও তাঁর আমলে প্রচুর কাঁচা রাস্তা তৈরী হয়েছে কিন্তু প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে প্রতি বছরই সেগুলি মেরামত করতে হত। মেলাঘর-কাকড়াবন রাস্তা, আঁধার মানিক-লেম্বুছড়া রাস্তা, লেম্বুছড়া-ফটিকরায় চা-বাগানের রাস্তা, বাগবাড়ী-দেবেন্দ্রনগর রাস্তা, মোগরা রাস্তা, পদ্মনগর-জুমের ঢেপা রাস্তা, বীরেন্দ্রনগর-মান্দাই বাজার রাস্তা, গোলাঘাটি-সালদা রাস্তা, বিলোনীয়া-লুংথাম রাস্তা, বিশালগড়-বঙ্গেশ্বর রাস্তা, আগরতলা-চম্পকনগর, কালাছড়া-ফটিকরায়, খোয়াকুড়ী-ধর্মগড় লিঙ্ক রোড, আগরতলা-রানীর বাজার, অরুন্ধতিনগরের রাস্তা, কৈলাসহর-উনকোটি রাস্তা, মোহনপুর-সুবলসিং বাড়ী রাস্তা, খোয়াই-সুবলসিং বাড়ী রাস্তা, খোয়াই-কল্যাণপুর, মেলাঘর-তুলামুড়া-মাতারবাড়ী-উদয়পুর রাস্তা, উদয়পুর-চন্দ্রপুর, রাগণা-ধর্মনগর, লুংথাম-মুহুরীপুর, কুলাই হাউর-আমবাসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মেলাঘরের নীরমহল ও শিলং-এর ত্রিপুরা ক্যাসেল তাঁর আমলেই তৈরী হয় এবং যথারীতি চাকলারোশনাবাদের রাজস্ব থেকে এগুলির ব্যয়ভার বহন করা হয়। এছাড়া ক্যানটনমেন্টে শিবমন্দির, নিজস্ব বৈঠকখানা, অন্দর মহলের কিছু ঘর বাড়ী, সদর ডি এম এর অফিস, প্রাসাদে বিলিয়ার্ড রুম, আদালত ভবন, কুঞ্জবন প্রাসাদ ও মালঞ্চ বাস প্রাসাদের সংস্কার, পোস্টাপিস বিল্ডিং, সার্কুলার বাজার বিল্ডিং, মন্ত্রীবাড়ী, ইলেকট্রিক সাপ্লাই ভবন প্রভৃতি তাঁর আমলেই গড়ে তোলা হয়। শহরের ভেতরে থানা রোড গাঙ্গাইল পর্যন্ত, হাসপাতাল রোড, প্যালেস অ্যাভিনিউ, রাধানগর রোড, আখাউড়া রোড, রোনাল্ডসে রোড ও জগন্নাথ বাড়ী রোড প্রশস্ত করা হয়। রাজবাড়ীর গেইট থেকে জেকসান গেইট পর্যন্ত রাস্তা পাকা করা হয়। ৭৯ টিলাতে বিলাতজঙ্গ ভবন তৈরী করা হয়। মহকুমাতে পাকা ভিটে টিনের বাড়ী তৈরী করা হয় প্রসাশনিক ভবন হিসাবে। বন বিভাগের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছন বাঁশ ও কাঠের বাংলো নির্মাণ করা হয়। কুমারদের বাড়ী, রাজ কর্মচারীদের বাসস্থান, জেইল নির্মাণ ও সংস্কারকরণ প্রভৃতি কাজও অব্যাহত ছিল। রাজ্যের নানা স্থানে পুস্করিণী খনন ও শহরের ভেতরে ও পুস্করিণী খনন ও কিছু টিউবওয়েল বসান হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে উন্নয়ন খাতের মোটা অংশ ব্যয় করা হত পূর্ত কাজে এবং তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ-[২২]

বৎসর	মোট ব্যয় (টাকা)	বৎসর	মোট ব্যয় (টাকা)
১৯২৩-১৯২৪	২৭৯৫১৯	১৯৩২-৩৩	৭৯৮৯৯
১৯২৪-১৯২৫	২৮৭৫৭২	১৯৩৩-৩৪	১৬৬৭৯৯
১৯২৫-১৯২৬	২৩০৭১১	১৯৩৪-৩৫	২১৪৫৫২
১৯২৬-১৯২৭	২৮১০১৫	১৯৩৫-৩৬	২০১৯২৫
১৯২৭-১৯২৮	৩১০০৯৭	১৯৩৬-৩৭	২৮০০৯
১৯২৮-১৯২৯	১৭৮০০৯+৩৫১৫১২	১৯৩৭-৪০	১০০৬৫৮৮
১৯২৯-১৯৩০	৮৬৭৫১৪	১৯৪০-১৯৪৩	৭৮৮৩৩২
১৯৩১-১৯৩২	৮১৩৯৭	১৯৪৩-১৯৪৬	১১২৮৫০৪

স্বাস্থ্য ঃ বীরবিক্রমের কালের সূচনাতে ১৯২৩-২৪ খ্রীঃ রাজ্যে একটি হসপিটাল (ভি এম) এবং ১৯টি ডিসপেনসারী চালু ছিল। এগুলি হচ্ছে ভি এম, প্রাসাদ, হোমিওপ্যাথী, পুরাতন আগরতলা, বিশালগড়, সোনামুড়া, উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনীয়া, লুংথাং, সাব্রুম, খোয়াই, কল্যাণপুর, কৈলাসহর, কমলপুর, ধর্মনগর, ফটিকরায়, বীরেন্দ্রনগর ও মোহনপুর। ১৯২৪-২৫ সালে কল্যাণপুর ডিসপেনসারী এবোলিস হলে মোট সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৮টিতে। ১৯২৮-২৯ সালে বীরেন্দ্রনগর ডিসপেনসারী তুলে নিয়ে ধলেশ্বরে স্থাপন করা হয়। ১৯২৯-৩০ সালে কুঞ্জবন ও কুলাই হাউরে ডিসপেনসারী খোলার ফলে মোট সংখ্যা পুনরায় ২০ হয়ে যায়। ১৯৩২-৩৩ সালে মোহনপুর, লুংথাং ও ফটিকরায় এবোলিস করে কল্যাণপুরে পুণরায় ডিসপেনসারী খোলা হয়। সেজন্য মোট সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ১৮ তে। ১৯৩৫-৩৬ সালে মুহুরীপুরে পুনরায় চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার ফলে মোট সংখ্যা ১৯-এ দাঁড়ায়। ১৯৪০-৪৩ সালের প্রশাসনিক বিবরণীতে ২১টি ডিসপেনসারীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয় এবং ১৯৪৩-৪৬ সালের বিবরণীতেও মোট সংখ্যা দেখা যায় ২১টি।[১১] এছাড়া ভি এম হাসপাতালে ১৯২৮-২৯ সালে একজন বেক্টোলজিস্ট নিযুক্ত করা হয়, ১৯৩২-৩৩ সালে ভি এম হাসপাতালে কালাজ্বর কেন্দ্র, ১৯৩৩-৩৪ খ্রীঃ আগরতলা ও খোয়াইতে কুষ্ঠরোগ কেন্দ্র, ১৯৩৩-৩৪ সালে ভি এম এ এন্টিরেবিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ১৯৩৭-৪০ সালে আরও একটি কুষ্ঠরোগ কেন্দ্র এবং x-ray unit বসান হয়েছিল। ভি এম হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যা ১৯২৩-২৪ সালে ২জন থেকে শুরু করে ১৯৪৩-৪৬ সালে ৭জন পর্যন্ত হয়েছিল। এছাড়া আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয়ে একজন কবিরাজ এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে একজন ডাক্তার কাজ করতেন। ডিসপেনসারীগুলিতে সাবঅর্ডিনেট ডাক্তার এবং ৬জন Midwives ধাই ও ৬জন নার্স কর্মরত ছিল। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

বৎসর	মোট ব্যয় (টাকা) এলোপ্যাথিক	বৎসর	মোট ব্যয় (টাকা)
১৯২৩-২৪	১,৩১,৯৩১	১৯৩৭-৩৮	৮৭৮১২
১৯২৪-২৫	৬০,৩১৩	১৯৩৮-৩৯	৭৬৯৮৪
১৯২৫-২৬	৬৮,২২৮	১৯৩৯-৪০	৮৪৭৯১
১৯২৬-২৭	৭০২৭৮	১৯৪০-৪১	৯৬৭৮২
১৯২৭-২৮	৭৯৫৯৭	১৯৪১-৪২	৮৩৯২৮
১৯২৮-২৯	৭৩৭২৫	১৯৪২-৪৩	৮৫৫৩৪
১৯২৯-৩০	৭১৪৯৭	১৯৪৩-৪৪	৯১১২৮
১৯৩১-৩২	৬৫৩৬০	১৯৪৪-৪৫	১০৪৮৬৩
১৯৩২-৩৩	৬৪০৭০	১৯৪৫-৪৬	১০৩[illegible]২০
১৯৩৩-৩৪	৬৫৩২৯		
১৯৩৪-৩৫	৬৭৬৩৮		
১৯৩৫-৩৬	৬৬৫১৩		
১৯৩৬-৩৭	৭১৯৫০		

শিক্ষা ঃ (ক) প্রসাশনিক কাঠামো ঃ শিক্ষা বিস্তারের সূচনাকালে রাজ্যে আলাদা কোন শিক্ষা বিভাগ ছিল না। মন্ত্রীর অধীনে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের অধীনে একজন মোহেরার চিঠিপত্র আদান প্রদান ও উর্ধ্বতন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পরে একজন সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হয়। তিনি রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় (মধ্য ইংরেজি, উচ্চবাংলা, নিম্ন বাংলা, পাঠশালা) পরিদর্শন করতেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সুপারভাইজার পদ এবোলিস করে সাব ইন্সপেক্টারের পদ সৃষ্টি করা হয়। সাব ইন্সপেক্টরের শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, বিশেষ ক্ষেত্রে হাইস্কুলেব নাইন পাশ, নির্ধারিত হয়। নাইন পাশের ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্বত্য ভাষায় দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। বেতনক্রম মোট ৪৫টাকা মাসিক। ১৯১৫খ্রীষ্টাব্দে উমাকান্ত একাডেমীব প্রধান শিক্ষককে এক্স অফিসিও ইন্সপেক্টার অব স্কুলস ঘোষণা করা হয়। ডেপুটি ইন্সপেক্টার অব স্কুলস নিযুক্ত করা হয়। এই পদাধিকারীকে উচ্চ ইংরেজী, মধ্য ইংরেজী, উচ্চ বাংলা এবং নিম্ন বাংলা স্কুল পরিদর্শন করতে আদেশ দেয়া হয়। ফলে সাব ইন্সপেক্টার কেবল পাঠশালাই পরিদর্শন করতে পারতেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা ষ্টেট সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠন করে ১টি ইন্সপেক্টার অব স্কুলের পদ সৃষ্টি করা হয়[১৩] ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ইন্সপেক্টারের পদ এবোলিস করে দুইটি সাব ইন্সপেক্টারের পদ সৃষ্টি করা হয়। রাজ্যকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে ইন্সপেক্টারের সদর দপ্তর রাজধানীতে এবং সাব ইন্সপেক্টারদের সদর কৈলাসহর ও সোনামুড়াতে নির্দিষ্ট করা হয়। সদর বিভাগ নিয়ে সদর সার্কেল, কৈলাসহব, ধর্মনগর, খোয়াই ও কল্যাণপুর বিভাগ নিয়ে উত্তব সার্কেল এবং সোনামুড়া বিলোনীয়া, সাব্রুম, উদয়পুর ও অমরপুর বিভাগ নিয়ে দক্ষিণ সার্কেল গঠন করা হয়েছিল।[১৪] এই ছিল বীরবিক্রম মাণিক্যের কার্যকালের সূচনাতে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা প্রশাসন।

বীরবিক্রমের আমলে শিক্ষা প্রশাসনের পরিবর্তন ঘটে এবং একটি পরিপূর্ণ বিভাগে পবিণত হয়ে উঠে, যা ভারত, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল। প্রথমেই দেখা যায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন অতিরিক্ত হিল সাব ইন্সপেক্টার অব স্কুলের নিযুক্তি। খোয়াই, সদব বিভাগের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পবিদর্শনের জন্যই এই পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল।[১৬] ১৩.৮.১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকেব লকব পরিবর্তন কবে ডিরেক্টার অব পাবলিক ইন্সট্রাকশান করা হয়।[১৭] ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দেব শেষ দিকে মন্ত্রীকে সহায়তা করাব জন্য চিফ ইন্সপেক্টার অব স্কুল পদ সৃষ্টি করা হয়।[১৮] ১৮.২.১৯৪৯ তারিখে ডিরেক্টার অব পাবলিক ইন্সট্রাকসানকে মন্ত্রীর অধীনস্থ সেক্রেটারীর কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। [১৯] কাজেই বীরবিক্রমের আমলে ভারতভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল নিম্নরূপঃ- মন্ত্রী সেক্রেটাবী-ডি পি আই-চিফ ইন্সপেক্টর-ইন্সপেক্টার এবং তিনজন সাব ইন্সপেক্টর অর্থাৎ মোট ৬জন আমলা শিক্ষা বিভাগ পরিচালনা করতেন।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন যে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রাজ্যে হাইস্কুল, এম. ই. স্কুল, উচ্চ বাংলা স্কুল, নিম্ন বাংলা স্কুল ও পাঠশালা নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। "এইগুলির মধ্যে উচ্চ বাংলা, নিম্ন বাংলা, পাঠশালা প্রাইমারী স্কুল নামে অভিহিত হলেও প্রাইমারী স্কুলের অধিকাংশই ছিল পাঠশালা পর্যায়ভুক্ত।"[২০] মহারানীর ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যে ২৫০টি প্রাইমারী স্কুল ছিল। ১৩৫৫ ত্রিং সনের (১৯৪৬ ইং)

প্রশাসনিক বিবরণী অনুযায়ী রাজ্য পাঠশালা ছিল ৮৬টি, নিম্ন বাংলা স্কুল ৩২টি অর্থাৎ প্রাইমারী স্কুলের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮টি।[২১] এই সময়ে রাজ্যে এম. ই. স্কুল ছিল ২২টি, এবং হাইস্কুল ৯টি। এই স্কুলগুলিতে প্রাথমিক শ্রেণী ছিল। কারণ ১৯৪৬ ইং সনে ৯টি হাইস্কুল থেকে মোট ১২০ জন পরীক্ষার্থী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসেছিল অর্থাৎ গড়ে ১৫জন ছাত্র প্রতি স্কুল থেকে এসেছিল।[২২] স্কুলগুলির মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৯৩৭জন অর্থাৎ প্রতি স্কুলে গড়ে ৩২৬জন পড়ুয়া ছিল। এই তিনশতের বেশী পড়ুয়া কেবল মাত্র সপ্তম-দশম শ্রেণীতে পাঠ করত তা হতে পারে না। কাজেই মহারানীর ঘোষণার মধ্যে মোট স্কুলের সংখ্যাতে হাইস্কুল ও এম. ই. স্কুলও ধরা হয়েছিল। এসব মিলে মোট সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১১৮+৩১=১৪৯ এ, তবু ২৫০ হচ্ছে না। ১৩৫৫ ত্রিং সনের প্রশাসনিক বিবরণীতে প্রাইভেট প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা দেখান হয়েছে ৪৩টি।[২৩] এসব স্কুল সরকারী অনুদান পেত না। এই সংখ্যাটি যোগ করলে মোট স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯২। খুব সম্ভবতঃ জনশিক্ষা সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অভ্যন্তরের অনেক স্কুলের স্বীকৃতি দেবার ফলেই সংখ্যাটি ২৫০ এ দাঁড়িয়েছিল। বেসরকারী ৪৩টি স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ৪৭৫১জন ছাত্রছাত্রীর অস্তিত্ব প্রশাসনিক বিবরণী স্বীকার করেছে।[২৪] বীরচন্দ্র থেকে শুরু করে বীরবিক্রম পর্যন্ত স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে ৩৪,১৪৪,১৩৪ এবং ২৫০টি। রাজধানীতে, বিভাগীয় কার্য্যালয়ের আশেপাশে সমতল ভূমিতেই স্কুলগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণী অনুযায়ী রাজ্যের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১০০০১জন।[২৫]

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রাজ্য সরকারের স্কুল চালু হবার পরে স্কুলে ভর্ত্তির জন্য ফিস এবং পড়ার জন্য বেতন আদায় করা হত না। প্রায় ৭০ বৎসর এভাবে চলার পর বীরবিক্রমের আমলে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তির ফিস এবং মাসিক বেতন আদায় করার প্রথা চালু হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় যে ভর্তির ফিস এবং বেতন না দেবার ফলে বহু ছাত্রী নিয়মিত স্কুলে আসত না। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে তাদের নাম রেজিস্টারী হতে কাটা হত। এতে শিক্ষার প্রতি অমনোযোগিতা প্রকাশ পায়। ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে পুনরায় এক সার্কুলার অনুযায়ী জানা যায় যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে (শিশু শ্রেণী) Infant Class Section A এবং B, Class I ও Class II এর জন্য স্কুলে ভর্তি হবার সময়ে ৮ আনা ভর্তির ফিস দিতে হবে এবং কোন কারণে নাম কাটা গেলে পুনরায় ভর্তির ফিস না দিলে নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হবে না। প্রত্যেক ছাত্রকে মাসে চার আনা হিসাবে বেতন দিতে হবে। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির জন্য নিয়মমত জরিমানা দিতে হবে। "কিন্তু ত্রিপুরা, মণিপুরী, ঠাকুর লোক, রাজকুমার সম্প্রদায়ের ছাত্রগণকে উপরোক্ত নির্ধারিত হারে বেতন দিতে হইবে না।"[২৬] ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পুণরায় রাজকীয় বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় —"রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণের নিকট হইবে কেবল ভর্তির ফিস গ্রহণের নিয়ম না থাকায় অনেক ছাত্র যথেচ্ছা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং বিনা কারণে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয় যায়। ...... পাঠশালা ও নিম্ন বাংলা স্কুলের ভর্তি হইবার সময় প্রত্যেক ছাত্রকে ভর্তি ফিস বাবত ৪আনা দিতে হইবে। .... একবার রেজিষ্ট্রি হইতে কাহারও নাম কর্ত্তন করা হইলে পুনরায় ভর্তির ফিস গ্রহণ ব্যতিত তাহার নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত হইতে পারিবে না।"[২৭]

এই আদেশের ফলে রাজ্যের সব অংশে পাঠশালা ও নিম্ন বাংলা স্কুল সমূহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

হয়। বিদ্যালয়গুলির ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকে এবং নুতন ভর্তির সংখ্যা ও কমে যেতে থাকে। রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে ১৩৪৩ ত্রিং সনে (১৯৩৩ খ্রীঃ) বেতন আদায় রহিত করেন।[১৮] কিন্তু ভর্তির ফিস আদায় চালু থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি কি বিষয় পড়ান হত, সে বিষয়ে উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাব রয়েছে। লেখক ত্রিপুরার অন্যতম প্রবীণ নাগরিক শ্রদ্ধেয় জিতেন পাল মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে বীরবিক্রমের আমলের শেষ দিকের কিছু অস্পষ্ট ছবি জোগাড় করেছেন। জিতেন পাল মহাশয় ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক সাবইন্সপেক্টর এবং শেষ পর্যন্ত বিজয় কুমার এম.ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে কাজ করেছেন। তাঁর মতে পাঠশালাতে Infant Class এ ভর্ত্তির কোন নির্দিষ্ট বয়স ছিল না। Infact Class এর ব্যাপ্তি ছিল ১বৎসর, কি পড়ান হত তা তাঁর মনে নেই। তবে প্রথম শ্রেণীত বর্ণ পরিচয়, সংখ্যা পরিচয় ১-১০০ পর্যন্ত, ধারাপাত ও হস্তলিপি পাঠ্য বিষয়বস্তু ছিল। বার্ষিক পরীক্ষা হত মৌখিক। ২য় শ্রেণীতে ইংরেজী বর্ণ পরিচয়, বাংলা গদ্য, বাংলা পদ্য, অংক (যোগ ও বিয়োগ), হস্ত লিপি অবশ্য পাঠ্য ছিল। ইংরেজী, অংক ও বাংলার ১০০ নম্বর ধরে মৌখিক পরীক্ষা হত। ৩য় শ্রেণীতে মোট ৪০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হত। বিষয়গুলি হচ্ছে ইংরেজীতে শব্দ যোজনা ১০০ নম্বর। বাংলার গদ্য ও পদ্য পাঠ ১০০ নম্বর, গণিত যোগ ও বিয়োগের সঙ্গে গুণ ও ভাগের প্রক্রিয়া ১০০ নম্বর, শারীরিক স্বাস্থ্যবিধি ও হস্তলিপি ১০০ নম্বর। ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হত। পাশ না করলে শ্রেণী উন্নয়ন হত না। ৪র্থ শ্রেণীতে বাংলা গদ্য ও পদ্য পাঠ ১০০ নম্বর। অঙ্ক মিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ল.সা.গু, গ.সা.গু ও সময়ের অঙ্ক ১০০ নম্বর, ইংরেজী Story, Poem, Rhyme ১০০ নম্বর, স্বাস্থ্য শিক্ষা (Personal hygine) ৫০ নম্বর, ভূগোল ত্রিপুরা রাজ্যের মহকুমা, সব ডিভিশান, ডিভিশান, পাহাড়, নদী, নালা ইত্যাদি ৫০ নম্বর, ইতিহাস রাজা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, মহিম কর্ণেল, বীরচন্দ্রের জীবনী এবং ভূপেন্দ্র চক্রবর্তীর 'রাজমালা' ৫০ নম্বর। মোট ৪৫০ নম্বরের বার্ষিক পরীক্ষা হত। অবশ্যই ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক পরীক্ষাও বাদ যেত না। বিদ্যালয়ের প্রথম স্থানাধিকারীকে বৃত্তি পরীক্ষায় বসবার সুযোগ দেওয়া হত।

রাজ্যে নূতন পাঠশালা স্থাপন করলে পাঠশালাগুলিকে মাসিক অর্থ সাহায্য করার প্রথা প্রচলিত ছিল। বীরবিক্রমের আমলে ১৩৬৬ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের এক মেমোতে দেখা যায় এই ব্যাপারে মাস সর্বাধিক ৮্ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৫্ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল।[১৯] ঐ মেমোতে স্কুলের তালিকাতে কলই রাংখল, হাকর সর্বং, পাটাবিল, লেম্বুছড়া, খামারহাটি, কালিকপুর, ইটাই সোনাপুর, রাতাছড়া, কলমখেত এবং ব্রজেন্দ্রনগর পাঠশালায় নাম পাওয়া যায়। শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করলে স্থানীয় জনসাধারণ ও দাতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাদের নাম গেজেটে ঘোষণা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের এক বিজ্ঞপ্তিতে এরূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন লক্ষ্য করা যায়। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বর্দ্ধন করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তাদের বৃত্তি পরীক্ষায় বসান হত, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা আর্থিক সাহায্যে বিশেষ উপকৃত হত। মেধাবী বিত্তবান ছাত্র ও বৃত্তি পেত। বীরবিক্রমের শেষ কয়েক বৎসরের ১৩৫১-১৩৫৫ ত্রিং সনের চিত্র নিম্নে দেয়া হল।

সারণী ৩০

বর্ষ	মোট পরীক্ষার্থী	বৃত্তির শ্রেণী	পাশকরা ছাত্রছাত্রী সংখ্যা		বৃত্তি প্রাপকদের সংখ্য		বৃত্তিরহার	বৃত্তিব ব্যাপ্তিকাল
	mrEসহ		ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী		
১৩৫১ ত্রিং	১২৬৭	এল. ভি পাঠশালা	৯৯ ৪৩৮	৪৬ ১০৩	১২	৭	২-৫ টা	২ বৎসর প্রতি মাসে
১৩৫২ ত্রিং	৪০৯	এল. ভি পাঠশালা	৪০ ১২১	২৬ ৪১	১০	৭	২-৫ টা	২ বৎসর প্রতি মাসে
১৩৫৩ ত্রিং	৪০৯	এল. ভি পাঠশালা	৪০ ১২১	২৬ ৪১	৭	১০	২-৫ টা	২-৪বৎসর প্রতি মাসে
১৯৫৪ ত্রিং	৪০১	এল. ভি পাঠশালা	৪৬ ১০৯	২২ ৮৭	১০	৮	২-৫ টা	২-৪ বৎসর প্রতি মাসে
১৩৫৫ ত্রিং	৪২৮	এল. ভি পাঠশালা	৬২ ৯৭	২৩ ৭৫	১০	৮	২-৫ টা	২-৪ বৎসর প্রতি মাসে

বীরবিক্রম মহারাজের আমলে একটি উল্লেখযোগ্য আইন রাজ্যে শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভবিষ্যতের শাসকদের ক্ষেত্রে দিশারী হয়ে রয়েছে তা হচ্ছে ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন। এই আইনের বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ হচ্ছে -- ৬ বৎসরের অধিক ও ১২ বৎসরের কম বয়সী বালক-বালিকাদের পিতা/অভিভাবক সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য থাকবে। শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ মাসে কতদিন কত ঘন্টা উপস্থিত না থাকলে অনুপস্থিত বলে গণ্য হবে, উক্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে না পাঠালে পিতা/অভিভাবককে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ১০্ টাকা অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে ৭দিন বিনাশ্রমে কারাদন্ড ভোগ করতে হবে, একবার দন্ডিত পিতা/ অভিভাবক পুনরায় অপরাধ করলে জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ হবে এবং ১৪দিন সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে অন্য কাজ করতে পাঠালে অনধিক ২৫্ টাকা জরিমানা হবে এবং অনাদায়ে ১৫ দিন বিনাশ্রমে কারাদন্ড ভোগ করতে হবে। একবার দন্ডিত ব্যক্তি পুনরায় ঐ অপরাধ করলে ৫০্ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ১ মাস সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করতে হবে। নির্ধারিত নিয়ানুসারে এক বা একাধিক বোর্ড গঠিত হবে। বোর্ড উপস্থিতির ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করবে। অনুপস্থিতির সংবাদ পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যালয়ে পাঠাবার জন্য বা কর্মে নিযুক্তি বন্ধ করার জন্য অভিভাবকের কাছে নিষেধাত্মক পত্র জারী করবে। ঘোষণাতে অনুপস্থিতি বা বিদালয়ে না পাঠাবার কিছু কারণ ও উল্লেখ করা হয়েছে।[৩১] ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দে এই আইন মহারাজার অনুমোদন লাভ করে এবং আগরতলা শহরের উমাকান্ত তুলসীবতা, বিজয়কুমার এবং ঠাকুরপল্লী এই ৪টি স্কুলে চালু করা হয়। এই প্রক্রিয়ার একটি ধারাবাহিক চিত্র নিম্ন সারণীতে পেশ করা হল যাতে দেখা যাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কি পরিমাণ ছাত্রছাত্রী আবশ্যিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসেছিল।

সারণী(বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা) [৩২]														
উপস্থিত	উপস্থিতির সংখ্যা													
ছাত্রছাত্রীর সম্প্রদায়														
কুমার	১	১	১	১	-	-	১	৩	-	-	-	-	১	-
ঠাকুর	৫৩	৫২	৫৬	৭২	৫৪	৬৪	৯৭	১২১	১২৪	১১৯	৯৪	৮৭	১০৬	১০০
মণিপুরী	১	৪	১০	-	৬	২৮	৮	১১	৬	১০	৭	১৩	১৩	১৬
ত্রিপুরা	৩৫	৩২	৩৪	৫৬	২১	১১	৪	১৬	২০	২৬	১	৭	১১	৩৭
লুসাই	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	১	১	-
খৃষ্টান	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
বাঙলীহিন্দু	৩১০,৩৯৫,৪৪৯,৪৪০, ৪৮৬, ৩২৬, ৫৭১, ৬৪৭, ৬৭৪,৭০৪, ৬৩৫,৫৩৫, ৬০০, ৭০৯													
মুসলমান	১৮	২৮	২৭	৫৪	৩৮	৪৮	৪১	৫১	৫১	৩৬	৪৪	২৮	২৩	৪১
রিয়াং	-	-	-	-	-	-	-১	-	-	১-	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	৮	-	৭	১৭	৪	৭	৮	১০	৪	১১	৬	৬

শিক্ষাবর্ষ ১৩৪২, ১৩৪৩, ১৩৪৪. ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৭,১৩৪৮, ১৩৪৯, ১৩৫০, ১৩৫১, ১৩৫২,১৩৫৩. ১৩৫৪, ১৩৫৫ মোটছাত্রছাত্রী ৪১৮,৫০৮,৫৮৫,৬২৩, ৬১২,৪৯৪, ৭২৭,৮৫৬ ,৯০৩,৯০৭, ৭৫৬, ৬৮২,৭৬১, ৯০৯

এই প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র হলেও সেকালের বিচারে অতি দূরদর্শিতার পরিচায়ক। ১৩৪৭ থেকে ১৩৪৯ পর্যন্ত এই প্রকল্পে শিক্ষা বিভাগের খরচ হয়েছিল ৩০২০+ ৩০০০+ ৩২১৪= ৯২৩৪ টাকা। এই প্রকল্পে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছিল বাঙলীরা। ঠাকরদের মধ্যে সাড়া ফেললেও অন্যান্য উপজাতি লোকদের তেমন আকৃষ্ট করেনি কারণ সম্ভবত তারা রাজধানীতে বসবাস করতনা। উৎসাহিত বীরবিক্রম ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দে এই প্রকল্প সদর বিভাগের হাওড়া নদী উপত্যকা এবং বিভাগীয় নগর সমূহে প্রবর্তন করার বিজ্ঞপ্তি জারী করলেও[৩৩] নানা কারণে তা কার্যকরী হয়েছিল বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

মধ্যস্তরের শিক্ষা ঃ- মধ্যস্তরের শিক্ষার জন্য রাজ্যে স্থাপিত হয়েছিল এম ই বা মাইনর ইংলিশ স্কুল। এসব স্কুলে প্রাথমিক বিভাগ থেকে শুরু করে ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত পঠন পাঠন চলত। বীরবিক্রমের প্রয়ানের পরে ১৩৫৭ ত্রিং সনে (১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দে) রিজেন্ট মাতা মহারানীর ঘোষণায় জানা যায় সে সময়ে রাজ্যে ২৫টি এম ই স্কুল ছিল।[৩৪] কিন্তু ১৩৫৩-১৩৫৫ ত্রিংসনের প্রশাসনিক বিবরণীতে বলা হয়েছে রাজ্যে ১৯৪৬ সাল মোট এম ই স্কুল ছিল ২২ টি। তাহলে নিশ্চয়ই একবছরের মধ্যে আরও তিনটি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল বা ৩টি উচ্চ বাংলা বিদ্যালয় মাইনর স্কুলে উন্নীত হয়েছিল। ১৩৫৩-১৩৫৫ সনের বিবরণী অনুযায়ী ২২টি স্কুলের মধ্যে ৬টি বালিকা বিদ্যালয় এবং বাকী

১৬টি বালকদের জন্য নির্দিষ্ট হলেও বালিকারাও পড়তে পারত। নিম্নের সারণীতে ১৩৫২-১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দ পর্যন্ত ৪বৎসরের চিত্র পাওয়া যেতে পারে।

সারণী

(মধ্যস্তরেরশিক্ষা)[৩৬]

ত্রিংসন	স্কুল বালক	স্কুলবালিকা	মোটস্কুল	পুড়ুয়া বালক	পুড়ুয়াবালিকা	মোট
১৩৫২	১৪	৪	১৮	১৪৫৫	২৮৭	১৭৪২
১৩৫৩	১৪	৫	১৯	১৪৭৪	২২৩	১৬৯৭
১৩৫৪	১৫	৬	২১	১৬৮৭	২৩২	১৯১৯
১৩৫৫	১৫	৬	২২	১৭৭২	৩৫৬	২১২৮

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ছাত্রছাত্রীরা বিনা বেতনেই মাইনর স্কুলে পড়তে পারত। বীরবিক্রমের আমলে ১৩৩৯ ত্রিং সনে (১৯২৯খ্রীঃ) উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ক্লাশ iii থেকে ক্লাশ vi পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেতন নেয়ার প্রচলন করা হয়। অবশ্যই রাজকুমার, ঠাকুর মনিপুরীও পার্বত্যপ্রজাদের বেতন ফ্রি করা হয়। রাজকর্মচারীদের পুত্রাদির জন্য কিছু সুবিধা প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজাদের নিকট থেকে বেশী বেতন আদায় করা হত। নিম্নের সারণীতে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সারণী (মধ্যস্তরের বেতন)[৩৭]

শ্রেণী	রাজকর্মচারী পুত্রাদি ও স্কুল বিশেষে নির্ভরশীল সহোদর ভ্রাতাদের এবং স্থায়ী এ রাজ্যবাসী প্রজা	অন্যান্য বৃটিশ প্রজা
ষষ্ঠ	১টাকা প্রতিমাসে	১টাকা ৮ আনা প্রতিমাসে
পঞ্চম	১টাকা	১,, ৮ ,,
চতুর্থ	বার আনা	১,, ৪ ,,
তৃতীয়	বার আনা	১ ,, ৪ ,,

২০.৩.১৩৪৩ ত্রিংসনে পুনরায় রাজ্যের সমস্ত মধ্য ইংরেজী স্কুলের ক্লাশ তৃতীয় থেকে ক্লাশ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত বেতনের হার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ঐ আদেশ না পাওয়া গেলেও পরবর্তী আদেশ যা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ঘোষণা করা হয় তাতে বেতনের হার পরিস্কার রূপে ধরা যায়।

সারণীতে (মধ্যস্তরের বেতন)[৩৮]

Classes	usual Present rate	Rate Revised rate	Concession Present rate	Rate. Revised rate
V and VI	Re 1-8 annas	Rs.2-2 annas	Re-1	Re 1-10annas
IV	Re 1-4,,	Re 1-10	12 annas	Re 1-2,,
III	Re-14,,	Re 1-8 annas	12,,	Re 1-2,,

আট আনা হিসাবে ভর্তির ফিস নেয়া হত। একবার নাম কাটা গেলে পুনরায় ভর্তির ফিস দিতে হত। ভর্তির ফিস, জরিমানা প্রভৃতি খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রথম ট্রেজারীতে জমা দেবার নির্দেশ দেখা যায়। পরে পোষ্টফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক জমা করতে হত এবং বিভাগীয় মঞ্জুরীতে স্কুলের

উন্নয়নে ব্যয় করা হত। শিক্ষকদের সন্তানদের বিনা বেতনে পড়তে দেয়া হত। অবস্থা অনুযায়ী কাউকে পুরো বিনা বেতনে কাউকে অর্ধবেতনে পড়তে দেয়া হত। পেন্সনারদেরও এ সুবিধা দেওয়া হত। ছাত্রছাত্রীদের কৃষি কাজে উৎসাহ দেবার জন্য স্কুলের নির্দিষ্ট জমিতে কম করে তিনঘন্টা শাক সবজী ফলাবার কাজে নিয়োগ করা হত। ভারতের ভুগোল ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য Minoo Massani লিখিত Our India and Picture of a plan নামক পুস্তক Additional বই রূপে পড়ান হত। এরজন্য রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার জন্য ৬ষ্ঠ ও ৫ম শ্রেণীর দুই প্রার্থীদের ২০ টাকা ও ৫ টাকা নগদ পুরস্কার দেয়া হত।[৩৯] ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় পাশের পর নির্বাচিত ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেত। ১৩৫২-১৩৫৫ ত্রিং সনের মধ্য ইংরেজীস্তরের বৃত্তিপরীক্ষায় উর্ত্তীণ ও বৃত্তিপ্রাপক ছাত্রছাত্রীদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

সারণী (মধ্য ইংরেজীস্তরের বৃত্তি) ৪০

ত্রিংসন	উর্ত্তীণ বালক	উর্ত্তীণ বালিকা	বৃত্তিপ্রাপক বালক	বৃত্তিরহারও বালিকা	ব্যাপ্তিকাল
১৩৫২	২২	১২	১০	৭	মাসিক
১৩৫৩	২২	১২	৭	১০	২-৮টাকা
১৩৫৪	২১	৯	১০	৮	২-৪ বৎসরে
১৩৫৫	২১	৯	৯	১০	জন্য

মধ্যস্তরের শিক্ষা (হাইস্কুল) ঃ-

বীরবিক্রমের রাজত্বকালের শেষদিকে দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৯টি হাইস্কুল ছিল। স্কুলগুলি হচ্ছে উমাকান্ত একাডেমী, বোধজং হাইস্কুল, নবদ্বীপচন্দ্র ইনষ্টিটিউশান, কিরীট বিক্রম ইনষ্টিটিউশান, ব্রজেন্দ্র কিশোর ইনষ্টিটিউশান, রাধাকিশোর ইনষ্টিটিউশান, বীরবিক্রম ইনষ্টিটিউশান, মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় এবং খোয়াই হাইস্কুল। এই ৯টি হাইস্কুলের সঙ্গে ৫ম থেকে অষ্টম শ্রেণীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৬ সালে ঐ সব স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৯৩৭ জন[৪১] নবম ও দশম শ্রেণী পাঠ্যক্রম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছিল। দেখা যাচ্ছে প্রতি স্কুলে গড়ে প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করত। ১৯৪৬ ইং সালে রাজ্যের মোট ১২৩ জন ছাত্রছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসেছিল এবং ৮১ জন ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হয়েছিল।[৪২] হিসাবে ৮টি স্কুলের ফল দেখান হয়েছে, এর মধ্যে বোধজং স্কুলের নাম নেই, সে ক্ষেত্রে খুব সম্ভবত ঐ বছরে ঐ স্কুল থেকে কোন ছাত্র পরীক্ষায় বসেনি।

হিন্দু রাজা বিদ্যাদান করে, বিক্রি করেনা, রাধাকিশোর মাণিক্যের এই নীতির সুবাদে ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্রীদের বেতন দিয়ে পড়তে হত না। কিন্তু ক্ষুদ্র আয় সম্পন্ন একটি পার্বত্য রাজ্যের পক্ষে এই ব্যয়ভার দীর্ঘদিন বহন করতে পারেননি তাঁর বংশধরগণ। পারিপার্শ্বিক চাপ, অর্থনৈতিক দুরবস্থার নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন সময়ে বেতন আদায়ের ঘোষণা করলেও তা সুষ্ঠুভাবে চালু করা হয়নি। অবশেষে বেতনের হার ঘোষণা করলেও তা ব্রিটিশ এলাকার স্কুলগুলির তুলনায় অনেক কম ছিল। এছাড়া পূর্বে উল্লেখিত পার্বত্যজাতি, মণিপুরী

ঠাকুর, রাজকুমার প্রভৃতিদের বালক বালিকাদের বেতন ফ্রি ছিল এবং রাজকর্মচারীদের পুত্রাদি, ভ্রাতাদি শিক্ষকদের পুত্র, কন্যা, পেনশনভোগীদের পুত্রকন্যা অবস্থা বিশেষ কম বেতনে পড়তে পারত। সর্বশেষ ছাত্রছাত্রীদের যে বেতনের কাঠামো পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ-

সারণী (ছাত্র বেতন হাইস্কুল ১.১.৫৬ত্রিং)[৪৩]

শ্রণী	সাধারণহার	বর্দ্ধিত হার	বিশেষ ¯ সুবিধাপ্রাপ্ত হার	
বদ্ধিত				
	বর্তমান		বর্তমান	হার
IX-X	২টা.৪আ	৩টা	১টা.৮আ	২টা.৪
VII-VIII	১টা ১৪ আ	২টা ১০ আঃ	১টা ৪ আ	২টা
V-VI	১টা ৮আ	২টা ২আ	১টা	১টা১০আ

ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উর্ত্তীণ ছাত্রছাত্রীদের রাজসরকার বৃত্তি প্রদান করত। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণাতে কেবলমাত্র উমাকান্ত স্কুলের কথা উল্লেখ ছিল কারণ তখন রাজ্যে আর হাইস্কুল ছিল না এবং ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করা প্রথম ছাত্রকে বীরচন্দ্রবৃত্তি ও একটি জুনিয়র বৃত্তি প্রদান করা হত। ১৯৩১খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণায় দেখা যায় রাজ্যের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারীকে ১২ টাকার একটি বৃত্তি এবং মফঃস্বলের ৪টি হাইস্কুলের প্রত্যেকটির জন্য ৮টাকা একটি বৃত্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। স্থানীয় উমাকান্ত স্কুলের জন্য ১০টাকার একটি বীরচন্দ্র বৃত্তি এবং ৮ টাকার একটি জুনিয়ার বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই আদেশে আরও দেখা যায় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমগ্র হাইস্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এই রাজ্যের কোন ছাত্র প্রথম থেকে দশম স্থানের অধিকারী হলে তাকে মাসিক ২০ টাকার একটি বৃত্তি, রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত হাইস্কুলগুলির মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারীকে ১৫ টাকা একটি বৃত্তি, দ্বিতীয় ও ৩য় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ১০ টাকা ও ৮ টাকার বৃত্তি প্রদানের উল্লেখ রয়েছে।[৪৪] বৃত্তির ব্যাপ্তিকাল দুই বৎসর অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পড়া শেষ পর্যন্ত। কলেজে ভর্ত্তি হয়ে অধ্যক্ষের মাধ্যমে আবেদন করলে বৃত্তি পাওয়া যেত। এছাড়া বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা, খেলাধূলা, ড্রয়িং, কৃষিকাজ প্রভৃতি পরীক্ষার বহির্ভূত বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য আয়োজন ও শিক্ষক নিযুক্ত ছিল। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে মাইনর স্তরে Minoo Massain র পুস্তক পাঠ করে রচনা লেখার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। হাইস্কুলের ক্ষেত্রেও এরূপ সহপাঠক্রমিক বিষয়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের গ্রুপে ভাগ করে (X,IX) A Group,(VIII,VII) B Group) প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা করে Group A এর জন্য ৩০টাকা ও ১০টাকা এবং Group B এর জন্য ২৫টাকা ও ১০টাকার পুরস্কার নির্ধারিত হয়েছিল।

উচ্চশিক্ষা ঃ- আমরা জানি যে রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে রাজ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে নানা চাপে তা বন্ধ করে দিতে হয়। এই ঘটনার ৩৪বৎসর পরে বীরবিক্রম ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যে পুনরায় কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩৭খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে কুসমনটিলাতে যা বর্তমানে কলেজ টিলা নামে পরিচিত, তিনি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[৪৫] এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাপত্তন নির্মাণ সম্বন্ধীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটির হস্তে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার ভার অর্পণ করা হয়। সেখানে অট্টালিকা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় ভবন

তৈরী হতে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সামরিক তৎপরতা এবং অর্থাভাবের জন্য কাজের গতি খুবই শ্লথ হয়ে যায়। সে সময়ে যুদ্ধের প্রয়োজনে কলেজ গৃহ নিগ্রো বাহিনীর দখলে চলে গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে পুনরায় কাজ শুরু হলেও অর্থভাব প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কলেজ নির্মাণ শেষ হবার পূর্বেই ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ বীরবিক্রম লোকান্তরিত হন। মহারানী কাঞ্চন প্রভাদেবী চাকলা রোশনাবাদের রাজস্ব থেকে ১লক্ষ টাকা এনে কলেজ নির্মাণ শেষ করবেন বলে ঘোষণা করেন।[৭৭] অবশেষে নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়ে ১৩৫৭ ত্রিং সনেই কলেজে অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা বীরবিক্রম মহারাজের নামানুসারে নামাকরণ করা হয় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ। ১৯৪৭খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাস থেকে আই এ এবং আই এস সি ক্লাশ শুরু কবা হয়েছিল।

শিক্ষকশিক্ষন ঃ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য শুরু ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল ১৩৩৯ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। কুমিল্লাতে অবস্থিত শুরু ট্রেনিং স্কুলে রাজ্যের শিক্ষকদের পাঠান হত। কতজন শিক্ষক এভাবে ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং কবে পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল তা জানা যাচ্ছেনা। তবে রাজ্যে গুরু ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন কারণ এরূপ একজন শিক্ষকের দেখা আমি পেয়েছি ১৯৫৩-৫৪ সাল বিশালগরে নিকটবর্তী গোলাঘাটি গ্রামে। ১৩৩৯ ত্রিং সনেই স্নাতক শিক্ষকদের ঢাকা ট্রেনিং কলেজে পাঠান শুরু হয়। নয় মাসের জন্য পূর্ণবেতনে শিক্ষকদের পাঠান হত। তারা আর কোন ভাতা পেতেন না। কিন্তু শিক্ষন কলেজে Admission test দেবার কালে পাথেয় (T.A/D.A) ইত্যাদি পেতেন।[৭৮] ১৩৫২ ত্রিপুরাব্দে হাইস্কুল শিক্ষকদের জন্য Special Subject training এর ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজী, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইত্যাদি বিষয়ে এই Special Subject Training দেওয়া হত। যদিও খব কম সংখ্যক শিক্ষকই এ সব বিভিন্ন Training Programme এ সুযোগ পেতেন তবু সেই অল্প সংখ্যক শিক্ষকই শিক্ষার আধুনিকতা ধারার সঙ্গে রাজ্যের যোগাযোগ করাতেন।

শিক্ষায় বিশেষ সুযোগ ঃ রাজ্যের পার্বত্য প্রজা, ঠাকুর লোক, রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এসব ব্যবস্থা পূর্বথেকেই চালু ছিল। বীরবিক্রম এসব প্রকল্প আরও সুদৃঢ় করেন। পার্বত্য প্রজা বলতে " পার্বত্য ত্রিপুরা কুকি, রিয়াং, লুসাই মগ, চাকমা, গারো ইত্যাদি সবশ্রেণীর সর্বপ্রকার এরাজ্যবাসী ছাত্রছাত্রী বুঝাইবে।"[৪২] মণিপুরীগণ ও ঐ বিশেষ সুযোগ লাভ করেছিল। ঠাকুর ও ত্রিপুরীদের জন্য আলাদা হোস্টেল স্থাপন, হোস্টেলে বিনা ব্যয়ে থাকা খাওয়া,প্রাইভেট টিউটরের নিকট পাঠগ্রহণ, বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিপ্রদান, পার্বত্য বৃত্তি প্রদান, পার্বত্য বালক বালিকাদের পুরস্কার পরীক্ষা, ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করলে বিশেষ বৃত্তি প্রদান, বিনা বেতনে অধ্যয়ন, স্পেশাল ষ্ট্রাইপেন্ড, কলেজেও বিনা বেতনে অধ্যয়ন রাজ্যের বাইরের কলেজে বৃত্তি দিয়ে অধ্যয়ন করতে পাঠান, লুসাই পার্বত্য বৃত্তি, সংরক্ষিত পার্বত্য ছাত্রবৃত্তি ইত্যাদি নানারূপ প্রকল্প গ্রহণ করে ও বাস্তবায়িত করে তাদের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশেষ শিক্ষা ঃ- প্রথাগত দেশে প্রচলিত ব্রিটিশ ধাঁচের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা ও পালন করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাতে কলমে কাজ করে জীবিকা অর্জনের বৃত্তির কাজ করার প্রতিষ্ঠান, কয়েদিদের বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি বীরবিক্রমের রাজত্বকালের পূর্বেই শুরু হয়েছিল। তাঁর সময়ে এসব প্রতিষ্ঠান বিশেষ গুরুত্বও পেয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরকারী সাহায্য পুষ্ট হয়েছে। যেমন উডবার্ন আর্টিজান স্কুল যেখানে ১৩৫১ ত্রিং সনে ২৭ জন

শিক্ষার্থী শিক্ষা পেয়েছে বিভিন্ন শিল্পকর্মে। আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারের মধ্যে ১৩৩৯ ত্রিং সনের স্থাপিত হয়েছিল কয়েদি বিদ্যালয়। ওদের মধ্যে অনেকেই প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষাতেও কৃতকার্য হয়েছিল।[৫১] ছাত্র সংখ্যা ১৩৪১ ত্রিং সালে ২০ জন দিয়ে শুরু করে ১৩৫৫ ত্রিং সনে ২১ জন পর্যন্ত স্থির ছিল।১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে স্থানীয় ছাত্রসমিতি আগরতলা নৈশবিদ্যালয় চালু করে। রাজসরকার অর্থ সাহায্য করত। দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি এখানকাব পড়ুয়া ছিল।[৫২] রাজ সরকার টোল চতুষ্পাঠী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে হিন্দুদের সংস্কৃতি রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। বীরবিক্রমের আমলে টোলের সংখ্যা ৩থেকে বেড়ে ৫-এ দাঁড়ালেও ১৩৩৫ ত্রিং সনে আমরা ৪টি টোলের সন্ধান পাই। যাতে মোট ৮৭ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করত।[৫৩] অপরদিকে রাজ্যের মাদ্রাসার সংখ্যা ১৩৩৩ ত্রিংসনের ৬টি থেকে কমে ১৩৫৫ ত্রিং সনে ৫টিতে দাঁড়ায় এবং মোট ১৮৩ জন ছাত্র ১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দে মাদ্রসাতে পাঠ করত।[৫৪] আগরতলাতে বর্তমানে একটি সংস্কৃত কলেজ রয়েছে। ১৩১৩ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯০৩খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রী উমাকান্ত দাসের সাক্ষর সম্বলিত একটি আদেশে আগরতলা সংস্কৃত স্কুলের কথা জানা যায়। বীরবিক্রমের আমলেও ঐ প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাব উহার অগ্রগতি কি পশ্চাদগতি কিছুই বিবৃত করা যাচ্ছে না। বীরবিক্রমের আমলে ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দে Boys scout Association গঠিত হয়। ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে ট্রেনিং ক্যাম্প সংগঠিত করা হয় উমাকান্ত স্কুলে। ১৮জন শিক্ষক ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করেছিল। ১জন স্কাউটার কাব মাস্টার ট্রেনিং কোর্সের বঙ্গদেশের গঙ্গাসাগরে যোগদান করেছিল এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। বীর বিক্রমের আমলেই স্কুলে 'গেইম ফি' আদায় করা চালু হয়। ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের ৩নং সার্কুলারে এই আদেশ দেয়া হয়েছিল।[৫৫] Inter school sports বীরবিক্রমের আমলের শুরু হয়েছিল এবং যথাযথ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৫৬]

শিক্ষায় বেসরকারী উদ্যোগ : ত্রিপুরা রাজসরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণের শম্বুক গতিতে মুগ্ধ হয়ে গভীর পার্বত্য অঞ্চলে কিছু কিছু ব্যক্তি ও সমাজ নিজেরাই বিদ্যালয়ে স্থাপন করে শিক্ষাকর্ম দ্রুত করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। রাজসরকার নিজেদের কাজকর্ম উচ্চস্বরে ঘোষণা করে প্রশাসনিক বিবরণী ব্রি টিশ সরকারের নিকট পাঠালেও এরূপ প্রাইভেট স্কুল স্থাপনের কথা অস্বীকার করতে পারেনি। নিম্নের সারণীতে এরূপ কয়েকটি বিবরণীর বে-সরকারী উদ্যোগের বিবরণ দেয়া হল যা প্রমাণ করবে যে জনশিক্ষা সমিতি গঠন করার পূর্বেই ত্রিপুরাতে বেসরকারী পর্যায়ে স্কুল স্থাপিত হয়েছিল এবং পড়াশোনা চলেছিল।

সারণী (শিক্ষায় সরকারী বনাম বেসরকারী উদ্যোগ)[৫৭]

ত্রিংসন	সরকারী বিদ্যালয়	সরকারীবিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা	সরকারী পাঠশালার গড় ছাত্র সংখ্যা	বেসরকারী বিদ্যালয়েব সংখ্যা	বেসরকাবী বিদ্যালয়েব মোটছাত্র সংখ্যা	বেসরকারী বিদ্যালয়ের গড় ছাত্র সংখ্যা
১৩২৩ (১৯১৩-১৪ইং)	১৪৯	৫৭৫২	৩৮	২৭	৮৮০	৩৩
১৩২৪ (১৯১৪-১৫ইং)	১৫৪	৬৩২১	৪১	৩৭	১০০৪	২৮
১৩২৮ ১৯১৮-১৯ ইং)	১৪০	৫০৬৪	৩৬	২৩	৬১৮	২৭
১৩৩৩						

(১৯২৩ ২৪ইং) ১৩৩৯	১৭১	৫৯৭২	৫৪	১১	৪৫৮	৪২
(১৯২৯-৩০ইং) ১৩৪০	১৭০	৭৪০১	৪৪	১১	২৪১	২২
(১৯৩০-৩০ইং)	১৭৭	৭৫৮৮	৪৩	৪৩	১৩১৮	৩১

আমাদের আলোচনা যদিও বীরবিক্রমের কালের অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে থেকে তবু কালের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পূবোক্ত আর ও তিনটি বৎসরের হিসেব ধরেছি। দেখা যাচ্ছে উদ্বৃত সময়ে পাঠাশালার গড় ছাত্র সংখ্যা উভয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম ছিল। দূর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্রতি পাঠশালায় এরূপ ছাত্রসংখ্যা সেকালের বিচারে অবশ্যই যথেষ্ট বলতে হবে কেননা সরকারী বিদ্যালয়গুলি বৃহৎজন পদের নিকটে সমতল ভূমিতে অবস্থিত ছিল। দূর্গম অঞ্চলে অবস্থিত জনজাতির সর্দার বা কোন অবস্থাপন্ন কৃষকের বাড়ীতে ঐ সব বেসরকারী পাঠশালা বসত। সমতল বঙ্গদেশের ত্রিপুরা,শ্রীহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার স্বল্প শিক্ষিত যুবক শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হত। এসব শিক্ষকদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা দলপতি বা সম্পন্ন কৃষক নিজের বাড়ীতেই করতেন। উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষিত যুবকের অভাবই এ সব বাঙ্গালীদের নিয়োগের প্রধান কারণ হলেও কেউ কেউ শিক্ষাদান কার্য ধর্ম বলে বিবেচনা করে সমতল ভূমি ছেড়ে দূর্গম পাহাড়ে প্রবেশ করত। এই শিক্ষকদের কোন মাসিক বেতন ছিলনা, বেতনের পরিবর্তে জুমজাত চাউল, তিল প্রভৃতি শিক্ষককে দেয়া হত। পরে সরকার বিদ্যালয় গ্রহণ করলে বা সরকারী সাহায্য পেলে কার্যরত শিক্ষক সরকারী শিক্ষক বলে গণ্য হতেন। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৬ টাকা থেকে ৮ টাকা।[৫৮] এভাবে প্রতিবেশী বাঙালী হিন্দু শিক্ষকরাই ত্রিপুরা রাজ্যের গভীর জঙ্গলে শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে রেখেছিল, যা হয়ত দাউ দাউ করে জ্বলতনা কিন্তু একেবারে নিভেও যেতনা। এসব শিক্ষকরা সবাই যে অন্য কাজ না পেয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করাও সঠিক হবে না। অপ্রাসঙ্গিক নিতান্তই ব্যক্তিগত, তবু জানাই লেখকের খুল্ল পিতামহ ব্রহ্মাচারী বনবিহারী সমতলভূমির স্বাচ্ছন্দপূর্ণ গ্রাম্য জীবন পরিত্যাগ করে যুবক বয়সে কাকড়াবনের শিলঘাটিস্থ তৈলবাসী ব্যাপারীর (জমাতিয়া) বাড়ীতে ঐরূপ পাঠশালায় শিক্ষকতা করে সেখান থেকেই সন্ন্যাস ব্রতগ্রহণ করে চিরতরে সনাতন ভারতীয় সমাজে বিলীন হয়েছিলেন। এরূপ কত লোক জঙ্গলে শিক্ষা কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন কেউ তার খবর রাখেন না। এই প্রচেষ্টা চালু ছিল বলেই তারই ফলশ্রুতি হিসেবে বীরবিক্রমের কালে ঐতিহাসিক কারণে জনশিক্ষা সমিতির উদ্ভব হয়েছিল।

কতিপয় শিক্ষিত যুবক, যারা পরবর্তী কালে রাজ্য শাসনের ভারও পেয়েছিলেন,১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দের ১১ই পৌষ (১৯৪৫) খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর) ত্রিপুরা জাতির নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য একটি অরাজনৈতিক সংগঠন জন শিক্ষা সমিতি গঠন করেন।[৫৯] "আমরা জনশিক্ষা সমিতির সদস্যরা এক একটি এলাকা ভাগ করে নিয়ে গ্রামে নিয়ে মিটিং করে ক্রমশঃ গাঁয়ে গঞ্জে স্কুলঘর তৈরী করে মাষ্টার নিযুক্ত করে রাজার দরবারে হাজির হতাম। এ বিষয়ে ঠিক হয়েছিল স্থানীয়জন সাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষক নিযুক্ত করে শিক্ষা বিভাগে প্রার্থনা করলে মহারাজ সেই স্কুলকে সরকারী স্বীকৃতি দেবেন। ...... এসব স্কুলের স্বীকৃতি আদায়ের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ভি.এ.ব্রাউন সাহবের উপস্থিতি খুবই সহায়ক হয়েছিল।" [৬০] জন শিক্ষা সমিতি কর্তৃক স্থাপিত এসব পাঠশালাতে শিক্ষকতা করতেন কারা?" শিক্ষকদের অধিকাংশ ছিলেন বাঙালী হিন্দু, অবশ্য বোর্ডিং থেকে যারা সেভেন

এইট পর্যন্ত পড়ে ফিরে গিয়েছিলেন তাদের সবারই চাকুরী হয়ে গিয়েছিল।[৬১] ১৯৪৫ সালে ও দেখা যাচ্ছে জনশিক্ষা সমিতির ও সম্বল ছিল ঐ সব স্বল্প শিক্ষিত বাঙালী যুবক। এক শ্রেণীর বাঙালী গুরুর (পুরোহিত দীক্ষাগুরু) প্রতি তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেও[৬২] এই দধিচী শ্রেণীর গুরুকুলের প্রতি, যারা যুগ যুগ ধরে ত্রিপুরার অরণ্যে শিক্ষার আলোক শিখা জ্বেলে রেখেছিলেন, কোন রুচিশীল মন্তব্য লক্ষ্য করা যায় না।

জনশিক্ষা সমিতির স্থাপিত পাঠশালার মোট সংখ্যা কত তা নিয়েও যথেষ্ট মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের মতে ৩০০ বেশী বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদন পায়।[৬৩] নীলমনি বাবুর মতে" "আমরা মহারাজের কাছে থেকে ৩৫০টির ও বেশী স্কুলের মঞ্জুরী আদায় করেছিলাম। এই স্কুলগুলি ছিল পাঠাশালা।"[৬৪] জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে ৪৮৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছিল একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০০ এর বেশী বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদন লাভ করে সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।[৬৫] রমেন্দ্র বর্মণ লিখেছে "ফলে দুই তিন বছরের চেষ্টায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৮৪টি এর মধ্যে ৩০০টি বিদ্যালয়ের জন্য সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায় গ্রাম পাহাড়ে বিত্তহীন সাধারণ মানুষ এবং আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন সর্দারদের দান চাঁদা ইত্যাদি সম্বল করে বাকী বিদ্যালয়গুলিতে (১৮৪টি) পঠন পাঠন চলে[৬৬]"।

কিন্তু ১৩৫৫ ত্রিং সনের (১৯৪৬-৪৭ইং) প্রশাসনিক বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের মোট স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে পাঠশালা ৮৬ এল.ভি ৩২,এম ই ২২ এবং হাইস্কুল ৮= ১৪৮ টি।[৬৭] হাইস্কুলে ও এম ই স্কুল বাদ প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮টি। কিন্তু ১৩৫৭ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে মহারানীর ঘোষণা দেখা যায় রাজ্যে পাঠশালা বা প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ২৫০টি। ৬৮ অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে ১৩২টি পাঠশালা সরকারী নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, জনশিক্ষা সমিতি স্থাপিত পাঠশালাগুলির মধ্যে ১৩২ পাঠশালা সরকারী হয়েছিল তাহলেও প্রবক্তাদের ৩০০-র বেশী পাঠশালা কোথায় গেল? অপরদিকে মহারানীর সরকারী বিবরণী কি অসত্য? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জনশিক্ষা সমিতির কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ ছিল মূলতঃ ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে। অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটেনি। সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের প্রায় সকলেই ছিলেন ত্রিপুর সম্প্রদায় ভুক্ত।[৬৯] ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অঞ্চলে ত্রিপুরীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেই এই আন্দোলন জোরদার হয় এবং বেশী সংখ্যায় পাঠাশালা স্থাপিত হয় এবং অন্য অঞ্চলে তার প্রভাব খুব বেশী দেখা যায় না। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে ১৯১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের গরীব মানুষের স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ, নিজেদের শিক্ষিত করার উদ্যোগ, যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল বীরবিক্রমের আমলে সংগঠিত জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন সেই চেতনারই আরও সুষ্ঠু বহিঃপ্রকাশ।

অন্যান্য কাজ : ক) সার্ভে : রাজ্যের Topographical মানচিত্র তৈরী করার জন্য বীরবিক্রম জাতীয় জরিপ বিভাগের ১২ নং পার্টিকে নিয়োগ করেছিলেন। তাদের কাজে বাধা না দিয়ে তাদের সর্ব প্রকার সাহায্য করার জন্য তালুকদার, জোতদার, আভ্ডার সর্দার,পার্বত্য পল্লীর চৌধুরী ও সর্দারদের এবং সব শ্রেণীর কর্মচারীদের ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এক আদেশ দিয়েছিলেন।[৭০] মহারাজের আদেশ অনুযায়ী সার্ভে কর্মসমাপ্ত হয়েছিল।

খ) রেলপথ স্থাপন : বীরবিক্রম রাজ্যের অভ্যান্তরে লাইট রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন

এবং ঐ রেলপথ যেসব স্থানে মধ্য দিয়ে যাবে বলে স্থির হয়েছিল তার জন্য তদন্ত ও জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য মার্টি ন এন্ড কোম্পানীকে নিয়োগ করেছিলেন। ১৩৩৯ ত্রিং সনের ৩রা আশ্বিনের ঘোষণায় দেখা যায়-"যেহেতু শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কমলাসাগর হইতে উদয়পুর ও কমলাসাগর হইতে বীরেন্দ্রনগর পর্যন্ত লাইট রেলওয়ে খুলিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ওই প্রস্তাবিত রেল রাস্তার লাইন নির্ণয় নিমিত্ত তদন্তাদি ও জরিপ কার্য পরিচানার জন্য মার্টিন এন্ড কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারগণ নিয়োজিত হইয়াছেন।[৭০] যদিও এ ব্যাপারে তালুকদার, জোতদার প্রভৃতিদের সহায়তা করতে আদেশে বলা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে এব্যাপারে কোন কাজ হয়নি এবং তাঁর আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে রেলপথ প্রবেশ করেনি।

গ) ভতত্ব বিভাগ গঠন ঃ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর বীরবিক্রম নূতন বিভাগ (ভূতত্ব) গঠন করেন। এই বিভাগ রাজমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে কাজ করার জন্য ড. ডি সি নাগ মহাশয়কে Advisor রূপে নিয়োগ করেন।[৭২] ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর ভূতত্ত্ব বিভাগ মহারাজের আদেশ ক্রমে বার্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (স্কটল্যান্ড) কে তিন বৎসরের জন্য নিম্নোক্ত ২৫০বর্গমাইল এলাকায় তৈলানুসন্ধানের জন্য লাইসেন্স প্রদান করে। স্থান সমূহ হচ্ছে গজালিয়া ২২বর্গমাইল, বড়মুড়া ৬৮.৮ বর্গমাইল, তুলামুড়া ১৭.২ বর্গমাইল, বাতাচিয়া ৮৩.৮ বর্গমাইল, রোকিয়া ১৬.৮ বর্গমাইল এবং তিচনা ৪১.২ বর্গমাইল এলাকা।[৭৩] ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ লাইসেন্স পুর্ননবীকরণ করা হয়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, বর্তমানে ঐ সব এলাকাতেই প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের কাজ চলছে। কিন্তু রাজ আমলে কাজ কতখানি এগিয়েছিল তা জানা যাচ্ছে না। আসাম তৈল কোম্পানীর নিমন্ত্রণে ১৫ই আগস্ট ১৯৩৮ খ্রীষ্টব্দে মহারাজা বীরবিক্রম ডিগবয়ে গিয়ে তৈল উত্তোলন কাজ পরিদর্শনও করেছিলেন।[৭৪]

ঘ) বিমানবন্দর নির্মাণ ঃ ত্রিপুরা স্থলভাগ বেষ্টিত রাজ্য। সে সময়ে অন্য রাজ্যে যাবার জন্য উপযুক্ত রাস্তা ছিলনা। দূরদর্শী বীরবিক্রম রাজ্যের অবস্থানের বিষয় বিবেচনা করে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ, দিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন সিঙ্গারবিলে আগরতলা বিমান বন্দর নির্মাণ করার জন্য। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের সুবিধা হবে বিবেচনা করে বিমান বন্দর তৈরী করতে রাজী হয় এবং দ্রুত বিমান বন্দর তৈরী হয়। প্রথম দিকে রাজসরকার প্রতি বিমান নামার জন্য ১০ টাকা হারে কর আদায় করত[৭৫]। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর বিমান বন্দর সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়-"In execercise power conferred by the rules 8 of the defence of India Act as adopted by the Goverment of Tripura.His Highness the Maharaja Manikya Bahadur, Ruler of Tripura state is pleased to declare the Narayanpur (Agartala) Aerodrome to be protected area,,"[৭৬] যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হত বলে বিমান বন্দর শত্রুপক্ষের আক্রমণের লক্ষ্য হয় এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর জাপানী বাহিনী সিঙ্গারবিলে বোমাবর্ষণ করে।[৭৭] বীরবিক্রমের দূরদর্শিতা পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয়েছে। যখন পূর্ব পাকিস্তান সরকার আখাউড়া বর্ডার বন্ধ করে দেয় তখন লবন থেকে শুরু করে অন্যান্য দৈনিক ব্যবহৃত সামগ্রী কলকাতা থেকে বিমান যোগে আগরতলায় আনা হত। পরবর্তীকালে আসাম আগরতলা সড়ক তৈরী হয়ে গেলে ঐরূপ বিপর্যয়ের অবসান ঘটে।

ঙ। বন্যজন্তু ও বনভূমি সংরক্ষণ ঃ ত্রিপুরা রাজ্যের বনভূমি ও বন্যজন্তু সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়

বীরবিক্রম উপলব্ধি করেছিলেন। ত্রিপুরা আদিবাসী প্রজাদের জন্য ভূমি সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বন সংরক্ষণের জন্য ও নতুন বন সৃজনের জন্য বীরবিক্রম বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক নিযক্ত করেন।[১৬] বনাজন্তু সংরক্ষণ করার জন্য বাঘ, ভাল্লুক, বন্যমেষ, সর্বপ্রকার হরিণ শিকার ও হত্যা নিষিদ্ধ করা হয় ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দের ১১ই বৈশাখের এক আদেশ দ্বারা।[১৭] অবশ্য ইতিপূর্বে গন্ডার ও হাতী শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বিশেষ করে Homing পারাবতদের রক্ষা করার জন্য ১৩৫৩ ত্রিং সালে সমস্ত প্রকার পারাবত শিকার নিষিদ্ধ করা হয়।[১৮] আমরা জানি বীরবিক্রম শিকার প্রিয় ছিলেন। বঙ্গদেশের সুন্দরবনে শিকারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং সেজন্যই নিজ রাজ্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকারী জীবজন্তু বিনাশ রোধে তাঁর উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য।

—ঃ তথ্যনির্দেশ ঃ—

১। দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী পূ উ. পৃঃ২৯৯

২। মেনন কে ডি. ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার পূ.উ.পৃ ঃ২০০

৩। Bulletin to Tea statisties, Govt of Tripura 1966, P.3

৪। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন পূ.উ.পঃ ৩৩৬।

৫। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় রাজগী পূ.উ.পৃ ঃ ৩১৪ ও৩২৪

৬। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন গেজেট সংকলন পূ.উ.পৃ ঃ১৬৭

৭। ঐ ঃ ঐ পৃঃ ২২৭

৮। মেনন কে ডি. ঃ ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিট গেজেটিয়ার পূ.উ.পৃঃ ১৬০

৯। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন, পূ.উ.পৃঃ ৪৩৬, ৪৩৯

১০। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ ত্রিপুরার ইতিহাস পূ.উ.পৃঃ১৯৭-১৯৮

১১। T S A R :1930, p.20 and T S A R 1943-1946, p .120

১২। T S A R :1943-46, P.127

১৩। T S A R :1943-46, P.139

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন পূ.উ.পৃ ঃ ৬৯।

১৫। ঐ ঃ ঐ, পৃঃ ১৮৭।

১৬। ঐ ঃ ঐ, পৃঃ ১৮৮।

১৭। ঐ ঃ ঐ, পৃঃ ২২১।

১৮। ঐ ঃ ঐ, পৃঃ ২২৬।

১৯। ঐ : ঐ, পৃঃ ২৩৫।

২০। ঐ : ঐ, সম্পাদকীয় পৃঃ ১৫-১৬।

২১ Tripura Administation Report 1943, Art 256 257,258, P 69

২২। Ibid Art 253

২২। Ibid Art 253

২৪। Ibid Art 250 P 68

২৫। Ibid Art 250 p 68

২৬ বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন : গেজেট সংকলন, পূ উ ২০২,

২৭। তদেব : ঐ পৃঃ ২১০

২৮। তদেব : ঐ পৃঃ ২১১

২৯। তদেব : ঐ পৃঃ ২৯১

৩০ Chakraborty Mahadeb (Edited) Tripura Administration Report vol IV P P 2133-2139 T S A R (1353-1355 TE) Art 258, 259, 260 261 262

৩১। বন্দ্যোপাধ্যায সুপ্রসন্ন : গেজেট সংকলন , পৃঃ ১৪৩,২০৩

৩২। Chakraborty Mahadev OPcit vol IV PP 1607-1612 1691-1697,1779, 1784 1864-1869,1954-1960, 2060-2066,2133-2139 Administration Report 1353-1355, Art 267 p 71

৩৩। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায : বাজগী, পূ উ পৃ ৩৪৭

৩৪। বন্দ্যোপাধ্যায সুপ্রসন্ন গেজেট সংকলন, পূ উ পৃ : সম্পাদকীয় ১৫।

৩৫। T S A R 1353-1355, Art 256, p 69

৩৬। T S A R 1353-1355 P 69

৩৭। T S A R 1353-1355 P 210

৩৮। T S A R 1353-1355 P 226,227

৩৯। T S A R 1353-1355 Art 259-262

৪০। T S A R 1353-1355 Art 259-262

৪১। T S A R 1943-46 Art P 25

৪২। TSAR : 1943-46. Art P. 253

৪৩। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ২২৬

৪৪। তদেব ঃ পৃঃ ২০৫

৪৫। তদেব ঃ পৃঃ ২১৩

৪৬। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ ত্রিপুরাব ইতিহাস আগরতলা, ২০০০, পৃ ঃ ১৮৫

৪৭। তদেব ঃ পৃ ঃ ২০২

৪৮। ৯ইং কার্ত্তিক ১৩৪০ ত্রিং সনের ১৮৫১-৫৭ নং সার্কুলার।

৪৯। বন্দ্র্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ২৪২

৫০। গোস্বামী ডি.এন ঃ রাজগী ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রকাশিতব্য, দ্রষ্টব্য বিশেষ বিবরণের জন্য। এক্ষেত্রে অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র বৃত্তিগুলির নাম দেওয়া হল।

৫১) টি এস এ আর ঃ ১৩৩৩-১৩৫০ ত্রিং থেকে সংগৃহীত।

৫২। টি এস এ আর ঃ ১৩৪১-১৩৪২ ত্রিং দ্রষ্ট্রব্য

৫৩। টি এস এ আর ঃ ১৩৫৩-১৩৫৫ ত্রিং ,,

৫৪। টি এস এ আর ঃ ১৩৩৩-১৩৫৫ ত্রিং থেকে সংকলিত।

৫৫। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন ঃ পৃ ২৩২-৩৩।

৫৬। তদেব ঃ গেজেট সংকলন , পৃ ৬৮

৫৭। টি এস এ আর ঃ১৩২৩,১৩২৪,১৩২৮,১৩৩৩,১৩৩৯ এবং ১৩৪০T.E.PP 89,156 31 respectively

৫৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ১৯১,

৫৯। কুমুদকুন্ডু চৌধুরী ও শুভব্রতদেব ঃ পটভূমির আন্দোলন এবং জনশিক্ষা সমিতি সংগঠন ও সমসাময়িকদের মূল্যায়ন,আগরতলা, ১৯৯৬ পৃঃ ৬৩ জন শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে কিছু কথা সরোজ চন্দ)

৬৯। তদেব ঃ নীলমনি দেববর্মা (জনশিক্ষা আন্দোলন ভ্রূন থেকে বনস্পতি পৃ ঃ৪৫)

৬০। তদেব ঃ তদেব পৃ ঃ ৪৬

৬২। তদেব ঃ তদেব পৃ ঃ৪২

৬৩। তদেব ঃ রবীন্দ্রসেনগুপ্ত (ত্রিপুরা জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে) পৃ ঃ ৫৮

৬৪। তদেব ঃ উপরে উল্লিখিত (নীলমনি দেববর্মা), পৃঃ৪৬

৬৫। তদেব ঃ সরোজ চন্দ, উপরে উল্লিখিত পৃঃ৬৫

৬৬। তদেব ঃ উপরে উল্লিখিত, রমেন্দ্র বর্মণ ঃ জনশিক্ষা আন্দোলন চেতনার অধিকার বিস্তার প্রসঙ্গ, পৃ ৭২

৬৭। টি এস এ আর ঃ ১৯৪৩-১৯৪৬ Art ২৫১,২৫৬,২৫৭ এবং ২৫৮।

৬৮। বন্দ্যোপাধ্যায় সু প্রসন্ন ঃ ত্রিপুরা গেজেট সংকলন, পৃ ঃভূমিকা ১৫।

৬৯। কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী ও শুভব্রত দেব ঃ উপরে উল্লিখিত (সরোজ চন্দ ঃ জনশিক্ষা আন্দোলন নিয়ে কিছু কথা) পৃঃ৬৩।

৭০। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন, পৃ.উ, পৃঃ২৫৫।

৭১। তদেব ঃ ঐ পৃষ্ঠা ২৫৪।

৭২। তদেব ঃ ঐ পৃষ্ঠা ২৬৮।

৭৩। তদেব ঃ ঐ পৃষ্ঠা ৩৮৯।

৭৪। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ পৃ.উ.পৃঃ১৮৭।

৭৫। Sen Tripur chandra Tripura in transition, Agartala,1970 P.4

৭৬। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন পৃঃ ১৬৬।

৭৭। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ পৃ.উ.পৃঃ ১৯৭

৭৮। দত্ত ও বন্দ্যোপ্যাধ্যায় ঃ রাজগী, পৃ.উ.পৃঃ ৩১৬

৭৯। তদেব ঃ ঐ, পৃঃ ৩১৫

৮০। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ৪০৮।

বীরবিক্রম ঃ আদিবাসী সুহৃদ

ত্রিপুরার রাজাগণ নিজেদের পুরাণখ্যাত রাজা যযাতির বংশধর ঘোষণা করে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে দাবী করতেন। প্রকৃত পক্ষে নৃতত্ত্ববিদগণ, ঐতিহাসিকগণ তাঁদের ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত জনজাতি রূপে আধুনিককালে চিহ্নিত করলেও তাঁরা নিজেদের বিশ্বাসে অটল ছিলেন। মধ্যযুগে ঐতিহাসিককালে তাঁদের বিবাহাদি নিজেদের রাজ্যের ত্রিপুরী কন্যাদের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ রূপে বলা যেতে পারে যে সে সময়ে আর্যাবর্তের ক্ষত্রিয় সমাজের অস্বীকৃতি, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে অভিলাস থাকলেও তা পুরণ করা সম্ভব হয়নি। সমগ্র পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় প্রচারকারীদের দ্বারা ভারতীয়করণের ফলে কোচবিহার, আসাম, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, মণিপুর ও ত্রিপুরাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ঘটে এবং প্রচারকারীরা কোচরাজাদের শিবসম্ভূত, অসম রাজদের ইন্দ্রবংশজ, মণিপুরের রাজাদের অর্জুন বংশজ, কাছাড়ের রাজাদের ভীমবংশজ এবং ত্রিপুরার রাজাদের যযাতি পুত্র দ্রুহ্যুর বংশধর বলে দ্রুত প্রচারে সাফল্য লাভ করে ভারতীয়করণ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বীরবিক্রম মাণিক্য অবধি সরকারী ঘোষণা, রোবকারী ইত্যাদিতে রাজধানী হস্তিনাপুরী সাকিন উদয়পুর বা আগরতলা বলে উল্লেখ দেখা যায়। তাম্র পট্টসনন্দ বা মন্দিরের দেয়াল লিপিতেও ঐ ধারা অব্যাহত ছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চাপে যে Administration Report প্রতি বছর বের করতে হত এবং ব্রিটিশ সরকারে জমা দেয়া হত সেই রিপোর্টেও প্রথম পৃষ্ঠাতেই নিজেদের বিবরণে চন্দ্রবংশজাত বলে উল্লেখ থাকত। ত্রিপুরাতে ভারতীয়করণ বা ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেই চতুর্দ্দশ শতকের শেষভাগে সম্পন্ন হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। তাই মহামাণিক্য থেকে পরবর্তী ত্রিপুর রাজাগণের দলিল দস্তাবেজে ঐ দাবীর উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এসব নব্যক্ষত্রিয়গণ বিবাহাদির ব্যাপারে উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয়ের ঘরে তখনও প্রবেশ করতে পারেননি। ক্রমে আসাম, মণিপুর, কাছাড়, ত্রিপুরা প্রভৃতি নব্য ক্ষত্রিয় রাজন্যকুল নিজেদের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান করে নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রচার ও বিকাশ করতে শুরু করে। ত্রিপুরার রাজপুত্রদের সঙ্গে আসামের রাজকন্যা রত্নমালা বিবাহ বা মণিপুর রাজকন্যা হরিশেশ্বরীর সঙ্গে দ্বিতীয় রাজধর মাণিক্যের বিবাহ উপরোক্ত অনুমানের সাক্ষ্য। তারপর থেকে রাধাকিশোর মাণিক্য পর্যন্ত প্রধানা মহিষী মণিপুরী ক্ষত্রানী। রবীন্দ্রনাথের

সখ্যতার ফলশ্রুতিরূপে ত্রিপুরা বঙ্গীয় সুধী সমাজের ও বঙ্গের বাইরেও খ্যাতি লাভ করে। পরিচিতির প্রসারের ফলে রাধাকিশোর বীরেন্দ্র কিশোরের বিবাহ নেপালী ক্ষত্রিয় পদ্মজঙ্গ বাহাদুরের কন্যা প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে ঘটাতে সক্ষম হন। প্রভাবতী মহাদেবীই প্রথম উত্তর ভারতীয় প্রতিষ্ঠিতা ক্ষত্রানী যিনি ত্রিপুরার পট্টরানী হয়েছিলেন। বীরেন্দ্র কিশোরের পুত্র বীরবিক্রম কিশোরও সেই ধারা অব্যাহত রেখে বলরামপুর ও পান্নার ক্ষত্রানীদের ত্রিপুরার পাটরানী করেছিলেন।

ত্রিপুর রাজবংশ ও সাধারণ ত্রিপুরা বা তিপরা একই বংশজাত কিনা বা একই গোষ্ঠীভুক্ত কিনা তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বস্তুতঃ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্বে সাধারণ তিপরাদের পদবী 'দেববর্মা' ছিল কিনা তা আজও গবেষণা সাপেক্ষ বিষয। সম্ভবতঃ ছিল না কারণ থাকলে বীরচন্দ্রেব ভ্রাতুষ্পুত্র মহামান্যবর নবদ্বীপচন্দ্র ত্রিপুরা রাজ্যেব আদিম ঠাকুর লোকদের (পরবর্তীকালে নজর দিয়ে পাওয়া ঠাকুর লোকরা নন) ইতিহাস ব্যক্ত করলেও সাধারণ ত্রিপুরী বা তিপরাদের সম্পর্কে কিছুই বলেননি।[১]

বীরচন্দ্র মাণিক্য নিজেব ক্ষত্রিয়ত্ব ও ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা বাড়াবার প্রয়াসে জাতি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। সাধারণ তিপরাদের পৈতা ধারণ করিয়ে, বৈদিকমতে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর সংস্কারাদি পালন করতে বাধ্য কবিয়ে, খাদ্যগ্রহণে বিধি নিষেধ আরোপ করে, অবাধ্য রাজ কর্মচারীদের কর্মচ্যুত করে, বিক্রমপুরীয় কতিপয় লোভী ব্রাহ্মণদের উচ্চ হারে অর্থ প্রদান করে নব্য তিপরা ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে চৌদ্দ দেবতাব বাড়ীতে একত্রে ভোজন পানের সূচনা করে এই জলচল বা জাতি আন্দোলনের সূচনা কবেছিলেন।[২] সাধারণ তিপরাদের পৈতাধারণ করিয়ে এই আন্দোলনেব সূচনা করেছিলেন বলে ধারনা জন্মায় এই কারণে যে সাধারণ তিপরা পূর্বে পৈতা ধাবণ কবত না, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা চালু ছিল না, সেজন্য ক্ষত্রিয়ের পদবী বর্মণ বা দেববর্মণ লেখার বা বলার প্রযোজনীয়তাও ছিল না। বহু অর্থ নষ্ট করে, নানারূপ বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে, অর্থনৈতিক অসুবিধা ভোগ করে এবং সর্বশেষে করপ্রদানকারী ব্রিটিশ জেলা ত্রিপুরার তথা পূর্ববঙ্গীয় জাতিবাদীদের বাধা পেয়ে ঐ আন্দোলনের প্রবল স্রোত স্তিমিত হলেও খুবই ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। স্বাভাবিক কারণেই পববর্তী শাসক বাধাকিশোর বা বীরেন্দ্র কিশোর ঐ আন্দোলন নিয়ে হৈ-চৈ না করেও শিক্ষার প্রসারণ, ঠাকুর লোকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও পার্বত্য প্রজাদের নানা সুযোগের ব্যবস্থা করে বীরচন্দ্রকৃত আন্দোলনের ভিত শক্তিশালী করেন। রাধাকিশোরের ঠাকুর বোর্ডিং স্থাপন, তাঁদের অবৈতনিক শিক্ষাদান, বোর্ডিং-এ বিশেষ কোচিং শিক্ষক নিয়োগ, বৃত্তি প্রদান, ত্রিপুরা হোস্টেল স্থাপন, শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মে নিয়োগ আমাদের অনুমানের সাক্ষ্য। বীরবিক্রমের রাজত্বের সূচনাতে উপরোক্ত দুই পরুষের কৃতকর্মের ফল হাতেনাতে পেয়েছিলেন কেননা ইতিমধ্যে একদল উচ্চশিক্ষিত ঠাকুরবাহিনী, খুব উচ্চশিক্ষিত না হলেও শিক্ষিত ত্রিপুরী পেয়েছিলেন যাদের সাহায্যে তিনি প্রশাসন উত্তম রূপে চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরদের ও অন্যান্য পার্বত্য প্রজাদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যাতে তাদের উন্নতি হয় কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষত্রিয় সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।

ঠাকুর লোক ঃ- ঠাকুর লোক বলতে কাদের বুঝায় মহামান্যবর নবদ্বীপচন্দ্র তাঁর রচিত 'আবর্জনার ঝুড়িতে' বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।[৩] তাঁর বক্তব্যের সার মর্ম ঠাকুরগণ ত্রিপুর-রাজদের Kinsmen,

ত্রিপুরা সাম্রাজ্য গঠনের পথে নানা যুদ্ধ বিগ্রহে তারা ত্রিপুরদের সঙ্গী ছিলেন কিন্তু ঠাকুরগণ যে ত্রিপুরা রাজ্যের অতি প্রাচীন অধিবাসী একথা একবারও বলেননি। তাঁর বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় ঠাকুরগণ ত্রিপুরদের, তিপরা নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাদের বংশধর। বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে ক্ষমতা দখলের আইনী লড়াইতে ঠাকুর লোকগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিলেন এবং অবশেষে বীরচন্দ্রের সমর্থনকারীগণ জয়লাভ করেছিলেন। ফলে ঠাকুরগণ বংশানুক্রমিক কিছু কিছু অধিকারী বলে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। রাধাকিশোর ও বীরেন্দ্র কিশোর ঠাকুরদের জন্য বিশেষ সুবিধার বন্দোবস্ত করেছিলেন উল্লেখ করেছি। এমতাবস্থায় বীরেন্দ্র কিশোরের মৃত্যুর পরে বীরবিক্রমের নাবালক কালে ১৯২৪ খ্রীঃ বীরবিক্রম যে ঠাকুর agitation এর উল্লেখ করেছেন।[৩] তার কারণ ও বিবরণ সমকালীন দলিল দস্তাবেজে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন আন্দোলন বা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল সত্যিই, তা না হলে বীরবিক্রম চিন্তিত হয়ে কেন বড়ঠাকুরকে পত্র লিখবেন ? অথচ আমরা দেখছি বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের রাজত্বের শেষবর্ষে অর্থাৎ ১৩৩৩ ত্রিং সনে রাজ্যে পাঠরত ঠাকুর ছাত্রসংখ্যা ১৩৮, ঠাকুর বোর্ডিং এর ছাত্র সংখ্যা ৩৫ এবং তাদের জন্য মোট ব্যয় হয়েছিল ৮৪৭৮ টাকা[৪]। বীরবিক্রম ক্ষমতায় এসে উপরোক্ত সমস্ত সুযোগ সুবিধাদি বজায় রেখে ঠাকুরবর্গের সামাজিক সাংসারিক ইত্যাদি ব্যাপারে উন্নতি দ্রুততর করার জন্য তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্য ৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রীঃ 'ঠাকুর সমিতি' পুনর্গঠন করেন। "যেহেতু এ রাজ্যবাসী ঠাকুরবর্গের সামাজিক, সাংসারিক, পারিবারিক এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় আবশ্যকানুযায়ী আলোচনা এবং প্রস্তাব ও মন্তব্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ঠাকুর সমিতি পুনর্গঠিত হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ হল যে এই আদেশ প্রচারের তারিখ হইতে 'ঠাকুর সমিতি' পুনর্গঠিত হইবে। .... যদি সমগ্র ঠাকুরবর্গকে জ্ঞাপনকরনোপযোগী কোন বিষয় সভায় উপস্থিত হয়, তবে সমিতি এপক্ষের আদেশ গ্রহণ পূর্বক প্রত্যেক ঠাকুর পরিবারকে সভায় স্বীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য আহ্বান করিবে।"[৬] এই ঘোষণায় বোঝা যায় পূর্বেও ঠাকুর সমিতি ছিল, কিন্তু কবে গঠিত হয়েছিল তার সাক্ষ্য আমাদের হাতে নেই এবং ঐ সমিতি অকার্যকরী হবার ফলেই পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। ঠাকুরগণ রাজ সরকারের নিকট হতে ভাতা পেতেন এবং তাদের পুত্র কন্যাদের পূর্বের মত বিনা বেতনে অধ্যয়ন, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি চালু ছিল। ১৩৫৫ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রশাসনিক বিবরণী অনুযায়ী রাজ্যের স্কুলে পড়ুয়া ঠাকুর ছাত্র সংখ্যা ২৮৩জন, বোর্ডিং-এ অবস্থানকারী ১৮জন, রাজ্যের বাইরে স্কুল কলেজে পাঠরত ঠাকুর ছাত্রসংখ্যা ১৩জন ছিল।[৭] রাজ্যের বিখ্যাত আইনজীবি প্রয়াত সাংসদ বীরচন্দ্র দেববর্মা সে সময়ে ঢাকা আইন কলেজে অধ্যায়ন করতেন।

রাজপরিবার ও ঠাকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ, উপনয়ন, মৃত্যু ইত্যাদি উপলক্ষে আচরিত কিছু প্রথার নিয়মাদি ধার্য করার সম্বন্ধে বীরবিক্রম ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিটি গঠন করেন। "খান্দানের নিয়মানুসারে বিশেষ আদেশ গ্রহণে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ও কুমার বাহাদুরগণের ও ঠাকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনয়ন, বিবাহ, মৃত্যু হইলে শ্রীশ্রী যুত সরকার হইতে মিশিলের নিমিত্ত হস্তী, ঘোড়া, হাওয়াদাদি, সিপাহী, চোপদার, প্রভৃতি চান্দোয়ানাদি দেওয়ার প্রথা আছে এবং রাজ পরিবারের মধ্যে শ্রীল শ্রীযুক্ত ও কুমার শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে স্থায়ী আদেশ প্রচার হওয়া প্রয়োজনবোধে তৎকল্পে প্রচলিত

প্রথা ইত্যাদি অনুসন্ধান ক্রমে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা একটি কমিটি গঠিত হইবে। ইহারা অদ্য হইতে ৭দিনের মধ্যে উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এবং দরবার স্থলে কোন ব্লক ভুক্ত হইবে ইত্যাদি বিষয়ে আবশ্যকীয় অনুসন্ধান ক্রমে যে সকল প্রথা প্রচলিত আছে এবং যাহা হওয়া সুসঙ্গত মনে করেন তদবিষয়ে রিপোর্ট করিবেন।"[৮] উক্ত কমিটিতে মহামান্যবর ব্রজেন্দ্র কিশোর, মেজর কুমার দীনমোহন দেববর্মা, কাপ্তেন কুমার প্রফুল্ল কুমার দেববর্মা, কুমার বিপিন বিহারী দেববর্মা, ঠাকুর ভগবান চন্দ্র দেববর্মা, ঠাকুর হরচন্দ্র দেববর্মা ও দেওয়ান কমলা প্রসাদ দত্ত ছিলেন। ৪জন রাজবংশীয় এবং দু'জন ঠাকুর বংশীয়দের নিয়ে গঠিত এই কমিটি স্পষ্টই ঘোষণা করে যে ঠাকুরদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের ঐসব আচার আচরণ সম্পর্কে কিছু মিল ছিল এবং উভয়ে ঐসব অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারতেন। কিন্তু তিপরা বা ত্রিপুর ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে তাঁদের। ঐরূপ সম্বন্ধ ছিল কিনা জানা যায় না। সম্ভবতঃ ছিল না, কারণ তাহলে তাদের আবার নতুন করে ক্ষত্রিয় করতে হত না।

বীরবিক্রম ঠ্যাকুরদের এভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়ে এবং রাজবংশীয়দের সঙ্গে সমগোত্রীয় আচরণ করিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি ঠাকুরদের সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে তাঁর ঘোষিত ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ থেকে কিছু বাছাই করা ব্যক্তিকে প্রতি বছর কিঞ্চিৎ নজবাণার পরিবর্তে ঠাকুর বলে ঘোষণা করতেন। যেমন ১৩৩৭ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টেট গেজেটের ষড়বিংশ ভাগের পঞ্চদশ সংখ্যা অগ্রহায়ণের প্রথম পক্ষে বিজ্ঞাপিত ঠাকুর উপাধির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে—"শ্রীশ্রী যুত মাণিক্য বাহাদুরের আদেশে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ঠাকুর লকব পাইয়াছেন।"[৯] শ্রীযুক্ত কাঁলাচাদ দেববর্মা, শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র কবরা, শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমান কবরা, শ্রীযুক্ত বিশ্বরায় কবরা এবং শ্রীযুক্ত পসারিয়া কবরা।" এরূপ লকব প্রতি বৎসব প্রদত্ত হয়ে থাকলে ঠাকুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল নিশ্চয়ই। তবে লকবপ্রাপ্ত ঠাকুরদের সঙ্গে জন্মগত ঠাকুরদের সামাজিক বা পারিবারিক লেনদেন ছিল কিনা তা জানা যাচ্ছে না।

ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ ঃ ত্রিপুর ক্ষত্রিয়রূপে পুরাতন ত্রিপুরা, দেশী ত্রিপুরা (লস্কর শ্রেণী সংসৃষ্ট), নোয়াতিয়া, জমাতিয়া এবং রিয়াংদের নাম পাওয়া যায় ১৩৫০ ত্রিং সনের (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ) মাঘ মাসের প্রথম পক্ষের মুদ্রিত ১০নং সার্কুলারে।[১০] কিন্তু কবে ঐ পার্বত্য জাতিদের ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ? ১৩১০ ত্রিং (১৯০১খ্রীঃ) জনগণনায় বলা হয়েছে "এ রাজ্যের রাজপরিবার এবং ঠাকুর লোক ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুত।"[১১] ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে — "ত্রিপুরাগণ এ রাজ্যের আদিম অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে পুরাণ ত্রিপুরা, দেশী ত্রিপুরা, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া এবং রিয়াং নামক পাঁচটি সম্প্রদায় বা শ্রেণী আছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহ এবং আহারাদির প্রচলন নাই, কিন্তু এরূপ আহারের দ্বারা কাহারও জাতিনাশ হয় না।"[১২] তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৩১০ ত্রিপুরাব্দ বা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চ ত্রিপুরী সম্প্রদায়কে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করা হত না। ঠাকুরদের কিন্তু ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঠাকুরগণ যে ত্রিপুরদের Kinsman তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি নবদ্বীপ চন্দ্রের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে।

১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) জনগণনাতে রাজকীয় নির্দেশে দেখা যায় পুরাতন ত্রিপুরা, দেশী ত্রিপুরা (লস্কর শ্রেণী সংসৃষ্ট), নোয়াতিয়া, জমাতিয়া ও রিয়াংদের ত্রিপুর ক্ষত্রিয়

বলে নথিভুক্ত করার আদেশ দেয়া হয়েছে — "ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য প্রজাগণের জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে সেন্সাস উপলক্ষে পরিষ্কার বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রী শ্রীযুত মাণিক্য বাহাদুর অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এ রাজ্যে ত্রিপুরা সম্প্রদায় বলিতে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীকে বুঝাইয়া থাকে। (১) পুরাতন ত্রিপুরা (২) দেশী ত্রিপুরা (লস্কর শ্রেণী সংসৃষ্ট), (৩) নোয়াতিয়া, (৪) জমাতিয়া (৫) রিয়াং। বর্তমান বর্ষের সেন্সাস উপলক্ষে ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়েব লোকসংখ্যা, ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। ত্রিপুরা শ্রেণীর সকলকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। ইতি সন ১৩৪০ ত্রিং তারিখ ১৫ই অগ্রহায়ণ।"[১৩] এখানে লক্ষণীয় পার্বত্য ত্রিপুরী শ্রেণীর লোকদের ক্ষত্রিয় বলে নির্দেশ করাব আদেশ রাজা দিয়েছেন, তারা নিজেরাও কোন দিন নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেছেন এরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ১৯০১ খৃঃ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন এক সময়ে উপরোক্ত পাঁচ সম্প্রদায়কে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মধ্য অন্তর্ভুক্ত করেন ত্রিপুরা রাজ ও ঠাকুরলোক প্রভৃতি পুরাতন ক্ষত্রিয়গণ।

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ২৮শে বৈশাখ তারিখে এক ঘোষণায় বীরবিক্রম ত্রিপুর ক্ষত্রিয়দের সামাজিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। —"যেহেতু ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের আচার, ব্যবহার ও সামাজিক ক্রিয়া কলাপাদি অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত করত সমাজের সার্বতোমুখী উন্নয়ন সাধন করা এ পক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ করা হইল যে-উপরোক্ত অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ সংক্রান্ত এপক্ষের পূর্ব নির্দিষ্ট নিয়মাবলী নিম্নবর্ণিত রূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত করা গেল।"[১৪] নিয়মাবলীর মধ্যে ক্ষত্রিয়মন্ডলীর সীমা, রাজপন্ডিত কিংবা দ্বার পন্ডিতের পরামর্শ, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার বিচার, ফি ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। কিন্তু "পূর্ব নির্দিষ্ট" নিয়মাবলীর উল্লেখ থাকায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে পূর্বে কোন এক সময়ে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের জন্য নিযমাবলী চালু করা হয়েছিল কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে ঐ নিয়মাবলী ঘোষণার তারিখ বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে না।

ক্ষত্রিয় সমাজ সম্প্রসারণ ঃ কেবলমাত্র উপরোক্ত পাঁচটি সম্প্রদায়কে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত করেই বীরবিক্রম ক্ষান্ত হননি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই পাঁচ গোষ্ঠী বড়ো ভাষা সম্ভূত ককবরকভাষী জনগোষ্ঠী। কোন কুকি চিনভাষী জনগোষ্ঠী, যারা এ রাজ্যে বাস করে, ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই ককবরকভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি কোন সম্প্রদায় লেখাপড়া ও সামাজিক চালচলনে উন্নতির পথে চলতে থাকে তবে তাদেরও পরবর্তীকালে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে অন্তর্ভুক্ত করে ক্ষত্রিয় সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস বীরবিক্রম চালিয়ে যান। ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ১১ই আশ্বিন (১৯৪৬ খ্রীঃ) তারিখের এক আদেশে দেখা যায় — যেহেতু এ রাজ্যের কুড়ি হাজারের অধিক সংখ্যক এবং রাজ্যের বাইরে অবস্থিত 'নোয়াতিয়া' নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়ন সম্বন্ধে 'নোয়াতিয়া'গণের আকাঙ্খা এপক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে এবং এই সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়ন এ পক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ করা হয় যে — নোয়াতিয়াগণের মধ্যে যাহারা উন্নয়নশীল, তাহদিকে একদা ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে গ্রহণ করা যায়। অধুনা অনুন্নত নোয়াতিয়াগণের ক্রমশঃ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে গৃহীত হইবে।"[১৫]

এ ব্যবস্থা বিশেষ করে রাজ্যের বাইরে অবস্থিত নোয়াতিয়াদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে কেননা ত্রিপুরা রাজ্যের নোয়াতিয়াগণ পূর্ব থেকেই পঞ্চ ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য যে রাজ্যের রূপিনী, কলই, মুড়াসিং ও উলছই সম্প্রদায় বড়ো ভাষা সম্ভূত ককবরকভাষী হয়েও ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে স্থান পায়নি।[১৭] এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ সেকালে তাদের হালাম বলে গণ্য করা হত বলে তাদের বিষয় বিবেচনার মধ্যেই আসেনি। কিন্তু ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ সম্প্রসারণে বীরবিক্রম যে কেবল ককবরকভাষীদের নিয়েই ভেবেছিলেন এরূপ বিবেচনা করা ঠিক হবে না কারণ তিনি কুকি চিন ভাষাগোষ্ঠী সম্ভূত হালামদের ও ভবিষ্যতে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে অন্তর্ভুক্তি পথ তৈরী করেছিলেন তাদের ক্ষত্রিয়ের পদবী 'সিংহ' ব্যবহার করবার নির্দেশ দিয়ে। ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ১০ই আশ্বিন বীরবিক্রম এক আদেশ দেন যার ফলে রামচন্দ্র কলই নামক ব্যক্তি রামচন্দ্র সিংহ কলই বলে পরিচিতি লাভ করবেন।''

ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের পুরোহিত নিয়োগ ঃ-

ত্রিপুরীদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচরণ শুরু করার পরে তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, পূজা অর্চনা ও বার্ষিক ক্রিয়াকর্ম ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন বঙ্গদেশের জেলাগুলিতে বাসরত পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ পরিচালনা করত। বহুদিন ধরে এই যাজনিক বৃত্তি চলে আসার পরে কিছু অযোগ্য ও অনুপযুক্ত লোকও পুরোহিত বৃত্তি গ্রহণ করে। ঐসব লোক যাজকতার নামে যজমানদের নানাভাবে ঠকাত। এই উপদ্রব থেকে পার্বত্য প্রজাদের রক্ষা করার জন্য বীরবিক্রম রাজ সরকার হতে সনন্দ প্রাপ্ত পুরোহিত নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নেন এবং আদেশ প্রদান করেন যে—''যেহেতু কোন কোন অযোগ্য ও অনধিকারী ব্যক্তি এ রাজ্যের হিন্দু প্রজাগণেব মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু বা পুরোহিতের কার্য করিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা ক্রমে নানা রূপে ঠকাইতেছে এবং ধর্মের গ্লানিকর অসন্মার্গে পরিচালিত করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে অতএব এই সমস্ত অনাচারের প্রতিবিধান কল্পে আদেশ হইল যে রাজ সরকারের অনুমতি অনুসারে এ রাজ্যেব পার্বত্য হিন্দু প্রজাগণের যাজকতা কি গুরুতা কার্য্যের জন্য যে সমস্ত ব্রাহ্মণ নিয়োজিত হইয়াছেন তাহাদের ব্যতীত অতঃপর অন্য কোন ব্যক্তি এপক্ষ্যের সনন্দ গ্রহন ব্যতিরেকে পার্বত্য হিন্দু প্রজাগণের যাজকতা কি গুরুতা কার্য করিতে পারিবে না। করিলে সে রাজাজ্ঞা লঙঘন করা অপরাধে দন্ডনীয় হইবে।''[১৮]

এই আদেশে জানা গেল যে পূর্বে রাজসরকারের অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণগণ যাজকতা করত কিন্তু সনন্দ বা লাইসেন্স করার প্রথা প্রচলিত ছিল না। রাজসরকার প্রয়োজনে পুরোহিত পরিবর্তন করত। এরূপ আর একটি আদেশে দেখা যায়-''চট্টগ্রাম জিলা উত্তরভূষী গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর চক্রবতীর পুত্র শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীকে এ রাজ্যর অন্তর্গত পার্বত্য প্রজামন্ডল সমূহের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় প্রজাবর্গের পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল। উক্ত পুরোহিত নিম্নলিখিত সর্ত সমূহ বহাল রাখিয়া স্বীয় এলাকা খন্ডস্থ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় প্রজাবর্গের যাজন কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকুক।''[১৯] পূর্বোক্ত আদেশ দেয়া হয়েছিল ৬ই মাঘ, ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে আর পূর্ণচন্দ্র চক্রবতীকে আদেশ দেয়া হয় ৫ই ভাদ্র, ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই যাজন কার্য বন্ধ ছিল না। অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাজন কার্য করে যাচ্ছিল। ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দের আদেশে যেসব সর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি যাজক ও যজমানদের সম্বন্ধ নির্দেশ এবং প্রজাকল্যাণকামী রাজার দৃষ্টান্ত স্বরূপ

বলে বিবেচিত হতে পারে। যেমন (ক) "পুরোহিত স্বয়ং বা তাঁহার নিয়োজিত গোমস্তাগণ সদাচারী, সৎ স্বভাবাপন্ন ও নিষ্ঠাবান হইবে। অসচ্চরিত্র, মদ্যপায়ী ও ধূর্ত প্রকৃতির লোক গোমস্তার কার্যে নিযুক্ত করা অথবা স্বয়ং ঐরূপ স্বভাবান্বিত হওয়া পুরোহিতের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত হইবে। (খ) ক্ষাত্রোচিত বিধানানুসারে যজমানগণের সদাচার রক্ষা অশৌচ পালন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থায় সম্পাদন করা পুরোহিতের কর্তব্য হইবে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কার্যে যজমানকে প্রবৃত্ত করা অথবা অর্থলোভে কাহাকেও অযথা কার্যে কিম্বা বাহুল্য ব্যয়ে লিপ্ত করা সঙ্গত হইবে না। (গ) তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে যজমানদের ব্যয় বাহুল্য ঘটান অথবা হানিজনক কোন কার্য করা পুরোহিতের পক্ষে নিষিদ্ধ। (ঘ) যজমানগণ যাহাতে সদাচারী, নিষ্ঠাবান ও শাস্ত্রসম্মত কার্যে শ্রদ্ধাবান হয় এবং মদিরাদি পরিত্যাগ করিয়া নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারে, পুরোহিত তৎপক্ষে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবে।"

উপরোক্ত সর্তসমূহ অথবা তাহার কোন একটি সর্ত ভঙ্গ করিলে, সরকারী যে কোন আদেশ লঙ্ঘন করিলে অথবা যজমানগণের পীড়াদায়ক বা হানিজনক কার্য করিলে এই সনন্দ রহিতক্রমে পুরোহিতকে অবসর করা হইবে এবং তৎস্থলে সরকারের অভিপ্রায়াণুরূপ অন্য পুরোহিত নিয়োগ করা হইবে।"[২৭] এই ঘোষণা প্রমাণ করে যে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মন্ডল ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১৯৩১ সালের পূর্বেই গঠিত হয়েছিল এবং ধর্ম কার্যাদি প্রতিপালনের জন্য ঐ সময়েই পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়েছিল।

ভাবুক মহল ঃ- বৈষ্ণব ধর্মীয় রাজা ও পার্বত্য প্রজাগণের ধর্মকৃত্যকরণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যার নাম ভাবুক বা ভাবক মহল। এই মহালের শাসনকর্তা ছিলেন রাজগুরুগণ। ত্রিপুরার রাজা রাজধর মাণিক্য (১৫৮৬-১৫৯৯ খ্রীঃ) পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সম্ভবতঃ তারপর থেকেই ত্রিপুরার রাজাদের বৈষ্ণব ধর্মাচরণ ব্যক্তিগতভাবে সূচনা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মুকুন্দ মাণিক্য (১৭৩৩-১৭৩৮ খ্রীঃ) শ্রীমন প্রভু নিত্যানন্দ বংশজাত বৃন্দাবন চন্দ্র নামক গুরুর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। তারপরে প্রায় সকল ত্রিপুরা রাজই ব্যক্তিগতভাবে বৈষ্ণব ধর্ম পালন করতেন। যদিও রাজ্য প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমত, হিন্দু ধর্মের অন্যান্য শাখা, পার্বত্য জনগণের নিজস্ব লৌকিক দেবতা, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পূজা ও মুসলমান প্রজাদর তারা নিজস্ব ধর্মপালনে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তাদের ধর্মমতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন না। বীরচন্দ্রের আমলে ভাবুক মহালের কর্তা ছিলেন গোবিন্দ লাল প্রভু গোস্বামী। তিনি 'মধ্যম প্রভু' নামে পরিচিত ছিলেন। আগরতলাতে রাজাদের কুলগুরুদের বাসস্থান শ্রীপাট নামে পরিচিত। রাজগুরুগণ ভাবুক মহালের প্রধানরূপে ধর্মসংক্রান্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক বিষয়াদি সম্বন্ধনীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাও নিষ্পত্তি করতেন। দেব কার্য,পিতৃ কার্য ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ পূর্বে কুলগুরুই করতেন। পরে কুলগুরুর অধীনে রাজপন্ডিত পুরোহিত নিযুক্ত করতেন কিন্তু সেই নির্বাচনে প্রভুর সম্মতি থাকা আবশ্যক ছিল। ব্রাহ্মণদের দানাদির ব্যবস্থার কুলগুরুর অধীনে ছিল। কেউ আদেশ না মানলে বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করলে শাস্তি পেত এবং সাসপেন্ড ও হয়ে যেত।[২১] ১৯০৪ খ্রীঃ রাধাকিশোর মাণিক্যের আদেশ—"এ রাজ্যস্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্পর্কে ভাবুক মহাল (ভাবুক বা ভাবক মহাল) নামে যে একটি মহাল আছে শ্রীপাটের শ্রীল শ্রীযুক্ত কর্তা প্রভু তাহা শাসন করিয়া থাকেন। অতঃপর বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের সামাজিক বিষয়ই তাঁহার শাসনাধীন থাকিবে। উক্ত সম্প্রদায় সংসৃষ্ট ফৌজদারী ও দেওযানী মোকদ্দমা সমূহের বিচার যথারীতি ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে হওয়া সঙ্গত।"[২২]

এই আদেশের ফলে কর্তাপ্রভুর ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারই তাঁর কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছিল লক্ষ্য করা যায়। বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছিল কিনা তা আমরা জানতে পারছি না সাক্ষ্যের অভাবে। তবে রাজবংশদের মধ্যে যে নিজস্ব পুরোহিত নির্বাচনের অধিকার ছিল তা আমরা জানতে পারি নবদ্বীপ চন্দ্রের বিবরণী থেকে। নির্বাসিত রাজ্যত্যাগী রাজকুমার কুমিল্লাতে গোমতী নদী তীরে তাঁর জননীদেবীর ইচ্ছায় নারায়ণ পূজা সম্পন্ন করেছিলেন তাঁদের বংশের ভিন্ন শাখার পুরোহিত দিয়ে। "নদীতীরে যে ব্রাহ্মণ পূজা করিলেন, সেইদিন হইতে তিনিই কাশী চক্রবর্তী আমার পুরোহিত। আজিও তাঁহার বংশধরেরাই আমাদের পৌরোহিত্যে রহিয়া গিয়াছেন।"[২৩]

৬ই চৈত্র ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দে বীরবিক্রমের মাতা মহারানী অরুন্ধুতিদেবী পরলোক গমন করেন। উক্ত ঈশ্বরীর শ্রাদ্ধকর্ম উপলক্ষে রাজগুরু গৃহ শ্রীপাটের গোস্বামীদের মধ্যে কে গুরুর আসন অলংকৃত করবেন তা নিয়ে বিবাদ বাধে এবং বিভিন্ন দাবী উপস্থাপন করা হয়। সে জন্য বীরবিক্রম ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের চৈত্র মাসের ১৮ তারিখে এক আদেশ জারী করে বলেন — "যেহেতু মাতা ঈশ্বরীর আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া উপলক্ষে প্রভু গোস্বামীদের মধ্যে কে গুরুর আসনে উপবেশন করিবেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে বিভিন্ন দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত এবং অন্যবিধ দাবীর তর্কাদির মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয় অতএব পার্শ্ব লিখিত ব্যক্তিগণের মন্তব্যানুসারে এ পক্ষের আদেশ হইলে যে (১) মাতা ঈশ্বরীর আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গুরুর উদ্দেশ্যে পূজা করা হইবে তবে প্রভু গোস্বামীগণ শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকিতে পারেন। এপক্ষের উপনয়ন গুরু হরিলাল প্রভুর পুত্রগণ গুরুপূজার সামগ্রী প্রাপ্ত হইবেন। (২) গুরুপূজার সামগ্রী ব্যতীত, গুরুর প্রাপ্য অন্যান্য সামগ্রী নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত হইবে ঃ-

রাধালাল প্রভুর সন্তানগণ চারি আনা গোবিন্দ লাল প্রভুর সন্তানগণ-চারি আনা, হরিলাল প্রভুর সন্তানগণ চারি আনা,গোবিন্দলাল প্রভুর সন্তানগণ চারি আনা, হরিলাল প্রভুর সন্তানগণ চারি আনা বিশেষ ক্ষেত্রগণ্যে জঁয়লাল প্রভুর পুত্র শ্রীনিতাইদাস প্রভু-চারি আনা। (৩) রাজগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ˚বেনোয়ারীলাল প্রভুর অধস্তন গুরুবংশগণের মধ্যে যিনিই বয়োজ্যেষ্ঠ হইবেন, তিনিই এ রাজ্যের ভাবুক মহালের উপসত্ব ভোগ করিবেন।"[২৪] পরামর্শকারী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন কুমার যতীন্দ্র মোহন দেববর্মা, রাণা বোধজঙ্গ, দেওয়ান কমলাপ্রসাদ দত্ত, ঠাকুর ভগবান চন্দ্র দেববর্মা এবং শ্রীযুত সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই আদেশ ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের অর্থাৎ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের। তারপরের আর কোন পরিবর্তনের সাক্ষ্য এখন পাওয়া যায়নি। এই সাক্ষ্যে প্রমাণিত হচ্ছে যে রাজগুরুগণ কেবলমাত্র দীক্ষাগুরুই ছিলেন না তাঁরা উপনয়ন প্রভৃতিতে গুরুর কার্য সমাধা করতেন।

অন্যান্য ত্রিপুর ক্ষত্রিয়দের ধর্মাচরণ ঃ

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা ত্রিপুরা বংশ, ঠাকুর শ্রেণী এবং ত্রিপুরীদের ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোকপাত করেছি। এখন অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন জমাতিয়াদের সঙ্গে ধর্মাচরণের ব্যাপারে রাজার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে

ওয়াকী রাই হাজারী নামক রাজপুরুষের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জমাতিয়াগণ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পরীক্ষিত জমাতিয়া। মহারাজা কুকিদের বিশেষ করে ডার্লংদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করেন। বীরচন্দ্র অবশ্যই পরীক্ষিতকে ক্ষমা করেন। রাজার উদারতায় মুগ্ধ হয়ে জমাতিয়া সর্দার "accepted vaisnabism and promised to follow the customs of vaisnabism. After that the whole community came to accept vaisnabism "[২৫] ১৩১০ ত্রিপুরাব্দের জনগণনার রিপোর্টে বলা হয় -- "অনতি দীর্ঘকাল হইল নুরনগর পরগণনার মেহারী গ্রামের প্রসিদ্ধ গোস্বামীগণ জমাতিয়াদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই নব ধর্মানুরাগ এবং পবিত্র ধর্ম প্রভাব ইহাদের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অধিকাংশ জমাতিয়াই মদ্য মাংস পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহারা সকলে মালা চন্দন ধারণ করে। প্রতিবর্ষে বহুসংখ্যক জমাতিয়া কাশী, বৃন্দাবন আদি পবিত্র তীর্থ দর্শনে বাহির হয়। এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জমাতিয়াগণ বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিলেও পূর্ববৎ বন্য দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে।"[২৬] ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের জনগণনাতে উল্লেখ আছে যে "জমাতিয়াগণের নেতা পরীক্ষিত সর্দারকে মহারাজ বীরচন্দ্র ক্ষমা করেন। এই বিদ্রোহের পর মহারাজ বীরচন্দ্রের আজ্ঞায় জমাতিয়াগণ উন্নত আচার করে ও উপবীত ধারণ করে এবং তখন হইতে জমাতিয়াগণের মধ্যে অনেকে মদ্য মাংস ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিতে আরম্ভ করে।"[২৭]

যে মাত্র জমাতিয়াগণ প্রাচীন ধর্মমত পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্মমত গ্রহণ করে তখনই তারা ভাবুক মহালের আওতায় আসে এবং তাদের ক্রিয়াকর্ম ভাবুক মহালের নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হতে থাকে। ক্রমে বৈষ্ণবদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের মধ্যে নানা প্রকাব দোষ সংক্রামিত হয়। বীরবিক্রমের যুবরাজী কালে ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দে তিনি সোনামুড়া উদয়পুর বিভাগ পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি দিনপঞ্জী বা ডায়েরী লিখতেন। তাঁর মুদ্রিত ডায়েরী "আমরা সোনামুড়া ও উদয়পুর বিভাগ পরিদর্শন ডায়েরী"তে উল্লেখ রয়েছে -- "১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত পার্বত্য প্রজা ও সর্দারদের সঙ্গে দেখা করি। প্রায় তিনশত পার্বত্য প্রজা আসিয়াছিল .... জমাতিয়াদের মধ্যে অনেক ভেকধারী বৈরাগী হইয়াছে এবং তাহারা জমাতিয়া জাতির উন্নতি না করিয়া অবনতি করিতেছে। তাহারা ৩/৪টি বৈষ্ণবী রাখে কিন্তু এই সকল বৈরাগীর সন্তানাদি হয় না। ইহা জমাতিয়াদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য জমাতিয়া সর্দারগণ আমার নিকটে আবেদন করে। এই বিষয়ে আমাদের প্রভুগণ (রাজগুরুগণ) সাহায্য করিতে পারেন।"[২৮] পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে বীরচন্দ্রের মাণিক্যের উদারতায় মুগ্ধ জমাতিয়াগণ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিল। বীরবিক্রম কিছু ভেকধারী বৈষ্ণবের সন্তানহীনতায় বিচলিত বোধ করেছিলেন এজন্য যে তাঁর প্রজা সংখ্যা কমে যাবে এবং একটি জনগোষ্ঠী ক্রমে জনশূন্য হয়ে যাবে। এদিকটা যেমন বাস্তব তেমনি তারা যে বৈষ্ণব ধর্মানুরাগে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল তা সাক্ষ্যও সেন্সাস বিবরণীতে রয়েছে "অধুনা অধিকাংশ পল্লীতেই এক একটি হরি সংকীর্ত্তনের দল আছে। ইহাদের স্বর স্বভাবতঃই মিষ্ট, ইহাদের সংকীর্ত্তণে স্বকীয়তা আছে। আমরা অনেক সময়ে তাহাদের সংকীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি জমাতিয়া দলপতিকে অনেক সময়ে জয়দেব ও অন্যান্য মিশ্র সংস্কৃত গীত পর্যন্ত গাইতে শোনা যাইত। পর্বতবাসীগণের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা

নহে।"[২৯] বিংশ শতকের সূচনাতে ত্রিপুরার নিবিড় পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জমাতিয়াদের মধ্যে জয়দেব বা অন্যান্য সংস্কৃত মেশান পদ কীর্ত্তন করার অর্থ সে সময়েও সুশিক্ষিত কীর্ত্তন গায়ক পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বৈষ্ণবধর্মীদের কীর্ত্তন শেখাতেন বলে অনুমান করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না।

বীরবিক্রমের সাবধানতা আমরা লক্ষ্য করি পার্বত্য প্রজাদের প্রতি তাঁর এক উপদেশ বাণী ঘোষণায়। ১৩৩৯ ত্রিং সনের ৬ই পৌষ তিনি এই উপদেশ বাণীটি পাঠান ঃ-(১) অনেকে শাস্ত্র নিয়মানুসারে উপযুক্ত বয়সে যজ্ঞোপবীত ধারণ করে না অতএব শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্বক ক্ষত্রিয় আচার পালন করা উচিত।(২) আজকাল পাহাড়ে বৈষ্ণব ধর্মের খুব প্রচলন হইতেছে এবং অনেকেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভেকধারী বৈষ্ণব হইতেছে কিন্তু শাস্ত্রানুসারে প্রকৃত ভেকধারী বৈষ্ণবদের আচরণ রক্ষা করিতে পারিতেছে না এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও অন্যায়রূপে বৈষ্ণবী রাখিতেছে ইহাতে সমাজের অত্যন্ত অকল্যাণ ও অবনতি হইতেছে। অতএব ভবিষ্যতে এই প্রকার অশাস্ত্রীয় কার্য্য যাহাতে না হয় তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি থাকা ভাল। (৩) বিবাহাদি উৎসবে পাহাড়ে অত্যধিক মদ্যপান ইত্যাদির প্রচলন আছে ইহা সমাজের অমঙ্গলজনক ও ব্যয়সাধ্য অতএব এই প্রকার অপব্যয় ও সমাজের অমঙ্গলজনক কার্য্য নিবারণ হওয়াই সঙ্গত।"[৩০] কিন্তু উপদেশ বাণী পাঠিয়েই রাজা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সেজন্য এক মাসের মধ্যেই ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের ৬ই মাঘ তারিখে এক আদেশ জারী করেন -- "যেহেতু এ রাজ্যের অশিক্ষিত ভেকধারী পার্বত্য প্রজাদের ভিতর নানাবিধ ব্যভিচার, দুর্নীতি ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কুপ্রথা প্রচলিত থাকায় ধর্মের গ্লানি ও সমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে অতএব এইসব অনাচার ও অনিষ্ঠ নিবারণ কল্পে আদেশ হইল যে -- (১) যাহারা সঙ্গে স্ত্রী না লইয়া একাকী ভেক গ্রহণ করিয়াছে এবং শুদ্ধভাবে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করিতেছে তাহারা "শুদ্ধ ভেকধারী বৈরাগী" বলিয়া গণ্য হইবে।(২) যাহারা একমাত্র বিবাহিত পত্নীসহ ভেক গ্রহণ করিয়াছে বা ভেকগ্রহণের পর একমাত্র বিবাহিতা পত্নীকে সঙ্গিনী রাখিয়া অন্যান্য স্ত্রী কি সেবাদাসীকে বর্জন করিয়াছে তাহারা নিম্ন সম্প্রদায়ের ভেকধারী বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) যাহারা ভেক গ্রহণের পর একাধিক স্ত্রী সহবাস করে তাহারা গৃহী বলিয়া গণ্য হইবে। বৈরাগীদের ভিতর যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কুপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা সংশোধনের নিমিত্ত অদ্য হইতে এক বৎসর কাল সময় দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট সময়অন্তে এই আদেশ বলবৎ ও কার্য্যে পরিণত হইবে।"[৩১]

এইরূপে বৈরাগীদের শ্রেণী বিভাগ করে এবং কুপ্রথা সংশোধনের জন্য সময় দিয়ে রাজা কতদূর সফল হতে পেরেছিলেন তা আমরা জানতে পারছি না উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে। অবশ্য জমাতিয়াগণ ত্রিপুর ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যে সময়েই সবচেয়ে বেশী প্রগতিশীল ছিল। জুমচাষ পরিত্যাগ করে হাল দিয়ে চাষাবাদে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং লেখাপড়াতেও অগ্রসর হয়েছিল অন্যান্য পার্বত্যজাতির তুলনায়।

অন্যান্য পার্বত্য প্রজাবৃন্দ ঃ ত্রিপুরী ঠাকুর লোক, জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া ব্যতীত ও ত্রিপুরা রাজ্যে হালাম, কুকি, লুসাই, গারো, খাসিয়া, চাকমা ও মগ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। সাধারণত পার্বত্য গোষ্ঠীর জনগণ তাদের নিজস্ব দলপতির অধীনে বসবাস করত। ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সব ব্যাপারে দলপতির নির্দেশই শেষ কথা ছিল। দলপতি

রাজা কর্তৃক নির্ধারিত হত, তাকে রাজকীয় চিহ্ন,বস্ত্র ও ভূষণাদি রাজসরকার প্রদান করত। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ের আপীল নিষ্পত্তির জন্য রাজ নিযুক্ত মিসিপের মাধ্যমে রাজার গোচরে আনার ব্যবস্থা ছিল। প্রাপ্য কর আদায় করত দলপতি বা গোষ্ঠী রাজা এবং রাজসরকারে জমা দিত। তাদের বিশেষ উন্নতির ব্যাপারে কোন বিশেষ উদ্যোগ বা আদেশ বীরবিক্রমের আমলে পরিলক্ষিত হয না। দুই একটি জনজাতি বিশেষ করে লুসাইদের প্রতি রাজাব একটি আদেশ লক্ষ্য কবা যায ১৩৫৪ ত্রিপুবাব্দের ১৩ ই পৌষ তারিখে। বিষযবস্তু হচ্ছে, বাজাব নিকট সংবাদ আসে যে ধর্মনগব ও কৈলাসহব বিভাগে বসবাসকারী লুসাইগণ চাষবাস করার জন্য ফল বাগান তৈরী করার জন্য যে জমি সরকার থেকে পেয়েছিল তাব ফলে তারা ভাবতে শুরু করে যে তারা তাদের লুসাই সর্দারের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু বীরবিক্রম ঐ নির্দেশে পরিস্কাব ঘোষণা করেন যে বাজ্যের লুসাইগণ Hon 2/Lieut Rajkumar L. Huapliana sailo অধীনে অথবা Hon 2/ Lieut Rajkumar K.T Chowma sailo অধীনে পূর্ব্বে রীতি অনুযাযী বাস করবে এমন কি তারা অন্যকোন ব্যবসায়ে লিপ্তহলে ও তাদের আনুগত্য লুসাই বাজার প্রতি থাকতে হবে।[৩২] অন্যান্য জনজাতির প্রতি এরূপ কোন সুনির্দিষ্ট আদেশ লক্ষ্য করা যায় না। কেবল মাত্র রিয়াংদেব ক্ষেত্রে কিছু গোলমাল হয়েছিল তা পবে আলোচনা করব।

বনখন্ড রিজার্ভ ঃ ত্রিপুরাব আদিবাসী সম্প্রদায় জুম চাষের উপরে নির্ভবশীল ছিল এবং এখনও রয়েছে। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থা চিরকালই উদ্বেগ জনক ছিল। তাদের হালচাষে প্রবৃত্ত কবাবার জন্য বীরবিক্রমের পূর্বে রাজ সবকারের নানা প্রচেষ্টা লক্ষ্য কবা যায়। কিন্তু একমাত্র জমাতিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যেরা বাজসবকারেব আদেশ বা অনুরোধে বিশেষ কর্ণপাত করেনি। বীরবিক্রম তাদের মধ্যে কতিপয় সম্প্রদায়কে হালচাষে প্রবৃত্ত কবাবাব উদ্দেশ্যে ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দেব (১৯৩১খৃঃ) ২০ শে ভাদ্র তারিখে এক ঘোষণা দ্বাবা ১১,০০০ দ্রোন জমি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা কবেন -" যেহেতু পর্বতবাসী পুবান ত্রিপুবা,নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিযাং, ও হালাম সম্প্রদায় ভুক্ত প্রজার জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধন কল্পে তাহাদিকে একস্থানে সংঘবদ্ধভাবে বাস করাইয়া হল কর্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাণ এ পক্ষেব অভিপ্রেত অতএব এতদুদ্দেশ্যে খোযাই বিভাগের অন্তর্গত কল্যাণপুব এলাকায নিম্ন চৌহাদ্দিভুক্ত নুন্যধিক সং ১১,০০০ হাজাব দ্রোণ ভূমি নিম্নোক্ত ২ও ৩ দফার আদেশাধীনে স্বতন্ত্রভাবে মাত্র উক্ত জাতিসমূহেব বাস ও আবাদের জন্য নির্দিষ্ট (reserve) রাখা যায।"[৩৩] এই ঘোষণায উল্লেখ থাকে যে এই রিজার্ভভূমিব মধ্যে যে অন্য প্রজা জোত বন্দোবস্ত নিয়ে বসবাস করছে, তাদের ভূমি এই এলাকার বহির্ভূত বলে গণ্য করা হবে এবং যদি তারা জমি হস্তান্তর করতে চায় তাহলে সরকার উপযুক্ত মূল্য দিয়ে ঐ জমি খাস দখল করে রিজার্ভভুক্ত করবেন। অপর এক ঘোষণায়, ২৩শে ভাদ্র ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে, বলা হয় যে ১১০০০ দ্রোণ জমি রিজার্ভ করা হয়েছে সে জমি বন্দোবস্তের ভার চিফ সেক্রেটারী মান্যবর শ্রীযুত রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুরের প্রতি ন্যস্ত হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে কায়েমী বা তকখিসি জমার তালুক অথবা এক বন্দোবস্তে কাহাকে ১০ দ্রোণের অধিক আবাদি বা অনাবাদি বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে এবং ১০০০ টাকার অতিরিক্ত নাজাইদাবী (Unrealisable amount) বাতিল (write off) করা যাবে।[৩৪]

অতঃপর ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দের ১লা আশ্বিন তারিখের এক ঘোষণায় বলা হয় যে—" যেহেতু পর্বতবাসী পুরাণ ত্রিপরা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং ও হালাম সম্প্রদায়ভূক্ত প্রজার জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধন কল্পে তাহাদিগকে নির্দিষ্ট স্থানে সংঘবদ্ধ ভাবে বাস করাইয়া হলকর্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত কবাইবার উদ্দেশ্যে বিগত ২৩.৫.১৩৪১ ত্রিং তারিখের ৪৯ নং মেমো দ্বারা খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত কল্যাণপুর এলাকায় রিজার্ভ স্বরূপ নির্দিষ্ট ভূমি বর্তমানে উক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অপ্রচুর প্রতীয়মান হইতেছে এবং যেহেতু আরও অধিকভূমি তদ্রুপ রিজার্ভ (সংরক্ষিত) করা আবশ্যক দৃষ্ট হইতেছে, অতএব আদেশ হইল যে নিম্নলিখিত চৌহাদ্দি বর্ণিত ১৯৫০ বর্গ মাইল ১,৯৫০০০ দ্রোণ জমি নিম্নোক্ত দফার সর্তাধীনে পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বসবাস ও চাষবাদ নিমিত্ত রিজার্ভ (সংরক্ষিত) কবা যায়।"[২২] এই ঘোষণার উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে যে এই শ্রেণীব কোন ভূমি সরকারের অনুমতি ব্যতীত উপরোক্ত পার্বত্য সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ, পূর্বোক্ত পার্বত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রেতার অভাব হলে সরকার কর্তৃক উপযুক্ত মূল্যপ্রদানে জমি খাসকরণ এবং উল্লিখিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় বন্দোবস্ত প্রদান ইত্যাদি। এই ঘোষণায় কৈলাসহর, খোয়াই, খাস কল্যাণপুর সদর বিভাগ, উদয়পুর বিভাগ, অমরপুর, বিভাগ বিলোনীয়া বিভাগ এবং সাব্রুম বিভাগের মোট ১৯৫০ বর্গমাইল এলাকা রির্জাভ করা হয়েছিল।

কিন্তু যাদের জন্য বনাঞ্চল সংরক্ষিত করা হয়েছিল তারা ঐ অঞ্চলে বাস করতে বা হালচাষ করতে মোটেই আগ্রহী ছিলনা কেননা তাবা প্রাচীন প্রচলিত স্থানান্তরিত জুমচাষ অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু উৎসাহী বীরবিক্রম দমে না গিয়ে প্রজাদের রিজার্ভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রজাদের শিক্ষিত করার প্রয়াসী হন। দেখা যায় ১৩৪৯ ত্রিপুবাব্দে ১৫ ই ফাল্গুন তাবিখেব একটি আদেশে-"বিভিন্ন স্থান সমূহে যে সকল ফরেষ্ট রিজার্ভ হইয়াছে, তৎসমুদয় স্থানের বাসিন্দাগণের নিকট হইতে অনেক আবেদন ইতিমধ্যে এ পক্ষ সমীপে আগত হইয়াছে, এ তৎকাবণে মনে হয যে উক্ত বাসিন্দাগণ বিজার্ভেব প্রয়োজনীয়তা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন না১/২। অতএব এ পক্ষ ইচ্ছা প্রকাশ কবনে যে আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে কুমার শ্রীল শ্রীমান নন্দলাল দেববর্মা উপবোক্ত রিজার্ভ স্থান সমূহে গিয়া বাসিন্দাগণকে রিজার্ভের প্রয়োজনীযতা গুরুত্ব বুঝাইবেন এবং স্থান বিশেষে রিজার্ভের সীমানা প্রযোজন মতে পরিবর্তন করিবেন।"[২৩] কিন্তু এবফলে পবিকল্পনা সার্থক হয়েছিল বা জুমচাষী হালচাষীতে পরিবর্তিত হয়ে রাজ্যের অর্থনীতির পবিবর্তন এনেছিল এমন সাক্ষ্য আমরা পাইনা।

পার্বত্য প্রজাদের ব্যবসায়ে উৎসাহ প্রদান : জুম চাষ নির্ভর পার্বত্য প্রজাগণ ঐ কৃষি ব্যতীত অন্য কাজ বা ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতে অভ্যস্ত ছিল না। উপরোক্ত কেহ যদি ব্যবসা বা অন্য কাজে উৎসাহী হত তাহলে তাদের সমাজপতি সর্দারগণ তাদের দন্ডবিধান করত। বীরবিক্রম যেহেতু তাদের কৃষিনির্ভরতা থেকে অন্য কাজে লিপ্ত করে তাদের আয় বাড়াতে আগ্রহী ছিলেন, সেজন্য সমাজ কর্তৃক এরূপ দন্ড বিধানের বিরোধীতা করেন। ৭ ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের এক আদেশে দেখা যায়- যেহেতু এ পক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে যে, পার্বত্য প্রজাগণের মধ্যে কতকগুলি ব্যবসা যথা সিদল বিক্রয়, হাতীর মাহুতের কাজ ইত্যাদি প্রকার কার্য্যের জন্য কেহ কেহ কোন সময়ে সামাজিক দন্ডে দন্ডিত হইতেছে এবং যেহেতু কৃষি ব্যতীত অন্যপ্রকার কাজ ও ব্যবসা পার্বত্য

প্রজার মধ্যে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, অতএব আদেশ করা যায় যে উপরিউক্ত ব্যবসাদির জন্য কেহ কোনরূপ দন্ড বিধান করার অধিকারী হইবে না। এ সমন্ধে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সভার সম্পাদক ও হালাম দফার মিসিবগণ বিহিত করিবেন।"[৩৭]

শিল্প কাজে উৎসাহ প্রদান ঃ

পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে কৃষি ও বস্ত্র শিল্পে উৎপাদন বাড়াতে বীর বিক্রম উৎসাহ প্রদান করেন। তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য বিশ্বযুদ্ধকালে বাজারে পণ্যের অমিল ও দুর্মূল্য থেকে রক্ষা করতে ১৩৫২ ত্রিপুরাব্দের ২৫ শে চৈত্র এক আদেশে তিনি বলেন—"এতদ্বারা মন্ডল সমূহের সর্দাব ও প্রজাগণকে আদেশ করা যায় যে বর্তমানে যুদ্ধের দরুণ বিদেশজাত দ্রব্যাদি আমদানীতে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক বস্তু দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়াছে বিধায় এই সময় জুমিয়া ও কৃষকপ্রজাগণ সর্ববিধায় আত্মনির্ভরশীল হইয়া প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্যাদি সহ নিজেদেব সূতায় উৎপন্ন পাছড়া প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিবে। প্রত্যেক মন্ডল দুই হাত পাশে এবং দশ হাত লম্বায় ২০টি হিসাবে পাছড়া আগামী ৩০ শে কার্তিকের মধ্যে তাহাদের অধ্যক্ষগণের নিকট নগদ মূল্য গ্রহণে বুঝাইয়া দিবে। ঐ রূপ প্রত্যেক পাছড়ার মূল্য২" আড়াই টাকা হারে পাইবে।"[৩৮]

পার্বত্য প্রজাদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে বীর বিক্রম কার্যকরী কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের পার্বত্য প্রজাদের প্রতি তিনি সমান দৃষ্টি দিতে পারেননি। ফলে কোন কোন শ্রেণী বিশেষ অবহেলিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিবাদ করেছে। বিশেষ পঞ্চ ত্রিপুরের অন্যতম রিয়াং জনগোষ্ঠী তাঁর রাজত্ব কালে বিদ্রোহ করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে ঐ বিদ্রোহের বিবরণ ও রাজকীয় দমননীতির আলোচনা করা হয়েছে।

-ঃ তথ্য নির্দেশ ঃ-

১। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ও অরুণ দেববর্মা (সম্পা) ঃ নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা কৃত 'আবর্জনার ঝুড়ি, আগরতলা, ২০০৪, পৃঃ ২২-২৪

২। Menon K. D : Tripura District Gazetteer, Agartala 1975 P. 112

৩। গোস্বামী ও দেববর্মা ঃ আবর্জনার ঝুড়ি, পৃ. উ. পৃ ২২-২৪

৪। পরিশিষ্ট - ২ দ্রষ্টব্য।

৫। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য, আগরতলা, ২০০২, পৃঃ ২৬-২৭।

৬। দত্ত ও বন্দোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পৃঃ উ. পৃঃ ১০৩-১০৪।

৭। Administration Report of Tripura 1353-1355. Art 268, 274

৮। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগা, পৃঃ ৬১-৬২।

৯। বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন, পৃঃ উ. পৃঃ ২৫০।

১০। ঐ ঃ ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন, পৃঃ

১১। ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা ঃ সেন্সাস রিপোর্ট, স্বাধীন ত্রিপুরা, ১৩১০ ত্রিং, ১৯৯৫, পৃঃ ২২।

১২। ঐ ঃ পৃঃ ২৩।

১৩। ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা ঃ সেন্সাস বিবরণী ১৩৪০ ত্রিং, পৃঃ ৬০।

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ১৫৯-১৬১।

১৫। ঐ ঃ ঐ পৃঃ ১৭৪।

১৬। Bhattacherjee P N · The Jamatiyas of Tripura, Agartala 1983, P. 6

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ১৭৫।

১৮। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পৃঃ উ. পৃঃ ১০৪।

১৯। ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১০৬।

২০। ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১০৭।

২১। ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১৬-১৭।

২২। ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ১০০।

২৩। গোস্বামী ও দেববর্মা ঃ আবর্জনার ঝুড়ি, পৃঃ ৫১-৫২।

২৪। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পৃঃ ৭৫-৭৬।

২৫। Bhattacherjee P.N .Op cit. P. 45

২৬। স্বাধীন ত্রিপুরার সেন্সাস বিবরণী, ১৩১০ ত্রিং ১৯০১ খৃঃ, আগরতলা ১৯৯৫ পৃঃ ৩৬

২৭। ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা ঃ সেন্সাস বিবরণী, পৃঃ উ. পৃঃ ৭১।

২৮। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পৃঃ ১০৫, পাদ টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯। সেন্সাস রিপোর্ট ১৯০১ খৃঃ পৃঃ ৩৭-৩৮।

৩০। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পৃঃ ১০৫।

৩১। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাজগী, পৃঃ ১০৬।

৩২। বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ষ্টেট গেজেট সংকলন, পৃঃ ১৬৯-১৭০।

৩৩। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাজগী, পৃঃ ২১৪।

৩৪। ঐ ঃ রাজগী, পৃঃ ২১৫।

৩৫। ঐ ঃ বাজগী, পৃঃ ২২১-২২৩।

৩৬। ঐ ঃ বাজগী, পৃঃ ৩১৭।

৩৭। বন্দ্যোপাধ্যায ঃ ষ্টেট গেজেট সংকলন, পৃঃ ১৫৫।

৩৮। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায ঃ বাজগী, পৃঃ ৩১৮।

বীরবিক্রম ঃ রিয়াং প্রজা

মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে রিয়াং অভ্যুত্থান। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের মহারাণী একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে আমনীয়া রিয়াং নামক এক ওঝা তাঁকে সুস্থ করেন। বীরেন্দ্র কিশোর খুশী হয়ে উক্ত ওঝাকে পারিতোষিক প্রদান করেন। ওঝার আত্মীয়দের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দান করেন এবং তাদের বংশানুক্রমিক 'চৌধুরী' উপাধিতে ভূষিত করেন।[১] ফলে উদয়পুর, অমরপুর, সাব্রুম ও বিলোনীয়া বিভাগের রিয়াং প্রজাদের উপর এই চৌধুরীগণ কর আদায়, বিচার করা এবং অন্যান্য অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। এই চৌধুরীদের মধ্যে বগাফার খগেন্দ্র রিয়াং, অমরপুরের তীর্থরাই চৌধুরী, উদয়পুরের বিজয় চৌধুরী ও তার ভাই রাজপ্রসাদ চৌধুরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খগেন্দ্র চৌধুরীর আত্মীয় কালীপ্রসাদ চৌধুরী ও ভাই রাজপ্রসাদ চৌধুরীর শাসক হিসেবে খুব সুনাম ছিল না এবং ওদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিশেষ করে নির্বিচার যৌন লালসা চরিতার্থতার অনেক কেচ্ছা বাজারে প্রচলিত ছিল। চৌধুরীর রাজ সরকার প্রদত্ত ক্ষমতার বলে নিরীহ প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করত। অত্যাচার ও অবিচার অসহনীয় হলেও সাধারণ প্রজাদের রাজ-সমীপে অভিযোগ করে বিচার পাবারও কোন সোজা রাস্তা ছিল না। প্রথমতঃ রাজধানী বহুদূরে, যোগাযোগ ব্যবস্থাহীন পার্বত্যপল্লীর বাসিন্দাদের পক্ষে রাজধানী যাওয়া অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। তদুপরি আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য এতদূরে কেউ অভিযোগ করতে যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারত না। কারণ রাজা সরাসরি কোন পার্বত্য প্রজার অভিযোগ শুনতেন না। পার্বত্য প্রজাদের প্রতিনিধিরূপে রাজধানীতে মিসিপ নিয়োগ করার প্রথা ছিল। এই মিসিপগণ প্রজাদের অভাব অভিযোগ বা দাবীদাওয়া শুনতেন। প্রয়োজনবোধে ও অবস্থা বিবেচনায় নিজের ক্ষমতার বাইরে মনে হলে অভিযোগ রাজার গোচরে আনতেন। প্রজাকে অপেক্ষা করতে হত রাজার এত্তেলা পাবার আশায়। ফলে রাজাতে-প্রজাতে সদা সাক্ষাৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল এবং রাজা ও প্রজাদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমে বেড়ে যেতে থাকল।[২] সে সময়ে রিয়াং সম্প্রদায়ের মিসিপ ছিলেন ঠাকুর হরচন্দ্র দেববর্মা।

. লক্ষ্য করার বিষয় এই যে রিয়াংদের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র অর্থাৎ নিজেদের সর্দার নিজেদের ঠিক করা বা নিয়োগ করার প্রথা আবহমানকাল ধরে চলে আসছিল। রাজা বীরেন্দ্র কিশোরের সনন্দের ফলে তা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে সমাজের সুস্থিতি বা ভারসাম্য বিনষ্ট করল। ফলে সাধারণ প্রজা চৌধুরীদের কোনদিনই আর নিজেদের লোক বলে মেনে নিতে পারেনি। সর্দারদের কার্যকালের সীমবদ্ধতা ঘুচে গেল এই রাজকীয় বদান্যতার ফলে। এক জুম থেকে আর এক জুম পর্যন্ত কার্যকাল নির্দিষ্ট থাকার কালে সর্দারগণ পুনরায় নির্বাচিত হবার বাসনায় প্রজাদের পক্ষে মঙ্গলজনক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হত অথবা অন্ততঃ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির নির্লজ্জ প্রয়াস থেকে বিরত থাকত। কারণ কিছুদিন পরেই সর্দার পুনরায় সাধারণ প্রজাতে রূপান্তরিত হত। কিন্তু বীরেন্দ্র কিশোরের ঘোষণায় এক নতুন সামন্ত শ্রেণীর উদ্ভব হল যারা পুরুষানুক্রমে শাসন করার সুযোগ পেল এবং এই রক্ষাকবচ তাদেরকে স্বার্থান্বেষী ও প্রজার অহিত কামনাকারী শাসকে পরিণত করল। শুধু রাজাকে খুশী রাখতে পারলেই যাদের পদ অব্যাহত থাকবে তারা প্রজাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করবে কেন? আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে রিয়াং প্রজাকে বা তাদের সর্দার চৌধুরীকে রাজধানীতে তাদের মিসিপ নিয়োগ করা হত না। প্রতিনিধি প্রকৃতপক্ষে রাজা নিয়োগ করতেন সেখানে রিয়াং প্রজাদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। কাজেই সর্দারদের সামন্ততান্ত্রিক পেষণে পিষ্ট হওয়া ভিন্ন রিয়াং প্রজাদের অন্য কোন গতি ছিল না।

অধুনা বাংলাদেশে অন্তর্গত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার রামগড় বিভাগের দেওয়ান বাজার নামক জনপদের এক নগণ্য অধিবাসী ছিলেন রতনমণি নোয়াতিয়া। তাঁর পিতার নাম নীলকমল নোয়াতিয়া। পিতাপুত্র উভয়েই শৈব তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। রতনমণি লম্বা চুল রাখতেন, পরতেন সাধারণ জামা কাপড়, হাতে থাকত লোহার চিমটা আর গলায় পরতেন রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি 'ওঁ প্রাণ রাম' মন্ত্রে শিষ্যদের দীক্ষিত করতেন।[৫] বহুরিয়াং ও নোয়াতিয়া জনতা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। রতনমণির ছিল পাঁচ স্ত্রী। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন রিয়াং মহিলা, ফলে রতনমণি হলেন রিয়াং সম্প্রদায়ের জামাই। এই আত্মীয়তা বন্ধন ও রিয়াংদের মধ্যে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে রতনমণি বিলোনীয়া বিভাগের বগাফাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ কবেন। বগাফাতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পার্বত্য প্রজাদের দীক্ষা দিতে শুরু করেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং বহুলোক তাঁকে গুরুরূপে বরণ করল। শৈবধর্মে অনুরাগী রিয়াংগণ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এখন তারা দলে দলে রতনমণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দলভারী করে তুলল। অবশ্য আত্মীয়তার বন্ধনের সুযোগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অন্য আরও একটি কারণ তাঁর শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল বলে মনে করা হয়। রতনমণির শিষ্যরা প্রচুর পরিমাণে গাঁজার ধূমপান করত। এই নেশার আকর্ষণে বহুলোক তাদের দলে ভিড়েছিল বলেও ধারণা করা হয়। রতনমণির অনুগত শিষ্যরা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, অত্যাচার, অন্যায় জুলুম ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত। তারা তাদের মুখপাত্ররূপে গুরুকে মেনে নিয়েছিল। চৌধুরীদের অত্যাচারে নিপীড়িত রিয়াং প্রজাবর্গ সাধু রতনমণিকে তাদের কাছে মানুষ মনে করে নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা জানাত। রতনমণির শিষ্য বা অন্যান্য প্রজা সবাইর অভিযোগ ছিল চৌধুরীদের বিরুদ্ধে। রাজা বা অন্য রাজপুরুষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না বলে অনেক

গ্রামবৃদ্ধ এখনও মনে করেন। রতনমণির বগাফার শিষ্যরাই প্রথমে গ্রামীণ চৌধুরীদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে অসন্তোষের সৃষ্টি করে।[৫]

গোমতী নদী ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান নদী এবং এই নদী পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী রূপে ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের নিকট স্বীকৃত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই গোমতীর উৎস তীর্থমুখে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা বসে। ঐ দিন উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা তীর্থমুখে মিলিত হয়ে স্নান, পূজা অর্চনা করে এবং পিতৃপুরুষের অস্থি পবিত্র কুন্ডে বিসর্জন দেয়। এই অনুষ্ঠানে বাঙালী পুরোহিতগণ পৌরহিত্য করত। বীরচন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মাচরণের প্রভাব সৃষ্টির ফলে কিছু কিছু পার্বত্য প্রজার মধ্যে উক্ত ধর্মচারণের বিকৃত রূপ প্রসার লাভ করে। সামাজিকভাবে বিয়ে না করেও প্রজা স্ত্রীসঙ্গ করতে থাকে বা একাধিক স্ত্রীলোক বিবাহ করতে থাকে সাধনার নামে। এদের সন্তান সন্ততি হত না ফলে প্রজা বৃদ্ধি হ্রাস পাবার সম্ভাবনা দেখা দেবার ফলে রাজা বীরবিক্রম কিশোর চিন্তিত হন এবং ভেকধারী বৈরাগীদের শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচরণ থেকে বিরত হওয়া সম্পর্কে এক আদেশনামা জারী করেন।[৫] রাজা প্রজাদিগের মধ্যে যথার্থ শাস্ত্রীয় আচরণ প্রচলন করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম জেলার উত্তরভুসী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত 'পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীকে এ রাজ্যের অন্তর্গত পার্বত্য প্রজামন্ডল সমূহের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় প্রজাবর্গের পৌরহিত্য কার্যে নিযুক্ত' করেন।[৬] রাজ নিযুক্ত এই পুরোহিত ও তাঁর নিযুক্ত কর্মচারী বা গোমস্তাগণ পার্বত্য প্রজার বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে পৌরোহিত্য করতে শুরু করে। তীর্থমুখের মেলাতেও স্বভাবতই তারা পৌরোহিত্য করত। রতনমণির শিষ্যরা এই প্রথার অবসান ঘটাতে উদ্যোগী হন। সাধু শিষ্যগণ নিজেরাই মন্ত্রোচ্চারণ করে তীর্থ যাত্রীদের পূজা অর্চনা সমাধা করতে শুরু করল এবং বাঙালী ব্রাহ্মণদের তীর্থমুখ থেকে বিতাড়িত করল। এই কাজে তাদের সহযোগী হল চৌধুরীরা, কারণ তীর্থকাজে প্রাপ্ত দান ও দক্ষিণা রতনমণির সাধু শিষ্যগণ ও চৌধুরীদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু গোল বাঁধল পরের বছরে যখন সাধু শিষ্যরা চৌধুরীদের প্রাপ্য ভাগ দিতে অস্বীকার করল। অসন্তুষ্ট চৌধুরীগণ রাজ দরবারে অভিযোগ জানাল। তারা অভিযোগ করল যে প্রজাদের একটা অংশ রতনমণির নেতৃত্বে ক্রমশও বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। সময়ে ব্যবস্থা না নিলে রাজকীয় শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।

রাজা অনুগত চৌধুরীদের অভিযোগ বিশ্বাস করলেন। কোনরূপ তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা হল না। রতনমণিকে গ্রেপ্তার করতে আদেশ দেয়া হল।[৭] রতনমণি আটক হলেন তাঁকে বন্দী করে রাজধানীতে আনা হল এবং অন্যদের আটক করে রাখা হল। রতনমণি বন্দী হবার পরে রিয়াং চৌধুরীরা সাধারণ প্রজা বিশেষ করে রতনমণির অনুগামীদের নানাভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করে। তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেবার উদ্দেশ্যে তাদের উপর নানারকম জুলুম চালান হল। কর আদায় করার জন্য চালানো হল প্রচন্ড অত্যাচার। তৈথং খাটিয়ে প্রজাদের ব্যতিব্যস্ত করা হল। রতনমণির অনুগামীদের বেগার খাটান হল প্রচন্ড শরীরিক পরিশ্রমের কাজে। এদিকে রতনমণি কিছুদিনের মধ্যেই রাজকীয় বন্দীশালা 'আলং' থেকে পালাতে সক্ষম হলেন। সন্দেহ করা হয় তাঁর এই সক্ষমতার প্রদর্শনে বিন্দিয়াদের গৌণ ভূমিকা ছিল।[৮] কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কাউকে অভিযুক্ত করা গেল না। রতনমণি বগাফার বাস উঠিয়ে দিলেন এবং তীর্থমুখে স্থায়ী আস্তানা গড়ে তুললেন। রাজকীয় আলং থেকে রতনমণির পলায়ন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ঘটনা সাধারণের সমক্ষে শুধু তার বীরত্বই প্রকাশ করল না উপরন্তু তার অনুগামীদের মধ্যে এই

ঘটনা তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ রূপে প্রচার লাভ করল। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে রতনমণির নাম ছড়িয়ে পড়ল। অখ্যাত রতনমণি রাতারাতি পাদপ্রদীপের আলোতে উদ্ভাসিত হলেন, প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বেড়ে গেল এবং দক্ষিণ জেলার বাইরে বসবাসকারী রিয়াংগণও তাকে গুরুরূপে বরণ করে নিল।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। সমতল বঙ্গদেশে যুদ্ধের প্রয়োজনে ও প্রভাবে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হল। পার্বত্য ত্রিপুরাতেও দেখা দিল প্রচন্ড খাদ্যাভাব। রাজধানী আগরতলার নাগরিকদের বাঁচাবার জন্য রাজ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের ধান চাল কিনে গুদামজাত করলেন এবং শহরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হল।[৮] ফলে উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনীয়া ও সাব্রুম অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিল। ক্রমে তা দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করল। পার্বত্য অঞ্চলে হাজার হাজার অভুক্ত মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হল। পার্বত্য অঞ্চলে খাদ্যাভাব রোধকল্পে রতনমণি বিভিন্ন পাড়াতে ধর্মগোলা স্থাপন করেন এবং প্রজাদের নির্দেশ দেন গোলাতে ধান মজুত করতে। চৌধুরীদের কর দিতে অস্বীকার করে রতনমণি কর আদায়ে বাধা সৃষ্টি করেন। অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলি তাদের বিপদের দিনে রতনমণিকে তাদের পাশে পেল এবং এর ফলে জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল। ধর্মগোলা গড়ে তুলতে রতনমণির শিষ্যরা নিজেদের শস্যাদি দিলেও অনেক ক্ষেত্রে চৌধুরীদের বাড়ী লুটপাট করে সংগৃহীত শস্য ধর্মগোলাতে জমা করল। নিজেদের লোকদের জন্য এই শস্য ব্যয় করা হত। এভাবেই শুরু হল একটি আর্থ সামাজিক প্রতিবাদমূলক আন্দোলন এবং এই আন্দোলন ক্রমশঃ ত্রিপুরার সীমা অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করতে শুরু করে।

বিশ্বযুদ্ধে মিত্র বাহিনী জাপানীদের অগ্রগতি রুখতে ব্যর্থ হয়ে ক্রমশঃ পিছু হটতে শুরু করে। ব্রিটিশ বাহিনী বর্মাতে পশ্চাদাপসরণ করে ফলে যুদ্ধ ক্রমশঃ ত্রিপুরার কাছাকাছি অঞ্চলে চলে এল। ক্রমে যুদ্ধ সম্প্রসারিত হল আরাকানের রোথিডাঙ্গ-বুথিডাঙ্গ এলাকাতে। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ত্রিপুরার রাজাকে আর্থিক সাহায্য ও সৈন্যদল পাঠাতে অনুরোধ করল। সবলের অনুরোধ ক্রমে আদেশে পরিণত হল। নিরূপায় বীরবিক্রম কিশোর বাধ্য হলেন যুদ্ধ তহবিল গঠন করতে। ১৪ই জানুয়ারি ১৯২২ সালে এক ঘোষণায় মহারাজা বীরবিক্রম যুদ্ধ তহবিলে আর্থিক ৫৭,০০০ টাকা দান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন।[৯]

রিয়াংগণ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। অতীতে ত্রিপুরার গৌরবময় দিনগুলিতে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা প্রসারণে তারা বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। রাজ্য এই দুর্যোগের দিনে রিয়াং যুবক সংগ্রহ করে সৈন্যদল গঠন করার মনস্থ করেন। বস্তুতঃ পূর্ব রণক্ষেত্রে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত ত্রিপুর বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়।[১০]

কিন্তু দিনকাল পাল্টে গেছে। চৌধুরীদের আদেশ কোন রিয়াং যুবক কানে তুলল না। প্রজাদের উপর চৌধুরী সর্দারদের কোন প্রভাবই আর অবশিষ্ট ছিল না। বলা যেতে পারে যে অবস্থা এমনই চরমে পৌঁছেছিল যে দুইপক্ষ যুযুধান গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। কাজেই অনুগত চৌধুরী রাজার আদেশ পালনে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু কুটিল চৌধুরী এই সুযোগে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বার সম্ভাবনা হাতছাড়া করলেন না। মহারাজ সকাশে চৌধুরী বিনীত নিবেদন করলেন যে তাকে রিয়াং সমাজের 'রায়' পদে নিযুক্ত করলেই ঐ কাজে পদের গাম্ভীর্য রক্ষা করা সম্ভব। 'রায়' রিয়াং

সমাজের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর পদবী। প্রচলিত রীতি অনুসারে চৌধুরীদের ও রিয়াং প্রজাদের দ্বারা মনোনীত ব্যক্তিকেই ত্রিপুরা রাজ সরকার 'রায়' হুদ্দা প্রদান করেন। ১৩৩৩ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৩খ্রীঃ) রিয়াং সর্দারগণ তাদের 'রায়' নীতিরায় রায়ের মৃত্যুর পরে চরখী দফাস্থ শ্রী দেবী সিং চাপিয়াকে রায়ের পদে নির্বাচিত করে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের অনুমোদন প্রার্থনা করেন।[১১] স্বভাবতই উক্ত দেবী সিং রাজার হুদ্দা প্রাপ্ত হন এবং রায়ের পদে কাজ করতে থাকেন। কোন রায়ের জীবদ্দশায় অন্য ব্যক্তিকে রায় পদে নিযুক্ত করা প্রথা বিরুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে বীর বিক্রম সাবেকী প্রথা ভঙ্গ করে তার অনুগৃহীত খগেন্দ্র চৌধুরীকে রায় হুদ্দা প্রদান করেন।[১২] রাজকীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে খগেন্দ্র চৌধুরী প্রজাদের উপর জুলুমের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলেন। তিনি এমন উদ্ধত হয়ে উঠলেন যে রিয়াং জমায়েতে পূর্ব 'রায়' দেবীসিং চৌধুরীকে অপমান করলেন। এই সময়ে রাইমাছড়া নিবাসী রামবাহাদুর এবং অপর কয়েকজন রিয়াং সর্দার জম্পুই পাহাড়ের লুসাই রাজা রাঙ্গ বুঙ্গাকে রায়ের ব্যাপারে দেবীসিং ও খগেন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করে। রাঙ্গবুঙ্গা ত্রিপুরা দরবারের হুদ্দাপ্রাপ্ত লুসাই সর্দার বা রাজা। তিনি নিজেই ছিলেন যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারী, জোর করে আদায় করতেন নায্যের অতিরিক্ত 'পাথেং'। কিন্তু তবু তিনি খুশী হয়ে রাজী হলেন এবং রাজদরবারে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করার জন্য দরখাস্ত প্রেরণ করেন।[১৩] ঐ দরখাস্ত ফলপ্রসু হয়নি কারণ রাজার দৃষ্টি তখন যুদ্ধের প্রয়োজনে সেনাদল গঠনের উপর আবদ্ধ। রাজা পুনরায় খগেন্দ্র চৌধুরীও উদয়পুরের কৃষ্ণপ্রসাদকে চাপ দিলেন রিয়াং যুবকদের নিযুক্ত করে রাজধানীতে নিয়ে আসতে। চৌধুরীরা চেষ্টা করে বিফল হলেন। কেউ তাদের কথায় কান দিতে রাজী নয়। নিজেদের রাজরোষ থেকে বাঁচাবার তাগিদে এবং আদেশ অমান্যকারীদের শায়েস্তা করতে রাজার নিকট মিথ্যা নালিশ জানালেন যে রতনমণি ও তার শিষ্যরা সেনাসংগ্রহে বাধা দিচ্ছে। যুদ্ধের গতি প্রকৃতিতে সেনাদল গঠনে বাধা পেয়ে রাজা বিশেষ বিরক্ত হলেন। যুদ্ধ তখন প্রায় ত্রিপুরার সীমান্তে এসে পৌঁছেছে। অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে প্রচার করা হল যে রিয়াংগণ রাজার আদেশ অমান্য করেছে এবং রাজশক্তিকে দুর্বল করছে। ত্রিপুরী এবং জমাতিয়াগণ রাজশক্তির এই প্রচার সমর্থন করলেন।

তারা প্রচার করলেন যে জাপানী আক্রমণে ত্রিপুরার স্বাধীনতা বিপন্ন প্রায়, এরূপ অবস্থায় রাজার আদেশ অমান্য করার অর্থ দেশদ্রোহীতা।[১৪] এভাবে একটা ধর্মীয় আর্থ সামাজিক আন্দোলন সামন্ততন্ত্রীদের কবলে পড়ে বিকৃত ব্যাখ্যা পেল এবং অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবার উপক্রম হল।

ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া প্রভৃতি প্রজাদের নিকট ও অন্যান্য অনুগত প্রজাদের নিকট বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য বহু পূর্ব থেকেই একনলা ও দো-নলা বন্দুক ছিল। সন্দেহ করা হয় যে রিয়াংগণ ঐসব অস্ত্র সংগ্রহ করে ব্যাপক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে (১৯৪৩ ইং) ১৩ই শ্রাবণ উদয়পুর থানা থেকে খবর পাঠান হল যে রিয়াংগণ রতনমণির নেতৃত্বে ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠছে এবং যে কোন সময়ে রাজসরকার বা সাধারণ প্রজাদের উপর হামলা করতে পারে। খগেন্দ্র চৌধুরীও বগাফা থেকে অনুরূপ একটি বার্তা পাঠান মহারাজার নিকট। উদয়পুরের চৌধুরীরা খবর পাঠায় যে বিদ্রোহী রিয়াংগণ অমরপুরের পানছড়া, তুইছড়া ও হাজাছড়াতে এবং উদয়পুরের তুইমাছড়া, মনাইছড়া চৌধুরী পড়া ও তুইনানীতে সমবেত হয়েছে। বিলোনীয়া থানা খবর পাঠায় যে, দুইজন

রিয়াং চৌধুরীর ঘরবাড়ী বিদ্রোহী রিয়াংগণ লুঠপাট করেছে।[১৪] বিদ্রোহীদের ডাকাত আখ্যা দেয়া হল এবং তাদের শায়েস্তা করার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা নেয় হল।

১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে ১৩ই শ্রাবণ (৩০.৭.৪৩ ইং) রাজ সরকার লেফটেন্যান্ট নগেন্দ্র দেববর্মাকে বিদ্রোহীদের দমন করতে উদয়পুরে অভিযান করতে আদেশ দেন। "(১) মোতয়ানী ফোর্স ডাকাত দল ধৃত করিয়া আগরতলা আনয়ন করিবে। (২) কোন ডাকাতদল ধৃত করিবারকালে যদি কোন প্রখর বাধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে কমান্ডারকে প্রয়োজন ও নিজ বিবেচনা অনুসারে স্বীয় জিম্বায় কার্য আদায় করিবার জন্য ডাকাতদলকে কন্ট্রোল করিয়া ফায়ার করিবার আদেশ দেওয়া যাইতে পারিবে। ফোর্স কমান্ডারের অতিরিক্ত ফোর্সের জমাদারগণকেও এরূপ করিবার এবং সৈন্যগণকে সেলফ ডিফেন্স ফায়ার করিবার আদেশ দেওয়া যাইতে পারে। (৩) ফোর্স 'মুভ' করিবার সময় কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি বা দলের উপর আত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়া ফায়ার করিতে পারিবে। (৪) ডাকাত দলের বন্দুক, গোলা, দাও, বল্লম প্রভৃতি সব প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ ও বাজেয়াপ্ত করিয়া আনিতে হইবে। (৫) ডাকাতদলকে বাড়ীতে বা পাড়ায় পাওয়া না গেলে ফোর্স তাহাদিগের বাড়ীতে গিয়া ধান, চাউল বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকজনদের বাহির হইবার সুযোগ দিয়া সময় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দিবে এবং ডাকাতদল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাতাপিতা প্রভৃতিকে বিবেচনা অনুযায়ী ধৃত করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিবে।[১৫]"

১৪ই শ্রাবণ ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে (৩১-৭-১৯৪৩ ইং) একই ধরণের আদেশ দিয়া লেফট্যানান্ট হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুরকে বিলোনীয়া বিভাগের ডাকাতদল ধৃত করা ও শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হল।[১৬] এই সেনাদলের সঙ্গে রাজ্য রক্ষী বাহিনীর অফিসার, কতিপয় রিয়াং সর্দার ও পুলিশ অফিসারদের যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২ নম্বর ত্রিপুরা ইনফেন্টট্রির জমাদারকে উদয়পুর, অমরপুর থেকে দুই সেকশান সৈন্য নিয়ে বিলোনীয়া মুহুরীপুরে লেঃ হরেন্দ্র দেববর্মার সঙ্গে মিলিত হতে আদেশ দেওয়া হয়। এই বাহিনী ১৪ শ্রাবণ ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে আগরতলা থেকে যাত্রা করে ১৫/৪/৫৩ ত্রিপুরাব্দে ভোরে বিলোনীয়া পৌছায়। লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মার বাহিনী ১৩ই শ্রাবণ ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে আগরতলা ত্যাগ করে কাঁকড়াবন হয়ে সেদিনই মাঝরাতে উদয়পুরে পৌছায়।[১৭] রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনীর কর্মাধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দেববর্মাকে লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মার পশ্চাতে যথেষ্ট গোলাবারুদ ও অর্থসহ উদয়পুরে পাঠানো হল। পূর্বেই জমাতিয়া সর্দারদের সংবাদ পাঠান হয়েছিল উপযুক্ত সংখ্যক জমাতিয়া যুবক সরবরাহ করতে। প্রায় পাঁচশত জমাতিয়া যুবক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে ডাকাত দমন করতে মনোরঞ্জন দেববর্মার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।[১৮]

ক্যাপ্টেন ব্রজলাল দেববর্মার নির্দেশে নগেন্দ্র দেববর্মা ১৬ই শ্রাবণ ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ২রা আগষ্ট ১৯৪২ ইং তারিখে তুইনানী ক্যাম্প অঞ্চলে অভিযান চালান। এখানে বিদ্রোহীদের দলে ৩০০জন লোক ছিল এবং একশত বন্দুক নিয়ে তারা তৈরী ছিল।[১৯] সরকারি বাহিনী উপরের দিকে গুলি ছোঁড়া শুরু করলে বিদ্রোহীরা পালাতে শুরু করে। সেনাপতির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে সরকারি বাহিনী যথেষ্ট সাবধান ছিল বলে কিছু ক্ষতি হয়নি। সংঘর্ষে তৈমুল রিয়াং গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ২৩২জন ছেলেমেয়ে সহ মোট ৪৬৪জন ধৃত হয়। এখানে ৭টি বন্দুক, ৯৪টি দা, ৭টি কাঁচি এবং একটি তলোয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে অবস্থিত রক্ষীবাহিনীর

কর্মাধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দেববর্মার নিকট উক্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি ও আসামীদের হস্তান্তর করা হয়। 'ত্যাংখা রায়, হান্দাই সিং, কাঁঠাল রায় প্রভৃতি রতনমণির মন্ত্রীরা পলাইয়া যায়।''[১০]

১৮ই শ্রাবণ ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে (৪,৮,১৯৩০ ইং) লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মা তুইছারবুহা পৌছেন। তখন তিনি সেখানে পরিত্যক্ত ক্যাম্পটির সন্ধান পান। সবগুলি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মা সসৈন্যে নূতন বাজার হয়ে ডম্বুর পর্যন্ত অভিযান চালান। সেনাদল পথে বিদ্রোহীদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়। পুরুষেরা প্রায় সবাই পলাতক। ডম্বুরে রতনমণির অন্যতম প্রধান শিষ্য খুসী কৃষ্ণকেও তার বাড়ীতে পাওয়া যায়নি। এপথেই সম্ভবতঃ সৈন্যদের গুলি চালনাতে একজন গর্ভবতী নারীসহ সাতজন রিয়াং প্রাণ হারান।[১১] এই ঘটনা রিয়াংদের নিকট 'খু সিং' নামে পরিচিতি। মনোরঞ্জন দেববর্মার লোকজন সেনাবাহিনীর পথ অনুসরণ করে নতুন বাজার পর্যন্ত যায় এবং ৬০০/৭০০ লোক গ্রেপ্তার করে আগরতলাতে পাঠায়। পথের মধ্যে জঙ্গল থেকে প্রায় ১০ মণ গাঁজা উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করে।

লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মা ১৫ই শ্রাবণ রবিবার ভোরে রেলে বিলোনীয়া পৌছান। খগেন্দ্র রায় বিদ্রোহীদের ভয়ে বিলোনীয়াতেই বাস করছিলেন তখন। সেদিন লেঃ দেববর্মা, মহকুমা শাসক ও খগেন্দ্র রায় বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তখনই তারা সংবাদ পান যে বগাফার রায়ের বাড়ী বিদ্রোহীরা লুটপাট করছে। পুলিশ সহ সৈন্যবাহিনী তৎক্ষণাৎ বগাফার উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। বার মাইল দূরে বগাফাতে পৌছে তারা জ্বলন্ত ঘর বাড়ী দেখতে পায় এবং জানতে পারে যে বিদ্রোহীরা বাইখোরার দিকে চলে গেছে। ২০০জন স্থানীয় রিয়াং সহ সৈন্য বাহিনী বাইখোরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং সেখানে বিকেল ৪টায় পৌছে জানতে পারে যে বিদ্রোহীরা লক্ষ্মীছড়াতে অবস্থান করছে। জঙ্গল ভেঙ্গে সেনাবাহিনী চলতে থাকে এবং জঙ্গল শেষে ধান ক্ষেতে পৌছে সামনের টিলার উপর বিদ্রোহীদের দেখতে পায়। বিদ্রোহীরা জন মার্থাহা চৌধুরী ও কান্তলা চৌধুরীর বাড়ী লুঠপাট করে ওখানে ভোজন পর্ব সমাধান করছিল। এখানে মিলিটারী ফোর্সের সঙ্গে বন্দুক, দা বল্লম ও খড়্গ নিয়ে বিদ্রোহীরা সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সৈন্যাধ্যক্ষ সেনাবাহিনীকে দু'দলে ভাগ করে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করেন। গুলির মুখে দাঁড়াতে না পেয়ে বিদ্রোহীরা পালিয়ে যায়। আহত ২জন সহ মোট ৫জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় সেনাবাহিনী। মিলিটারীগণ রাতেই বিলোনীয়া চলে আসে এবং ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীরা রতনমণির কাছে পালিয়ে যায়। এইভাবে সম্মিলিত বাহিনী বিলোনীয়া, উদয়পুর এবং অমরপুরের ৫০টি গ্রামে অভিযান চালায় এবং ঘরে ঘরে আগুন দিয়ে লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট করে এবং গ্রেপ্তার করে বহু লোককে। সরকারি মতে ধৃত বন্দীর সংখ্যা তিন হাজারের নীচে। এর মধ্যে ২০০জন স্ত্রীলোক ও ১২জন শিশুও ছিল। বেসরকারি মতে ধৃত বন্দীর সংখ্যা ২০৪২৫জন।[১২]

১৫ই শ্রাবণ ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে (১.৮.১৯৪৩ ইং) বগাফার পরাজিত বিদ্রোহীরা অধিক রাতে তুইছরবুহাতে রতনমণির ক্যাম্পে পৌছায়। এদের মধ্যে চন্দ্রমণি, রামপ্রসাদ ও রতনমণির ভাই সকামল উল্লেখযোগ্য। অনুচরগণ বগাফা এবং লক্ষ্মীছড়ার ঘটনা বিবৃত করলে রতনমণি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা ক্ষতিকর বিবেচনা করে আত্মরক্ষার জন্য রামসিরা বা রামগড়ে পশ্চাদাপসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। শিষ্যদের নিজেদের পছন্দমত উপযুক্ত স্থানে আত্মগোপন করতে নির্দেশ দেন। ঐদিনই শেষরাতে বা পরদিন ভোরে (১৬/৪/৫৩ ত্রিং) রতনমণি রামসিরার

উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সর্পজয়, কৃষ্ণরায়, চন্দ্রমণি প্রভৃতি অনুচরগণ কিছু অর্থ ও খাদ্যসহ তাঁকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেন। পরে ছেনিফা, বগা, চৈত্রসেন, দাবারায়, বিচিত্র, মুকুন্দ, কান্তরায় প্রভৃতি অনুচরগণ রামসিরাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তসলামফা ও রামসিরা গিয়ে রতনমণিকে দেখে আসেন। ২রা আগষ্ট রতনমণি তুইছারবুহা পরিত্যাগ করেছিলেন বলেই ৪ঠা আগষ্ট ওখানে পৌঁছে সেনাপতি নগেন্দ্র দেববর্মা পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত আস্তানা দেখতে পেয়েছিলেন।

রামসিরাতে আস্তানা গাড়ার দিন সাতেক বাদে (সম্ভবতঃ ১০ই আগষ্ট) মুকুন্দ রিয়াং প্রভৃতি রতনমণির অনুচরগণ পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। রামসিরায় নিকটবর্তী চাকমা বাজারের নিকটে রতনমণির পুরান বাড়ীতে মুকুন্দ, চৈত্রসেন, কান্তরায় ও তখিয়া আত্মগোপন করেছিল। পুলিসী অভিযানে চৈত্রসেন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আহত দাবারায় হাসপাতালে মারা যায়। মুকুন্দ, কান্তরায় ও তখিয়াকে রাঙামাটি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্য অনুচর সহ রতনমণি একটু দূবে তাঁর নতুন বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলেন। সেদিনের হঠাৎ আক্রমণের গুলির শব্দে রতনমণি ও তাঁর অনুচরগণ পালাতে সক্ষম হন। নভেম্বর মাসে (সম্ভবতঃ) রতনমণিকে দীপ্তিশালা থানা অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করে রাঙামাটি জেলে নিয়ে আসা হয়।[১৩] তাঁর অনুচরগণ তাঁর সঙ্গে ধরা পড়েনি। ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করার কালে রতনমণি ধরা পড়েছেন।[১৪] বলে যে মত ত্রিপুর সেন পোষণ করতেন তা উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে না।

ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ সরকার ত্রিপুরা সরকারে নিকট বন্দীদের হস্তান্তরিত করেন।[১৫] রতনমণি মুকুন্দ ও তখিয়াকে আগরতলা নিয়ে আসা হয়। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর যে কোন দিনে রতনমণিকে আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। মুকুন্দ জেল দরজাতে দারুণভাবে প্রহৃত হয়। তখিয়া অসুস্থ হয়ে জেলেই মারা যায়। রতনমণিকে সেদিনই জেল থেকে রাজপ্রাসাদে আনা হয়। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সদর দরজার সিঁড়িতেই তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃতদেহ দড়িতে বেঁধে রাস্তা দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় কারাগারে। পরদিন সকালে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়, কেন্দ্রীয় কারাগারে কলেরা রোগাক্রান্ত হয়ে রতনমণি মারা গেছেন।[১৬] ত্রিপুর সেন মহাশয়ের বিবৃতি মতে এই ঘটনার কাল ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দের আশ্বিন মাসের শেষভাগ।[১৭] কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ও ত্রিপুরা রাজ সরকারের মধ্যে বন্দী বিনিময় হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ-পৌষ), আর বন্দী রতনমণি মারা গেলেন আগরতলাতে আশ্বিন মাসে এটা কিরূপে সম্ভব?

১৮ই শ্রাবণ ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে (৪.৮.১৯৪৩ ইং) থেকে ধৃতবন্দীদের রক্ষীবাহিনীর তদারকিতে পদব্রজে আগরতলায় পাঠান হতে থাকে। প্রায় এক মাস ধরে এই পর্ব চলে। এই ঘটনা প্রবাহ রাজধানীর মন ব্যথিত করেছিল কারণ এই মিছিলের মধ্যে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন একদল দুর্ভিক্ষ পীড়িত, নিরন্ন নরনারী। 'কিন্তু কিছুই করার ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে সমস্ত রকম গণসংগঠনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল......... গণপরিষদ নেতা শচীন্দ্রলাল সিংহ, জনমঙ্গল সমিতির নেতা বীরেন দত্ত সহ অনেককে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল ..... সর্বোপরি রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত গণভিত্তিক কোন সংগঠনই গড়ে উঠেনি'[১৮] সেদিনের ত্রিপুরা রাজ্যে। বিদগ্ধ নাগরিকগণ যে কোন বিদ্রোহীই দেখতে পাননি রিয়াং মিছিলের মধ্যে তার কারণ ছিল নেতৃস্থানীয় বিদ্রোহীরা কেউ ছিলেন না দলে দলে ধৃত রিয়াং প্রজাদের মধ্যে। তাইন্দারায় রিয়াং, শ্রীকান্ত, মুকুন্দ, তবিরাম, শিলারায়, শক্তিরায়, মাংছল, হান্দাইসিং, রামবাহাদুর, দৈন্যরাম, ফ্রেকা, রূপাইকা

বা কাঁঠাল বায, চন্দ্রমণি, খুশীকৃষ্ণ প্রভৃতি বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ ধীবে ধীবে একা বা দু চ বজন একত্রে ধবা পড়ে। কেউ বা সংঘর্ষে নিহত হয, আবাব কেউ বা কাবাগাবে মাবা যায। কেউ শাস্তি ভোগ কবে যাট বা সত্তবেব দশকেও জীবিত ছিল বর্তমানে পবলোকে পাডি জমিয়েছে।

ধৃত বন্দীদেব সংখ্যা নিয়ে মত পার্থক্য আছে। তবে একথা বলা যেতে পাবে যে বেশ বিবাটসংখ্যক ধৃত নবনাবী ও শিশুদেব বাজধানীতে নিয়ে আসা হয়েছিল এই সমস্ত আসামীদেব জিজ্ঞাসাবাদ কবে আটক বাখা বা মুক্তি দেওযাব ভাব ন্যস্ত হয়েছিল লেং জিতেন্দ্রমোহন দেববর্মা ও মেজব কুমাব ব্রজলাল দেববর্মাব উপব। কার্যত জিতেন ঠাকুবেব নিদেশেব উপব আসামীদেব মুক্তি বা আটক থাকা নির্ভব কবত। মাত্র কয়েকজন ছাডা বাকী সকলকেই মুক্তি দেওয়া হয কয়েকদিনেব মধ্যে। তাব পূর্বে প্রত্যেক বিয়াংকে মাথা ন্যাডা কবে, উপবাতধাবণ কবান হয এবং স্বীয ধর্ম পবিত্যাগ কবিয়ে বাজগুরু বা বাজগুরু বংশীয গুরু দ্বাবা জোব কবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত কবা হয মহাবাজ বীবচন্দ্রেব কাঁধে চাপা জাতি আন্দোলনেব ভূত তাব নিম্নতন চতুর্থ পুরুষেব কাঁধেও সফলভাবেই চেপে বসেছিল দেখা যাচ্ছে। অনিচ্ছায ধর্মান্তকবণ খাদ্যাভাসেব উপব অনিযন্ত্রিত নিষেধাজ্ঞা মানুষকে বৈবী কবে তুলেছিল। কিন্তু বাজসবকাব এত বড বকমেব অভ্যুত্থানেব পবেও এই মানবিক দিকটাব গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি কবতে পেবেছিলেন বলে মনে হয না। তাহলে জাতি আন্দোলনেব বীতি, ৪৩-৪৪ সালে অনুষ্ঠিত হত না। বতনমণিব স্ত্রী-পুত্রদেবও ছেডে দেওযা হল। এইভাবে প্রচুব ক্ষয ক্ষতিব বিনিময়ে বিযাং বিদ্রোহ বা আন্দোলন সমাপ্ত হল।

পাদটীকা

১।	Sen Tripura	Sen Tripura in Transition Page 13,
২।	Bhattacharya Bani Kantha	Tripura Administration Era of Modernisation Delhi, 1986, Page 201
৩।	Sen Tripura	Ibid Page 13
৪।	Ibid	Page 13
৫।	Dutta and Banerjee (ed)	Rajgi Tripurar Sarkari Bangla, Agartala 1976, Page 106
৬।	Ibid,	Page 107
৭।	Das Gupta Tarit Mohan	Ratan Manir Gan O Reang bidroheradhyatmik Patabhumi, Gomati, Sarad Sankalan 1976, Page 7
৮।	Tripura State Gazettee Sankalan, Agartala 1971, Page 420	
৯।	Ibid	Page 415
১০।	Sen Tripura	Ibid, Page 15

১১। Rajgı Trıpurar, Sarkari Bangla, opcit, Page 101
১২। Sen Tripura, opcıt : page 15
১৩। Ibid : Page 15.
১৪। Jıban Chakraborty : Tripura Tiresh Theke Ashi Agartala 1983 Page 18-19.
১৫। জীবন চক্রবর্তী ঃ ত্রিপুরা ত্রিশ থেকে আশি, পৃঃ ১৯
১৭। দেববর্মা মণিময় ঃ বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমনি, পৃঃ
১৮। দাশগুপ্ত তড়িৎ মোহন ঃ রতনমণি ও রিয়াং বিদ্রোহ গোমতী, ১৫/১০/৭৪ ইং পৃঃ ১২
১৯। সেন ত্রিপুরা ঃ Trıpura in Transıstıon, পৃঃ ১৭
২০। দৈনিক সংবাদ ঃ ১৮/১০/৭৩ ইং
২১। দাশগুপ্ত তড়িৎ মোহন ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৩
২২। সেন ত্রিপুরা ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৭
২৩। ঐ ঃপৃঃ ১৮
২৪। দাশগুপ্ত তড়িৎ মোহন ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৫
২৫। সেন ত্রিপুরা, পূর্বে উল্লিখিত, ঃ পৃঃ ১৮
২৬। দত্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঃ ত্রিপুরায় রিয়াং বিদ্রোহ, উদিতি বিশেষ সংখ্যা পৃঃ ২২৪
২৭। সেন ত্রিপুরা ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৮
২৮। জীবন চক্রবর্তী ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ২০-২১
২৯। দৈনিক সংবাদ ঃ ১৮/১০/৭৩ ইং

বীরবিক্রম ও রবীন্দ্রনাথ

ত্রিপুরার তিন পুরুষের শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ যিনি বীরচন্দ্র মাণিক্য থেকে শুরু করে তাঁর পৌত্র বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের কাল অবধি ত্রিপুরার শাসকদের একান্ত আপন জন বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে ত্রিপুর রাজবংশের চতুর্থ পুরুষ মহারাজা বীরবিক্রমের সাক্ষাৎকার ঘটে তাঁর পিতৃব্য ব্রজেন্দ্র কিশোরের (লালুকর্ত্তা) আবাসগৃহে এক মনোরম রাস নৃত্যের আসরে। সময় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সন ১৩ ই ফাল্গুন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কালসন্ধ্যা। রবীন্দ্রনাথ সেবারে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে সপ্তম শেষবারের জন্য আগরতলা এসেছিলেন। ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চল সফর করার পরে কবি তাঁর প্রিয় রাজপুত্তুর লালু কর্তার আমন্ত্রণে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ১০ ই ফাল্গুন তারিখে আগরতলায় পদার্পন করেছিলেন। আগরতলাতেই ১৩ ই ফাল্গুন তাঁর সঙ্গে নতুন ত্রিপুরাধীশের পরিচয় হয়।

বীরবিক্রম তখনও নাবালক, বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। তিনি সে সময়ে স্থানান্তরে ছিলেন কিন্তু কবির আগমন সংবাদ পেয়ে কবি সন্দর্শনে' আগরতলায় এসেছেন'' মহারাজের পিতৃব্য লালু কর্তার বাড়ীতে কবিকে আপ্যায়িত করার জন্য রাজ অন্তপুরিকারা রাস নৃত্যগীতাদি প্রদর্শনের আয়োজন করেন, সেখানেই মহারাজ কবি সন্দর্শনে হাজির হলেন। এখানেই প্রৌঢ় কবির সঙ্গে কিশোর বীরবিক্রমের প্রথম সাক্ষাৎকার ও আলোচনা। ''সেদিন কবি মহারাজের সঙ্গে 'রাজমালা'ও 'গীতচন্দ্রোদয়' সম্পাদনার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেন। ত্রিপুরার সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির প্রাসাদাদি ও প্রত্নতাত্বিক বিষয়টি সংরক্ষণ'' করতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৩১খ্রীঃ) কবির ৭০তম জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে এক শিল্প প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা হয়। সেকালে কলকাতার সুধি বৃন্দের মধ্যে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, পার্সি ব্রাউন, আচার্য নন্দলাল বসু, প্রফুল্ল কুমাব ঠাকুর, অমল হোম, ডাঃ ষ্টেলা কামরিচ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, ঐ সভার উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে কবির পুরুষানুক্রমিক অন্তরঙ্গতা ও বীরবিক্রমের রবীন্দ্র ভক্তির কথা স্মরণ করে জন্মজয়ন্তী উৎসবের অন্যতম প্রতিনিধি

ও কলকাতার মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহারাজ বীরবিক্রমকে প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রণ জানান। মহারাজ সানন্দে ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে উৎসবে যোগদান করেন এবং উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে 'ত্রিপুরার কবি' রূপে অর্ঘ প্রদান করেন।" আপনারা আমাকে এই মহাযজ্ঞের হোতৃপদে বরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জগৎপূজ্য বিশ্বকবির সম্বর্ধনার কোনো অঙ্গের নেতৃত্ব করিতে আমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্কোচ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তথাপি কবির সহিত ত্রিপুরা রাজপরিবারের যে চিরপ্রীতির সম্বন্ধ বিদ্যামান আছে তাহাই আজ আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। পূর্ণ গৌরবমন্ডিত রবির ভাস্বর দীপ্তির ঐশ্বর্য্যের প্রতি আজ আমার লক্ষ্য নাই। আমি আপনাদিগের আহ্বানে আমার পিতামহ প্রপিতামহের স্নেহপরায়ণ বন্ধু - আমাদিগের বিশ্বজয়ী অন্তরঙ্গের জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত মনে করিতেছি। দরিদ্র সুদামা ব্রাহ্মণের সাহসে আজ আমি বলীয়ান।.........

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

শিল্পপ্রিয় ত্রিপুরা রাজবংশের উপর কবির প্রভাব সামান্য নহে। পক্ষান্তরে গিরিনির্ঝরিণী শোভিতা, বনপুষ্পভূষিতা, শ্যামলা পার্বতী ত্রিপুরার স্বভাব সৌন্দর্য্য, গোবিন্দমাণিক্য প্রমুখ আমার পূর্বপুরুষগণের কীর্তি কলাপ, ত্রিপুরার সাহিত্য চর্চচা সঙ্গীত, নৃত্যকলা চিত্র ও বয়ন শিল্প মহাকবিকে আকৃষ্ট করিয়াছে ইহাতে ত্রিপুরাবাসী গৌররান্বিত।

আপনারা ক্ষমা করিবেন, আমি স্বার্থপরের ন্যায় মহাকবির সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধেরই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি, ভারতের কবি বিশ্বকবি- আমি তাঁহাকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘপ্রদান করিতেছি।"[১] অনুষ্ঠানে আগের দিন মহারাজের নির্দেশে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয় জোড়াসাঁকোতে কবিভবনে গিয়ে কবিকে লিখিত ভাষণটি পড়ে নিয়েছিলেন। ভাষণটি শুনে কবি খুবই প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন-"বেশ হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। উত্তর পুরুষের মনে বেঁচে থাকবার কামনা মানব মনেরই স্বভাব ধর্ম্ম। মহারাজকে বলবে ওঁর লেখা দেখে অতীতের অনেক সুখস্মৃতি আজ আমার মনে পড়ছে। ত্রিপুরার সুখ সৌভাগ্য ও মঙ্গল কামনা আমি নিরন্তর করি।"[২]

সভাস্থলে ভাষণাদির পরে বীরবিক্রম কবিকে সঙ্গে নিয়ে প্রদর্শনী প্রাঙ্গনে এসে মেলার দ্বারোঘাটন করেন এবং প্রদর্শনী ঘুরে ঘুরে দেখেন। সেখানে কবির অঙ্কিত চিত্র, প্রকাশিত রচনাবলী, মূল পান্ডুলিপি, কবিজীবনের নানা সম্মান ও উপহার প্রাপ্ত দ্রব্যের সঙ্গে কবি কর্তৃক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে লেখা প্রথম পত্র, রাধাকিশোব মাণিক্যকে লেখা কয়েকটি পত্র, ত্রিপুরার রকমারী চারু ও কারুশিল্প সামগ্রী কবির ও অন্যান্য দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই জন্মজয়ন্তী উৎসবে কবির সঙ্গে বীর বিক্রমের পুণর্মিলন হল। কবি ত্রিপুরা রাজকে পছন্দ করতেন এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে বিশ্বভারতী পরিদর্শনের জন্য রাজাকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু উভয়পক্ষের কর্মব্যস্ততার ফলে সহজে সুযোগ হয়ে উঠেনি। শেষে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ত্রিপুরার সুযোগ্য সন্তান সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার মাধ্যমে যোগাযোগ পাকা হল। রাজার কাছে কবির আমন্ত্রণ এল এবং রাজা আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২২শে পৌষ (৭ ই জানুয়ারী ১৯৩৯ খ্রীঃ) বীরবিক্রম মহারাজ শান্তিনিকেতনে গমন করেন। তাকে 'উত্তরায়নে' উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান কবি এবং সেখানেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা ব্যবস্থা করেন। মধ্যাহ্নে উত্তরায়ণের হলঘরে রাজা সপারিষদ ভোজনে বসলে

কবি নিকটে একটি বেতের তৈরী হেলান দেয়া আসনে বসে তাদের খোশগল্পে আপ্যায়িত করেন। পরিবেশিত খাদ্য দ্রব্যাদি অনেক শ্বেত পাথরের বাটীর মধ্যে দেয়া হয়েছিল, কেবলমাত্র সোমেন দেববর্মা ও দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সম্মুখে শ্বেত পাথরের থালা ও বাটীর মধ্যে দু-খানা কাল পাথরেব বাটী ছিল। ঐ কাল পাথরের বাটীগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবি পরিহাস করে বললেন-" ঐ কালো মাণিকেরা কি সমধর্ম্মী বর্ণ খুঁজবার দুর্বলতা এখনো এড়াতে পারেনি। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট হযে উঠতেই আমবা দুজনে স্ব-স্ব বর্ণ সম্বন্ধে সপ্রতিভ হয়ে উঠলাম।"- সবাই হাসলেন মহাবাজ বললেন, ত্রিপুরায কালো মাণিকেব দেশজ নাম 'আন্ধার মাণিক' অথবা' আধাঁর মাণিক। কবি আবার হাসলেন এবং সুস্পষ্ট স্বরে বললেন- "তা ত্রিপুরার মাণিকটির দেখছি রকম সকম আলাদা এ মাণিকেব হাত পা ও আছে আর কথা কয়।' ' সবাই হেসে আমোদে যোগদেন"

সেদিন ২২ শে পৌষ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ বিকেলে আম্রকুঞ্জে বীরবিক্রমকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পন্ডিত ক্ষিতি মোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয স্বস্তিবাচন ও ধূপদীপ মাল্য-চন্দনে অভ্যর্থনা করার পর আশ্রমবাসীদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন পাঠ করেন। মূল ভাষণ পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তিনি বলেন---"তোমাব সঙ্গে আজ আমার এই মিলন আব একদিনকার শুভসম্মিলনের আলোকেই উদ্দীপ্ত হয়ে দেখা দিলে। সে কথা আজ তোমাকে জানিয়ে দেবাব উপলক্ষ ঘটল বলে আমি আনন্দিত। তখন তোমার জন্ম হয়নি, আমি তখন বালক। একদা তোমাব স্বর্গগত প্রপিতামহ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাব মন্ত্রীকে পাঠিযে দিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কেবল আমাকে এই কথা জানাবার জন্য যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতে চান। দেশের কাছ থেকে এই আমি প্রথম সমাদর করেছিলুম। .. .." তাঁব মৃত্যু হোলো, .. . তাঁব অভাবে ত্রিপুবায় আমার যে সৌহার্দ্যের আসন শূন্য হোলো মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য অবিলম্বে আমাকে সেখানে আহ্বান কবে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সমাদর পেয়েছিলেন তা দুর্লভ। আজ একথা গর্ব করে তোমাকে বলবার অধিকাব আমার হয়েছে যে ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত, তাঁকে তাঁর অনতিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্তে বন্ধুভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে ত্রিপুবা রাজবংশ গৌরব লাভ করেছেন। তেমন গৌরব বর্তমানে ভারতবর্ষের কোনো রাজকুল আজ পর্যন্ত পান নি। ..... যে সংস্কৃতি, যে চিত্তোৎকর্ষ দেশের সকলের চেয়ে বড় মানসিক সম্পদ, একদা বাজারা তাকে রাজৈশ্বর্য্যের প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য করতেন, তোমার পিতামহেবা সে কথা মনে মনে জানতেন। এই সংস্কৃতির সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল এবং সে সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য ছিল। আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখস্মৃতির দক্ষিণ সমীরণ তুমি বহন করে এনেছ। আজ তুমি বর্তমানে দিনকে সেই অতীতের অর্ঘ্য এনে দিয়েছে, এই উপলক্ষে তুমি আমার সিগ্ধ হৃদয়ের সেই দান গ্রহণ করো যা তোমার পিতামহদের অর্পণ করেছিলুম আর গ্রহণ করো আমার সর্বান্তকরণের আশীর্বাদ।"[২]

বিশ্বভারতীয় অবস্থান কালে বীরবিক্রমকে বিশ্বভারতীয় বিভিন্ন বিভাগ এবং শ্রীনিকেতন ঘুরিয়ে দেখান হয়। মহারাজ অধ্যাপকদের সঙ্গে মিলিত হন। গ্রন্থশালায় চৈনিক গ্রন্থ সংগ্রহ ও কবিকে দেশ বিদেশে প্রদত্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার রাশি রাশি নিদর্শন দেখে বীরবিক্রম অতীব আনন্দলাভ করেন। আচার্য্য নন্দলাল কলাভবনে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। তাঁর সম্মানে 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়েছিল। সে সময়ে উত্তরায়নে 'তাসের দেশ' এর রিহার্সাল চলছিল। সোমেন্দ্র দেববর্মা মহারাজের সম্মানে 'তাসেব দেশ' অভিনয় করার প্রয়াসী হলে রবীন্দ্রনাথ রাজী

হননি।[৬] অভিনয় শেষে কবি মহারাজের সঙ্গে বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত ভবনের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। সঙ্গীত ভবনে একটি বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের উদ্দেশ্য মহারাজ ২০,০০০ টাকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি প্রতিশ্রুতিতে কবির নিকট ব্যক্ত করেছিলেন যে টাকাটা ২/৩ কিস্তিতে দেয়া হবে। চলতি বাজেটের চাকলা রোশনাবাদের মোট অংকের অনুপাতে আংশিক বরাদ্দের কথা রবীন্দ্রনাথকে জানান হয়। টাকা রাজার প্রতিশ্রুতি মত কিস্তি করে শান্তিনিকেতনে পাঠান হয়েছিল। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর পত্রে জানা যায় -"৫০০০ টাকা out of twenty thousands এ বরাদ্দ হয়েছে জেনে সে খবর কবিকে দিয়েছি। ... আশা করি আগামী বছর বাকী টাকা একসঙ্গে পাওয়া যাবে।"[৭]

কবির সঙ্গে সান্ধ্য আলোচনাতে অতীতে ত্রিপুরার আর্থিক সাহায্যের কথা উঠে। আমরা জানি রাধাকিশোর মাণিক্য বোলপুর ব্রহ্ম্মা চার্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এককালীন ৫০,০০০ টাকা দান করেছিলেন। আগরতলা কলেজে বন্ধ হয়ে গেলে কলেজের মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বোলপুর বিদ্যালয়ে পাঠান হয়েছিল। সরকারী বৃত্তি দিয়ে ত্রিপুবার ছাত্রদের শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠান হত। বোলপুর বিদ্যালয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তিরিত হলে ত্রিপুরা দরবার থেকে মাসিক ১০০০ টাকা অর্থ সাহায্য পাঠান হত। মহাযুদ্ধের প্রভাবে সাময়িকভাবে ঐ বরাদ্দ সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। এবারে বীরবিক্রম কিশোর তাঁর পিতামহ কর্তৃক মঞ্জুরী সম্পূর্ণ রূপে খুলে দিলেন, নির্দেশ দিলেন বকেয়া সহ মঞ্জুরী দান করতে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ খ্রীঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ৪৪/৭৬১ সেহাভুক্ত চিঠিতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ দত্তকে জানান-" Allow me thank you for your letter No.D.O 3569/E dated 3rd Pous 1350 T E. conveying the order of his highness the Maharaja Manikya Bahadur for the restoration of the annual grant to the visva Bharati to its original sanction of Rs1000/- as well as the further direction of His Highness for the payment of the arrear dues that have accumulated due to the annual grant having being unpaid at the reduced rate during last few years. I am pleased that His Highness has given his usual sympathetic considaration to the cause of visva Bharati and I request you to kindly convey my grateful thanks to him"[৮] তাবপর থেকে বিশ্বভারতী এই অনুদান পেয়ে যাচ্ছিল রীতিমত এবং স্বাধীনোত্তর কালে তা বন্ধ হয়ে যায়।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ, ত্রিপুরার ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। কবির ৮০ তম জন্মদিন। রোগশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ কবিকে সম্বর্ধনা জানাবার উদ্যোগ নিলেন বীরবিক্রম। একটি কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করা হল। স্থির হল প্রপিতামহ বীরচন্দ্র মাণিক্য তরুণ কবিকে যে রাজকীয় স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কবির জীবন সায়াহ্নে বীরচন্দ্রের প্রপৌত্র তাঁর রাজকীয় পদ্মমোহর সাক্ষর করে কবিকে শ্রদ্ধা জানাবেন রাজদরবারে। রবীন্দ্র জয়ন্তী বিশেষ দরবার অনুষ্ঠিত হল। সপারিষদ রাজা মিছিল করে দরবারে এলেন, পান্ডিতগণ বেদমন্ত্র ও স্বস্তি বচন পাঠ করল, তারপর মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর অভিভাষণ পাঠ করলেন—ত্রিপুরা রাজ্য কেন, ভারতে অন্য কোথাও সম্ভবতঃ রাজকীয় বিশেষ দরবারে এই প্রকার জয়ন্তী উৎসব সম্পাদিত হয় নাই। এই বিশিষ্টতা

অর্জন করা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় বলিয়া আমি মনে করি-(আমার জীবনে এখন অনেক দিন গিয়াছে যে সময়ে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র আমাকে সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ দেখাইয়া জীবন দিয়াছে। তাহার উপদেশপূর্ণ পত্রগুলি আমার অমূল্য সম্পদ।) আজ সেই রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মদিনে আমাদের দেশের রাজা রাজকীয়ভাবে জয়ন্তী উৎসব দরবারে অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি জানি রোগশয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথ যখন এই সংবাদ পাইবেন তখন তিনি কতদূর শান্তি লাভ করিবেন। মহারাজের এই শুভ অনুষ্ঠান আমাদের রাজ্যের মঙ্গল বহন করুক এই কামনা করিতেছি।''[১]

তারপর রাজার অনুমতিতে মুখ্যসচিব মহারাজের রোবকারী পাঠ করেন যার দ্বারা-''ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোক স্তম্ভ স্বরূপ'' কবি রবীন্দ্রনাথকে ''ভারত ভাস্কর'' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। নকীবগণের ঘোষণায় কবিবরের নাম সংযুক্ত সম্মান বিঘোষিত হল এবং ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত হল। ত্রিপুরার রাজলাঞ্ছন শোভিত, রাজ পদ্মমোহরে রাজ্যেশ্বরের বাংলায় সাক্ষরযুক্ত দরবারের ২৫২ ক্রমিক সংখ্যা রোবকারীর ঘোষণা।

''দরবাব বিষয় সমর বিজয়ী মহামদোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মা বাহাদুর কে সি এস আই। এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য।

নরপতেরা শোযং কাবকবর্গেষু প্রচরতু পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী। ইতি ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

যেহেতু বাংলার তথা সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশযেব অশীতিতম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত।

যেহেতু মর্ত্ত্যদেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ 'মর্ত্তোহমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম' ঋষিরা কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবতসত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগতকে দিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় অঙ্কুরোদগত সেই অমরজ্যেতি প্রকাশ ও রাজ্যের তদানীন্তন অধিশ্বর, এপক্ষের প্রপিতামহ গুণীবসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ কবায - তিনিই তরুণ কবিকে রাজ অভিনন্দনে অভিনন্দিত কবিয়া ছিলেন- যেহেতু এ পক্ষেব পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নবযুগ আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোব মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহাদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে, কাজে ও চিন্তাধারায এ বাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন-

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃ কার্য্যে বৃত হইবাব গৌরভ লাভ এ পক্ষেব হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্মবার্ষিক দিবসে ভারতীয কৃষ্টি ও সাধনার আলোক স্তম্ভস্বরূপ কবিববকে তদীয় পরিণত প্রতিভা যুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুব বাজের কর্ত্তব্য-

অতএব
এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত
কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে
'' ভারত ভাস্কর''
আখ্যায় ভূষিত করা যায় ঃ-
এবং
শ্রীভগবান তদীয় আশীবর্বাদে কবিবরকে সুস্থদেহে

শত বর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।”

আগরতলাতে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পরে কবির হস্তে উক্ত অভিনন্দন পত্র সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিদ ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তীকে 'রাজ খরিতা' শুভ্ররেশম বস্ত্র, স্বর্ণমুদ্রা ও নানা রকমের রাজ খান্দানী পোযাক সহ শান্তিনিকেতনে পাঠান হয়। এ ব্যাপারে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০শে বৈশাখ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পত্রে "রাজপুত্তুর" ব্রজেন্দ্র কিশোরকে জানিয়েছেন-" স্থির হয়েছে সন্ধ্যের দিকে মহারাজার রোবকারী বাবা মহাশয়কে দেওয়া হবে। ... বাবা মহাশয়কে এইভাবে সম্মান দেখান ত্রিপুরাধিপতির উপযুক্ত হয়েছে এবং আমাদের সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করেছে।" ৩০ শে বৈশাখ অপরাহ্নে ইনভ্যালিড চেয়ারে বাহিত হয়ে কবি উত্তরায়নের সভাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং ত্রিপুরেশ্বরের মানপত্র গ্রহণ করলেন এবং তাঁর কম্পিত হস্তে সাক্ষরিত টাইপ করা ভাষণ পাঠ করলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "ত্রিপুরার রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলাম আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও তাকে স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এরকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ। যেদিন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য একথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন যে তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই এক বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখেছেন সেদিন একথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ... কবি বালকের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যে ও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেল।... যে অপরিণত বয়স্ক কবির খ্যাতির রথ সম্পূর্ণ সংশয় সঙ্কুল ছিল তার সঙ্গে কোনো রাজত্বগৌরবের অধিকারী এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্য সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সেই রাজ বংশের সেই সম্মান মূর্ত্ত পদবী দ্বারা আমার স্বল্পবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে।... এ বংশের সকলের চেয়ে বড়গৌরব আজ যখন পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠল ঠিক সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীবর্বাদ করি এই মহাপূণ্যের ফল মহারাজের জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে। আজ আমার দেহ দুর্বল, আমার ক্ষীণ কণ্ঠ সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয়ধ্বনীতে কবিজীবনের অন্তিম ও শুভকামনা মিশ্রিত করে দিয়ে মহানৈশঃব্দের মধ্যে শান্তিলাভ করুক।" অনুষ্ঠানের শেষে সেদিনই অপরাহ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি টেলিগ্রাম আসে ব্রজেন্দ্র কিশোরের নিকট -" Father delighted with honour.will write soon himself stop glad to welcome your emissary" বস্তুতঃ এটিই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ত্রিপুরার রাজাদের শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও আশীর্বাদ কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও গবেষকগণ রবীন্দ্রনাথের এই পত্র উদ্ধার করতে পারেন নি।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে। বীরবিক্রম কিশোর সে সময়ে চেম্বার অব প্রিন্সেস এর স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং এ যোগদান করে বোম্বাই থেকে ব্যাঙ্গালোর ফিরছিলেন। পথিমধ্যে রায়চুর পেরিয়ে গুন্টাকলের কাছাকাছি এসে ভোরবেলা ২৩ শে শ্রাবণ তারিখে একটা ছোট স্টেশনে রেলগাড়ী থামে। সেখানেই সংবাদপত্র থেকে জানতে পারেন যে গত দিনে দ্বিপ্রহরে কবির দেহান্ত হয়েছে। ভ্রমণসঙ্গী দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্তকে মহারাজ বললেন -" আমি একটু আগে শুনিয়াছি, শুভ লগ্নেই ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে রবির উদয় হইয়াছিল।" বীরবিক্রমের

নির্দেশ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সব সরকারী অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদি লোকান্তরিত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে বন্ধ রাখবার জন্য রাজমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম পাঠান হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে শোকপালন করা হল। সরকারী ঘোষণা বেব হল ২৪শে শ্রাবণ ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে ৯নং মেমো দ্বারা-"অতীব শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে যে গত ২২শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা ১২-১০ মিনিট সময়ে কলিকাতা নগরীতে জগদ্বরেণ্য, অমব ঋষি, বঙ্গমাতার ববপুত্র বিশ্বকবি মনীষী ডক্টর 'ভারত ভাস্কর' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয় মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে এবাজ্যেব ও জমিদাবীব অফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদি যাবতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান এক দিবস বন্ধ রাখিবার জন্য শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতএব সদরের অফিস আদালত ও বিদ্যালযাদি আগামীকল্য ২৫ শে শ্রাবণ রবিবার এবং মফঃস্বলস্থ অফিস আদালত ও বিদ্যালয়াদি এই আদেশ পূর্বাহ্নে প্রাপ্ত হইলে সেই দিবস এবং অপরাহ্নে প্রাপ্ত হইলে তৎপর দিবস বন্ধ থাকিবে, ইতি সন১৩৫১ ত্রিং, তারিখ ২৪শে শ্রাবণ।"[১৫] প্রপিতামহ থেকে প্রপৌত্র পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের সম্পর্ক তাঁর মৃত্যুতে সমাপ্ত হল।

-ঃ তথ্যনির্দেশ ঃ-

১। গোবিন্দ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা, আগরতলা, ১৩৬৮, পৃঃ২০৩ (পরে চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় ঃ রাজগী)

২। ঐ ঃ পৃঃ ১৩৫।

৩। ঐ ঃ পৃঃ১৩৭।

৪। ঐ ঃ পৃ ঃ১৩৯।

৫। ঐ ঃ পৃ ১৪০-৪১ ও প্রবাসী, মাঘ সংখ্যা ১৩৪৫।

৬। চৌধুরী বিকচ ঃ রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা আগরতলা ২০০০,পৃ ১০১(বিস্তৃত বিবরণীর জন্য রবিতীর্থ স্মৃতি শৈলেশ চন্দ্র দেববর্মাঃ রবীন্দ্র নাথ ও ত্রিপুরা দ্রষ্টব্য।

৭। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা ঃ পৃঃ ১৪২।

৮। ঐ ঃ পৃঃ১৪৩।

৯। ঐ ঃ পৃঃ ১৫০।

১০। দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ রাজগী ত্রিপুবাব সবকারী বাংলা, আগরতলা, ১৯৭৬ পৃ ঃ৭৮

১১। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা ঃ পৃঃ ১৫১।

১২। ঐ ঃ পৃ ১৫২-১৫৩।

১৩। ঐ ঃ পৃ ঃ১৫৪।

১৪। ঐ ঃ পৃঃ ১৫৫।

১৫। রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা ঃ পৃ ঃ ২৩৯।

বীরবিক্রম ঃ জমিদার

ত্রিপুরার রাজাদের একটি কামধেনু ছিল। তা হল ত্রিপুরা রাজ্যের সংলগ্ন ব্রিটিশ ত্রিপুরা জেলা, নোয়াখালী এবং শ্রীহট্ট জেলার আনুমানিক ৬৯২ বর্গমাইল[১]। এলাকার জমিদারী চাকলা রোশনাবাদ যার জন্য ত্রিপুরার রাজাগণ ব্রিটিশ প্রজারূপে গণ্য হতেন। এই জমিদারী" কল্যাণ মাণিক্যের বংশধর দিগের অবিভক্ত সাধারণ সম্পতি। বংশের মধ্যে একব্যক্তি ম্যানেজার স্বরূপ ইহার অধিকারী (রাজা) হইয়া থাকেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ জীবিকা নির্বাহের জন্য বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞাতিবর্গের জীবিকা নির্বাহের বৃত্তির প্রতি ত্রিপুর নৃপতিগণের সর্বদাই উদাসিন্য দৃষ্ট হয়।"[২] কৈলাসচন্দ্রের এই উক্তির সত্যতা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে আদালতে প্রদত্ত বীরচন্দ্র মাণিক্যের এফিডেবিট যা তিনি নবদ্বীপ চন্দ্র কর্তৃক মোকদ্দমায় আদালতে পেশ করেছিলেন। আদালতকে তিনি জানিয়েছেন যে সে সময়ে নীলকৃষ্ণ ঠাকুর ৪০০ টাকা, সুরেশকৃষ্ণ ১২৪ টাকা, শিব চন্দ্র ঠাকুর ১২৫ টাকা চক্রধবজ ঠাকুর ২৫০ টাকা, মাধব চন্দ্র ঠাকুর ১০০ এবং যাদবচন্দ্র ঠাকুব ১০০ টাকা হারে মাসিক বৃত্তি পেতেন।[৩] জমিদারীর আয় রাজ্যে আঁয়ের চেয়ে বেশী ছিল। সেখানকার প্রশাসনিক খরচ ব্রিটিশ রাজকে দেয় কর, অতি সামান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় কবে বাকী অর্থ ত্রিপুবার বাজকোষে জমা পড়ত ট্রেজারী চালান মারফৎ। বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে দেখা যায় যে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ নির্মাণ কালে রাধাকিশোর মাণিক্য যে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন বীরেন্দ্র কিশোর সেই ধার সুদে-আসলে ১৩২৭ ত্রিপুরাব্দে চাকলা রোশনাবাদের রাজস্ব থেকে শোধ করেন। কোন কোন বছরে অন্যখাতে করা ঋণও চাকলার রাজস্ব থেকে শোধ করা হয়েছিল। নিজ তহবিল নামক হেড রাজার নিজস্ব ব্যয়ের ভান্ডার। রাজ্যের বাজেটে প্রতিবছর ঐ খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হত। বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে রাজা এই অর্থ জমিদারীর আয় থেকে নিতেন। এমন কি অগ্রিম অর্থ নেয়া হয়েছে এরূপ সাক্ষ্যও আছে। নিজ তহবিলে দেনা থাকলে বা বাজারে দেনা হলে তাও চাকলার আয় থেকে শোধ করা হত।[৪] এবারে আমরা চেষ্টা করি বীরবিক্রমের আমলে এই ব্যবস্থার কি কি পরিবর্তন হয়েছিল এবং প্রজামঙ্গলের জন্য বরাদ্দ অর্থ কতটুকু বেড়েছিল।

প্রজাসংযোগ ঃ প্রত্যক্ষভাবে শাসনভার গ্রহণ করার পূর্বে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বীরবিক্রম জমিদারীর প্রধান শাসন কেন্দ্র কুমিল্লা এসেছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু ঐ সময়ের

কোন বিশদ বিবরণী পাওয়া যায় না।[২] বীরবিক্রম সিংহাসনে আরোহণের পরে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে আগস্ট তারিখে কুমিল্লায় গমন করেন। সেখানে আঞ্জুমান ইসলামিয়া কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দন গ্রহণ করেন এবং খুব মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।[৩] কুমিল্লা ত্যাগ করার পূর্বে বীরবিক্রম শহরে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সহায়তা কল্পে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। যে সব প্রতিষ্ঠান সে সময়ে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল সেগুলি নিম্নরূপ ।

প্রতিষ্ঠানের নাম	সাহায্যের পরিমাণ
১। কুমিল্লা টাউন হল উন্নয়ন	ঃ ৮০০০ টাকা
২। টাউনের ত্রিপুবা ক্লাব	ঃ ৩৫০০ টাকা
৩। ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড	ঃ ১০,০০০টাকা
৪। সদর লোক্যাল বোর্ড	ঃ ৫০০ টাকা
৫। কুমিল্লা হাসপাতাল ভবন	ঃ ১৫০০০ টাকা
৬। অভয় আশ্রম হাসপাতাল	ঃ ১০০০০টাকা
৭। কুমিল্লা মধ্য ইংরেজী স্কুল গৃহভবন উন্নতি	ঃ ১০০০টাকা
৮। কুমিল্লা মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় ভবন উন্নতি	ঃ ১০০০ টাকা
৯। শাহসুজা মসজিদ ভবন সংস্কার	ঃ ১৫০০ টাকা
১০। বিধবা বিবাহ সহায়ক সমিতি	ঃ ১০০০টাকা
১১। তত্ত্বজ্ঞান সভা	ঃ ১০০০টাকা
১২। হিন্দু সভা	ঃ ১০০০টাকা
১৩। পোষ্টেল ক্লাব	ঃ ৫০০ টাকা
১৪। খাদিমল ইসলামিয়া মহাপ্রতিষ্ঠান	ঃ ৫০০টাকা
১৫। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জলযোগ	ঃ ২৮৫০ টাকা
১৬। অন্যান্য ক্ষুদ্রদান ও দেবালয়ের প্রণামী এবং শাহসুজা মসজিদে সিন্নি	ঃ ৬৫০ টাকা
	মোট ঃ ৬৩০০০ টাকা

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি বীরবিক্রম বিলোনিয়া থেকে রেলযোগে দক্ষিণ বিভাগের জমিদারীর সদর ফেনী নগবে পৌছেন দুপুর বেলা। পথে পথে প্রজারা গাড়ী থামিয়ে রাজাকে দর্শন করে ও প্রণামী দেয়। ফেনীতে সারাদিন নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠান হয়েছিল। রাজা ফেনী নগরের বাজারের নাম রাখেন বীরেন্দ্রগঞ্জ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাজাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে রাজা ৭২০০ টাকা দান করেন। তাঁর রাজত্বকালে আর কখনও জমিদারী পরিদর্শন করেছিলেন বলে কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

শাসন ঃ- জমিদারী প্রশানের জন্য ৪ টি প্রশাসনিক কেন্দ্র গঠিত হয়েছিল যথা- (১) মধ্যবিভাগ যায় মধ্যে ত্রিপুরা জেলার কোতোয়ালী, বুড়িচঙ্গ, চৌদ্দগ্রাম ও লাকসাম থানার সমস্তভূমি অন্তর্ভূক্ত ছিল। (২) উত্তর বিভাগ যায় মধ্যে ত্রিপুরা জেলার কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ও নবনগর থানার সমস্ত ভূমি অন্তর্ভূক্ত ছিল। উত্তর বিভাগের সদর দপ্তর ছিল মোগরা (গঙ্গানগর)। (৩)দক্ষিণ বিভাগ যার মধ্যে নোয়াখালী জেলার ফেনী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া থানার সমস্ত ভূমি অন্তভূক্ত ছিল।

দক্ষিণ বিভাগের সদর দপ্তর ফেনী নগরী। শ্রীমঙ্গল বিভাগ যার মধ্যে শ্রীহট্ট জেলার শ্রীমঙ্গল চনারুঘাট, মাধবপুর এবং পাথার কান্দি থানার সমস্ত ভূমি অর্ন্তভূক্ত ছিল। শ্রীমঙ্গল বিভাগের সদর দপ্তর ছিল শ্রীমঙ্গল।[৯] জমিদারী এলাকার শাসন কার্য্য প্রথমে দেওয়ান শাসনের অধীনে ১ জন ম্যানেজার, ১ জন সাব ম্যানেজার ও তিনজন সহকারী ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত হত। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় ম্যানেজার ১ জন, ডেপুটি ম্যানেজার ১ জন, সহকারী ম্যানেজার ৩ জন এবং ১জন সাবম্যানেজার প্রশাসন চালাচ্ছে,।[১০] ১৯৪৩-৪৬ সালে মহারাজের চিফ সেক্রেটারীর অধীনে ১ জন ম্যানেজার,১জন ডেপুটি ম্যানেজার ও তিনজন এসিটেন্ট ম্যানেজার কুমিল্লা, মোগরা, ফেনী ও শ্রীমঙ্গল পোষ্টিং করা হয়েছিল।[১১]

প্রজাকল্যাণ : জমিদারীতে প্রজার কল্যাণের জন্য যে সব উন্নয়নমূলক কাজ করা হত তার মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা, ডিসপেনসারী স্থাপন ও পরিচালনা এবং পূর্ত কর্মের মধ্যে রাস্তাঘাট নির্মান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১। **শিক্ষা :** ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দের ৫৫মেমো দ্বারা অর্থাৎ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে চাকলা রোশনাবাদে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা করা হয়। এই মেমোতে দেখা যায় চাকলায় শ্রী শ্রীযুতের সরকার পাঠশালা নামে দক্ষিণ বিভাগে ৮ টি, মধ্যে বিভাগে ১৩ টি এবং উত্তর বিভাগে ৪ টি পাঠাশালা তৈরী করা হয় অর্থাৎ মোট ২৫ টি পাঠশালা চালু করা হয়। ঐ পাঠশালাগুলির জন্য বাৎসরিক ব্যয় ধরা হয় ২২৫০ টাকা। শিক্ষকদের বেতন ধার্য্য হয় সাথে ৫ টাকা । রাজ্যের ভেতরে শিক্ষা অবৈতনিক থাকলেও জমিদারীতে বেতন দিয়ে পড়ুয়াদের পড়তে হত। নিম্ন শ্রেণীর মাসে ১ আনা, মধ্য শ্রেণী ২ আনা এবং উচ্চশ্রেণীর ৪ আনা ফি মাসে ধার্য হয়েছিল। মোট ২০ জন ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়তে দেওয়া হত।[১২] বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে ১৯০৫-১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাম্য পাঠশালা কম নিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ২১ টিতে। ১৪টি অন্য পাঠাশালাতে Grant in aid দেওয়া হত এবং কুমিল্লা Victoria College-কে ৫০০টাকা অনুদান, কুমিল্লা জেলা স্কুলের ৪ জন ছাত্র ও অন্য ৭জন পাঠশালার ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হয় মোট ৭৬২ টাকা।[১৩] বীরবিক্রমের আমলে পাঠশালায় সংখ্যা কমেছিল কি বেড়েছিল তা প্রশাসনিক বিবরণীগুলিতে উল্লেখ নেই তবে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের একটা চিত্র অঙ্কন করা যেতে পারে।

বর্ষ	শিক্ষাখাতে ব্যয় টাকা
১৩৩৩ত্রিং (১৯২৩-২৪খৃঃ)	১১৬৮৫
১৩৩৪ ত্রিং (১৯২৪-২৫খৃঃ)	৯৩৮৭
১৩৩৫ ত্রিং (১৯২৫-২৬খৃঃ)	১০২২৮
১৩৩৬ ত্রিং (১৯২৬-২৭খৃঃ)	১১০২৯
১৩৩৭ ত্রিং (১৯২৭-২৮খৃঃ)	১০৮৮৪
১৩৩৮ ত্রিং (১৯২৮-২৯খৃঃ)	১০৯৯২
১৩৩৯ ত্রিং (১৯২৯-৩০খৃঃ)	১১৩৫৬
১৩৪০ ত্রিং (১৯৩০-৩১খৃঃ)	বিবরণী পাওয়া যায়নি, খারাপ বছর , বন্যা প্রভৃতি।
১৩৪১ ত্রিং (১৯৩১-৩২খৃঃ)	১৩৫৪৬

১৩৪২ ত্রিং ১৩৪৬ত্রিং (১৯৩২ ১৯৩৬ইং) বিববণী পাওয়া যায়নি।
১৩৪৭ ত্রিং ১৩৪৯ত্রি, (১৯৩৬ ১৯৩৯ইং) বিববণী পাওয়া যায়নি।
১৩৫০ ত্রিং- ১৩৫২ত্রি, (১৯৪০ ১৯৪৩ ইং) বিস্তৃত বিববণী পাওয়া যায়নি।
১৩৫৩ ত্রিং-১৩৫ ত্রিং (১৯৪৩ ১৯৪৬ ইং) বিস্তৃত বিববণী পাওয়া যায়নি।

পূবে বর্ণিত সবকাবী ও বেসবকাবী পাঠশালা ছাড়াও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ত্রিপুবা বাজসবকাব থেকে নিয়মিত অনুদান পেত। বীববিক্রমেব পূর্বে ঐ অনুদানগুলিব পবিমাণ কত ছিল তা আমবা জানতে পাবছিনা। কিন্তু ১৩৪৮ ত্রিপুবাব্দে অর্থাৎ ১৯৩৮খ্রীষ্টাব্দে বিট্রিশ সবকাব শিক্ষা ক্ষেত্রে কব ধার্য্য কবায় বাজ সবকাবেব নিজেদেব সবকাবী বিদ্যালয়ে অনুদান প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ববাদ্দ অর্থ কমাতে বাধ্য হয়ে বার্ষিক নিম্নরূপ অর্থ সাহায্য ববাদ্দ কবেছিল বিশ্বভাবতী বোলপুব ৪০০০ টাকা, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বোলপুব ১০০০টাকা কুমিল্লা ভিক্টোবিয়া কলেজ ১২০০টাকা, ফেনী কলেজ ৬০০টাকা, পূর্ব বঙ্গ সাবস্বত সমাজ ৪০০ টাকা বোবা ও কালা বিদ্যালয় ঢাকা -১২০ টাকা, বিধবা আশ্রম ঢাকা ১০০টাকা, ত্রিপুবাহিত সাধনাসভা ১৫০ টাকা, কন্যা শিক্ষা বিদ্যালয় কুমিল্লা ১২০ টাকা, ছাত্রবৃত্তি ২ টি কুমিল্লা ভিক্টোবিয়া কলেজ ৩৬০টাকা। কিন্তু ১৩৫৩ -১৩৫৫ ত্রিপুবাব্দেব (১৯৪৩ ১৯৪৬খৃঃ) প্রশাসনিক বিববণীতে বলা হয়েছে যে উপবোক্ত শিক্ষা কব বসাবাব প্রেক্ষিতে জমিদাবীব প্রাইমাবী, সেকেন্ডাবী স্কুলেব অনুদান কমাতে বাজসবকাব বাধ্য হয়। কিন্তু শিক্ষায় উৎসাহ দানেব বীতিব মান্যতা বক্ষা কবতে নিম্নরূপ অনুদান দেওয়া হয়।[1] ব্রহ্মচর্চাশ্রম বোলপুব ১০০০ টাকা, কুমিল্লা ভিক্টোবিয়া কলেজ ১২০০ টাকা, ফেনী কলেজ ৬০০টাকা, পূর্ববঙ্গ সাবস্বত সমাজ ঢাকা৪০০ টাকা বোবা ও বধিব বিদ্যালয় ঢাকা ১২০ টাকা,বিধবাশ্রম ঢাকা ১০০টাকা , ত্রিপুবা হিতসাধনী সভা ১৫০ টাকা ১৫ টাকা মূল্যেব ২টি স্টাইপেন্ড, ভিক্টোবিয়া কলেজ কুমিল্লা ৩৬০ টাকা।

এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপাব পবিস্কাব বোঝা গেল যে, যেসব সাহায্য ত্রিপুবাব বাজাগণ বিশ্বভাবতীকে, ব্রহ্মচর্চাশ্রমকে এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে চাকলা বোশনাবাদেব কোষ থেকে খবচ কবা হয়েছিল। বাজ্যেব অধিবাসীদেব এব্যাপাবে গৌবব কবাব কিছুই নেই কাবণ তাদেব দেয় কব থেকে বাজাগণ ঐ সব দান কবেন নি। চাকলাব বাজস্ব বা আয় বাজ্যেব ব্যাপাবে খবচ কবা ওঁদেব এরূপ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে স্বাধীনতাব পবে ১৫ই অগাস্ট মহাবাণী কাঞ্চনপ্রভা ১৫ ই আগস্টেব ভাষণে আশ্বাস দেন যে তিনি বাজ্যে বিদ্যালয়েব সংখ্যা বৃদ্ধি কববেন এবং চাকলা থেকে একলক্ষ টাকা এনে আগবতলা কলেজ শীঘ্রই শুরু কববেন। কিন্তু অল্পকালেব মধ্যেই আমাদেব আশা ভঙ্গ হয় কাবণ ভাবত সবকাবেব মত পাকিস্তান সবকাবও জমিদাবী বিলুপ্ত কবে।

২। স্বাস্থ্য ঃ ১৯০৮ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেব প্রশাসনিক বিববণীতে বলা হয়েছে যে Cumming এবং Survey and Settlement of chakla Roshnabad প্রকাশেব পবে চাকলাতে প্রজাদেব চিকিৎসাব ব্যবস্থাব সূচনা হয়। ১৯০২ সালে ২টি, ১৯০৩সালে ১টি এবং ১৯০৪ সালে ২ টি ডিসপেনসাবী স্থাপন কবা হয়। এই ৫কেন্দ্রটি দাতব্য চিকিৎসালয়েব ব্যয় বাজ সবকাব বহন কবত। এছাড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড স্থাপিত আবো ৭টি ডিসপেনসাবীব মাসিক অনুদান ৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা অবধি দেবাব ব্যবস্থা কবা হয়েছিল।[2] বীবেন্দ্র কিশোবেব আমলে চিকিৎসালয়েব সংখ্যা

বৃদ্ধি পায়নি। বীরবিক্রমের আমলে ১৯৪৩-১৯৪৬ সালের প্রশাসনিক বিবরণীতে বলা হয়েছে কুমিল্লা, সুখচাইল, মোগরা, শুভপুর, ও মনতলাতে স্থাপিত ৫ টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার রাজসরকার বহন করত এবং সেজন্য ১৩৫৫ ত্রিং সনে প্রায় ৮০০০টাকা খরচ হয়েছিল। এছাড়া নিম্নলিখিত চিকিৎসালয়গুলিতে রাজসরকার প্রত্যেক বৎসরে অনুদান দিয়েছিল। চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল ও হসপিটাল ১০০০্ টাকা। কুমিল্লা সদর হাসপাতাল ৩৬০্ টাকা,চৌদ্দগ্রাম ডি বি ডিসপেনসারী ১২০্ টাকা, কসবা ডি বি ডিসপেনসারী ৪০ টাকা, ফেনীদাতব্য চিকিৎসালয় ১২০ টাকা, ছাগল নাইয়া ডি.বি ডিসপেনসারী ৮০্ টাকা, মঙ্গল কান্দি ডি.বি ডিসপেনসারী ৮০্ টাকা,রাজার বাজার জি বি. ডিসপেনসারী ২২০ টাকা, বুড়িচঙ্গ ডি.বি ডিসপেনসারী ৮০্ টাকা, নোয়াখালী বীরেন্দ্র কিশোর মহিলা হাসপাতাল ৮০্ টাকা, ফুলগাজী ডি বি ডিসপেনসারী ৪০্ টাকা, পরশুরাম ডি.বি. ডিসেপেনসারী ৬০্টাকা, মুন্সীর হাট ডি বি ডিসপেনসারী, ৬০্ টাকা, শ্রীমঙ্গল এল বি ডিসপেনসারী ১২৮্ টাকা, মাতৃসদন কলিকাতা ১২০্ টাকা, ঢাকা অনাথ আশ্রম ১২০্ টাকা এবং ব্রাহ্মণ বাড়িয়া দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮০্ টাকা।[১৮]

৩। **পূর্ত কর্মঃ** চাকলা রোশনাবাদের বাজেটে পূর্তকার্যে ব্যয়ের অংশ অন্যান্য খাতে ব্যয়ের তুলনায় বেশী দেখা যায়। পূর্ত ব্যয় এবং মামলা মোকদ্দমার খরচ একত্রে দেখানোর ফলে কেবল পূর্তকার্যে প্রতি বছর কত ব্যয় হয়েছিল জানা যাচ্ছে না। কোন কোন স্থানে রাস্তাঘাট নির্মিত হয়েছিল তার কোন বিবরণ বার্ষিক রিপোর্ট নেই। একসঙ্গে খরচ দেখানোর ফলে যে চিত্র আমরা পাই তা নিম্নরূপ পূর্ত ও আইন বিভাগীয় ব্যয় ঃ

বর্ষ	টাকা	বর্ষ	টাকা
১। ১৯২৩-২৪ ইং	৩৯৪,৩৯৯	৭)১৯২৯-৩০ ইং	৩৬৭৯১২
২। ১৯২৪-২৫ ইং	৩০৭৩৪৩	৮)১৯৩০-৩১ ইং	৩১৭৪২৭
৩। ১৯২৫-২৬ইং	৩৪৬১৫০	৯)১৯৪০-৪৩ ইং	বিবরণী নেই
৪। ১৯২৬-২৭ইং	৩৫৬৩০৩	১০)১৯৪৩-৪৪ইং	৫২৩০৩৪
৫। ১৯২৭-২৮ইং	৩৪২২০৭	১১)১০৪৪-৪৫ ইং	৪১৪০১৩
৬। ১৯২৮-২৯ইং	৩৬০০৮৮	১২)১৯৪৫-৪৬ ইং	৮৫২০৯১

চাকলার পূর্ত বিভাগের খরচ থেকে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ নির্মাণের খরচ বহন করার যে প্রথা বীরেন্দ্র কিশোর গ্রহণ করেছিলেন বীরবিক্রম কিশোরও সেই প্রথা বহাল রাখেন। ১৯৪৩-৪৬ ইং সালের প্রশাসনিক বিবরণী থেকে জানা যায় পূর্ত খাতের বরাদ্দ থেকে ৪,৩৫,২১৪ টাকা নীরমহল ও শিলং এর ত্রিপুরা ক্যাসেল নির্মাণের ব্যয় চাকলার আয় থেকে ব্যয় করা হয়েছিল।[১৯]

১৯২৩-২৪ সালে কুমিল্লা নগরীতে পরিশ্রুত পাণীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। সেজন্য কুমিল্লা চক বাজারের পূর্বদিকে পরিশ্রুত জল তৈরীর কারখানা তৈরী করা হয়। ঐ কাজে চাকলার রাজস্ব থেকে ২৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছিল।[২০]

৪) **নিজ তহবিল ঃ** নিজ তহবিলের আয়বৃদ্ধি করতে এবং অন্যান্য বাকী দেনা পরিশোধ করার জন্য বীরেন্দ্র কিশোর চাকলার কোষ ব্যবহারের যে রীতি প্রবর্তন করেছিলেন বীরবিক্রমও সেই রীতি বজায় রেখেছিলেন। ফলে ভ্রমণ ইত্যাদি বাহুল্য খরচের জন্য রাজ্যের বাজেটে হাত দেবার

দরকার হত না। চাকলার রাজস্ব থেকে বীরবিক্রম কি পরিমাণ অর্থ খরচ করেছিলেন নিম্নসারণী সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবে।[২২]

বর্ষ	নিজতহবিল টাকা	পুরাতন দেনা শোধ	রাজকোষে জমা
১৯২৩-২৪ ইং	২৩৮৩৭১	১৬৩৯৩৯	১,৮৫০০০
১৯২৪-২৫ ইং	-	৭০২৪৪	৫০০০০
১৯২৫-২৬ ইং	-	৫০০০০	..
১৯২৬-২৭ ইং	-	৪৯৯৯৯৯	৫,৫০০০০
১৯২৭-২৮ ইং		২৫০০০	৫০০০০
১৯২৮-২৯ ইং	-	..	৩৮০০০০
১৯২৯-৩০ ইং	-	৩০৬৬৮	..
১৯৩১-৩২ ইং	-	১০৪৯৭	১৫০০০০
১৯৩২-১৯৪৩ ইং বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা হয়নি।			
১৯৪৩-৪৪ ইং	১০,৪০,০০০	-	-
১৯৪৪-১৯৪৫	৪,৪০,০০০	-	-

উপরোক্ত খরচাদির বিবরণীতে অনেকগুলি বৎসরের বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি। যেমন ১৯৩০-৩১খ্রীঃ বিবরণীতে বলা হয়েছে যে সে বৎসর খুব খারাপ বৎসর বিশেষতঃ আর্থিক দিক থেকে। সে বছর খুব বৃষ্টি হয়েছিল এবং গোমতী নদীব বাঁধ ভেঙ্গে অকালে বন্যা হযে বিস্তূর্ন অঞ্চল ডুবে গিয়েছিল। প্রজাবৃন্দ বিশেষ কষ্টের মধ্যে কাল কাটাতে বাধ্য হয়। পাটের দাম কমে যাবার ফলে রাজসরকার আরও বিব্রত বোধ করে। বন্যাত্রাণে ব্রিটিশ সরকার নেমে পড়ে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ও বন্যাত্রাণে এগিয়ে আসে। রাজা তৎপরতার সঙ্গে ১লক্ষ টাকা বন্যাত্রাণের জন খরচ করার ব্যবস্থা করেন। রিলিফ ও ধার বাবদ মোট ৩৬০০০৲ টাকা খরচ করা হয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে প্রজাদের ৫৪০০০৲ টাকা পর্যন্ত ধার দেওয়া হয়েছিল।[২৩] ১৯৩১ সালে ঐরূপ খারাপ বৎসর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দা এবং ধান পাটের মূল্যও কমে গিয়েছিল। প্রজাদের সাহায্য করার জন্য বন্ডে টাকা ধার, দেনা কিস্তীতে শোধ এবং সাধারণভাবে সুদ রেহাই দেয়া প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।[২৪] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৩৪২-১৩৪৬ ত্রিং সনের বার্ষিক বিবরণীতে চাকলার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন বিবরণী দেখা যায়নি। ১৩৪৭-১৩৪৯ ত্রিং সনের বিবরণীতে দেখা যায় ১৩৪৮ ত্রিং সনের চৈত্র মাসে প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত (Nominated) জোতদারগণ বীরবিক্রমের আহ্বানে আগরতলাতে এক সভায় যোগদান করে। আলোচ্য বিষয় ছিল বিনাসুদে ৯ বৎসরের বাকী কর সহ কিস্তিতে শোধ করা এবং যদি কেহ ১৩৪৯ ত্রিং সনের আশ্বিন মাসের মধ্যে শোধ করে তাহলে তাদের মোট কর সুদ সহ শতকরা ২০ ভাগ রেহাই দেয়া হবে। এ সভায় বীরবিক্রম ভাষণ দেন। ভাষণের শেষ ভাগে বলেন-"তথাপি সুদ সম্পর্কে প্রজাবৃন্দের প্রতি কঠোর আচরণ হইবে ইহা কদাপি আমার অভিপ্রেত হইতে পারে না। এ রাজ্যের রাজা ও প্রজার মধ্যে পিতাপুত্রের চিরসম্বন্ধ বিদ্যামান আছে তাহা খর্ব করা দূরে থাকুক উহা দৃঢ়তর হউক ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।"[২৫] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমিদারীর প্রজাদের সঙ্গে, যারা ত্রিপুরা রাজ্যের সেকালের প্রকৃত উৎপাদক, ত্রিপুরার রাজাগণ পুত্রের মত

ব্যবহার করেছিলেন কিনা তা সত্যিই বিবেচনা করার বিষয়।

—ঃ তথ্যনির্দেশ ঃ—

১। Tripura Administration Report, (1943-1946),P-153.
২। সিংহ কৈলাসচন্দ্র ঃ রাজমালা, বর্ণমালা সংস্করণ, পৃঃ ১৮২।
৩। Suit No 25 of 1880, P.4
৪। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য, পৃঃ৪২-৪৩ আগরতলা ২০০২।
৫। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ ত্রিপুরার ইতিহাস, আগরতলা ২০০০, পৃঃ ১৭১।
৬। বীরবিক্রম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৭। Chakraborty Mahadev (Ed): Tripura Administration Report vol iii, p.p.1351-1352.
৮। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ উপরে উল্লিখিত , পৃঃ ১৮১।
৯। Tripura Administration Report 1943-46,P.153.
১০। Chakraborty Mahadev : op it vol iii, P.1351-52.
১১। Tripura Administration Report op it 1943-46, P.156.
১২। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন, পৃঃ ১৭।
১৩। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ প্রসঙ্গ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য, উপরে উল্লিখিত, পৃ ৪৩।
১৪। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ উপরে উল্লিখিত , পৃঃ ১৯২।
১৫। Tripura Administration Report 1353-1355 T.E.P.157.
১৬। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ উপরে উল্লিখিত, পৃঃ ২০২।
১৭। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য,পৃঃ- ৪০
১৮। Tripura Administration Report ,1943-46, P.158.
১৯। Ibid :P.157.
২০। Chakraborty Mahadev :op it vol ii, P. 703
২১। Ibid :vol iii, P.P 998-99
২২। Tripura Administration Report :1943-46, P 157.
২৩। Chakraborty Mahadev :op it vol pp1501-1505.
২৪। Ibid :pp 1506.1507
২৫। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজগী, পৃ.উ পৃঃ ৫০৫-৫০৬।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষক বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য

ত্রিপুরার রাজাগণ চিরকালই বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যদিও মধ্যযুগে ক্রমাগত মুসলমানদের (পাঠান ও মোগল) সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছে নিজেদের ভূমি রক্ষা ও রাজ্যের আয়তন বাড়তে। তবু নিজেরা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হয়েও রাজ্যে বা জমিদারীতে বসবাসকারী মুসলমান প্রজাদের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ পোষণ করতেন না বরং তাদের ধর্ম পালনের জন্য মুক্তহস্তে দান ও সাহায্য করেছেন। এ ব্যাপারে কল্যাণ মাণিক্য ও গোবিন্দ মাণিক্যের খন্দকার আব্দুল গণিকে প্রদত্ত ফকিরান-লাখোরাজ সনন্দ; কাজি মুমিন, কাজী মনসুর ও কাজী হোসেনকে প্রদত্ত আয়মা সনন্দ; একদিল কাজীকে প্রদত্ত আয়মা সনন্দ উল্লেখযোগ্য।[১] ২য় ধর্মমাণিক্য প্রদত্ত মমরেজ খাঁ-কে মজুমদারী সনন্দ, দুর্গামাণিক্য কর্তৃক তাহিত মহম্মদকে চেরাগী খররাত সনন্দ [১], কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের গৃহত্যাগী প্রজা বকস আলীতে পুণরায় বাড়ীতে ফিরতে আহ্বান[২] প্রভৃতি প্রমাণ করে যে তাঁরা উভয়ধর্মের প্রজাদের সমদৃষ্টিতে দেখতেন এবং প্রতিপালন করতেন এমন কি ত্রিপুরার মন্দির স্থাপত্য যা ত্রিপুরী শৈলী নামে প্রখ্যাত, তা হিন্দু, মুসলমান, ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের, মিলিত এক অপরূপ শিল্প শৈলীরূপে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদেরই উদারতার ফলে। Tripura style of temple architecture is an unique style evolved out of the combination of Hindu, Buddhist and Muslim style of archeatecture which reflects the status of religious toleraton of the Hindu rulers of this small hilly kingdom though personally they were staunch followers of brahmanicalrites".

ঐ সব রাজাদের উত্তরপুরুষ বীরবিক্রম ও তাঁর সকল প্রজাদের সঙ্গে সমব্যবহার করে গেছেন। সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিন পরেই ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের) ৮ই ভাদ্র তারিখে বীরবিক্রম কুমিল্লা গমন করেন। সেখানে আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া তাঁকে অভিনন্দন জানায়। উত্তরে বালক রাজা এমন এক হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যে নিজের দর্শন এমনভাবে ব্যক্ত করেন যে সকলে অভিভূত হয়ে যান। -"আমি আজ সরলভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হইতে

সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আবহাওয়া আমার রাজ্যে সৃষ্টি করা -ইহাই আমার সর্বোচ্চ এবং একমাত্র আকাঙ্খা। যাহাদিগের ভাগ্য আমার নিজের ভাগ্যের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত-হিন্দু হউক, আর মুসলমানই হউক আমি তাহাদিগকে এই বুঝাইয়া দিতে চাই যে, বিভিন্ন জাতিতে অথবা বর্ণে বর্ণে প্রকৃত পক্ষে কোন পার্থক্যের স্থান নাই; প্রতি সম্প্রদায় একই আদর্শ, লক্ষ্য এবং পরিণতির সুনিয়মে সুনিশ্চিত। আমি চাই, হৃদয়ের অন্তস্থলের অনুভূতি দ্বারা প্রত্যেকেই এইটুকু উপলব্ধি করুক যে, ধর্ম কেবলমাত্র পন্থাবিশেষ-যাহার অনুসরণেই একমাত্র, সার্বজনিক গন্তব্য গৃহে অথবা বিশ্বপিতার পদপ্রান্তে উপনীত হইতে পারি। আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ, যিনি ফেজ ব্যবহার করেন তিনি ফেজই এবং যিনি পাহাড়ী ব্যবহার করেন তিনি পাগড়ীতেই অনুরক্ত থাকুন। কিন্তু আমি চাই প্রতিমানবের প্রাণ এই অনুভূতিতে স্পন্দমান হউক যে, দৃশ্যমান বৈষম্য কেবলমাত্র বহিরাবরণেই পর্য্যবসিত; এই বৈষম্যের অন্তরালে মানবাত্মা সাম্য মৈত্রীর অনুপ্রেরণায় পরস্পরের নিকট পূজা এবং প্রণয়ের দাবী রাখে।

আমার ত্রিপুরা রাজ্যে, আমার আদর্শের সাধনা যেদিন সার্থক হইবে, আমার আশা আছে, সেই পরম শুভদিনে- যে সম্প্রদায় বিচারের উপর বর্তমান মানব বুদ্ধি আজ অর্থ আরোপ করিতেছে, সে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান, ভাস্কর নবীনের বিমল প্রভায় তিরোহিত হইবে। সেদিন হিন্দু অথবা মুসলমান, আমার প্রিয়পাত্র-একথা নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা ভিন্ন সম্পূর্ণ অর্থশূন্য প্রতিপন্ন হইবে। আমি আজ একজন রাজভক্ত হিন্দুর তত্ত্বাবধানে রাজ্যস্থ অপরাপর জাতি বর্ণেব কল্যাণের ভার সমর্পণ করিতে পারিতেছি—আমার কাঙ্খিতদিনে আমার আদর্শ বিশ্বাসী একজন মুসলমানের সেবা তৎপর তত্ত্বাবধানে, সমভাবেই আমার রাজস্থ্য হিন্দু প্রজারভার আমি হৃষ্টচিত্তে অর্পন করিয়া নিশ্চিত হইতে পারিব।" [৯]

এই ভাষণের সময়কাল ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন বীরবিক্রমের বয়স মাত্র ২০ বৎসর। এই ভাষণে তাঁর জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে কিরূপ বিরূপ প্যারিপাশ্বিক পরিস্থিতিতেও তিনি নিজের জীবনাদর্শে অটুট ছিলেন এবং পূর্ব পুরুষের কৃতিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঐ সময়ে কুমিল্লা নগরী পরিত্যাগের পূর্বে তিনি শহরের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সহায়তাকল্পে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিলেন। তম্মধ্যে শাহসুজা মসজিদের জন্য ১৫০০ টাকা এবং খাদিমল ইসলাম নামক প্রতিষ্ঠানকে ৫০০ টাকা অর্থ সাহায্য প্রদান করেছিলেন।[৮] সঙ্কল্প পূরণে অবশ্যই সময় লেগেছিল কারণ উপযুক্তজমি প্রস্তুত না করে তিনি বীজ বুনতে আগ্রহী ছিলেন না। ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের (১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের) ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে গঠিত প্রিভি কাউন্সিল বা রাজসভাতে নিযুক্ত সদস্যদের মধ্যে মুন্সী শ্রীযুক্ত আব্দুল আজিজ এবং মৌলভী শ্রীযুত আব্দুল সুখির মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য।[১২] সদস্যের রাজসভাতে দুইজন মুসলমান সদস্য স্থান পেয়েছিলেন।[৯] ১৯৩৪ খ্রীঃ কোলকাতায় সরকারী ইসলামিয়া মহাবিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে বীরবিক্রম ভাষণ প্রদান করেন ও ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সাহায্য করেন।[১০] ঐ বৎসরই গ্রীষ্মকালে বীরবিক্রম ও মহারানী কাঞ্চনপ্রভা মুসৌরীতে অবস্থানকালে ১১ই জুন অঞ্জুমান ইসলামিয়া কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভাতে আহুত হয়ে ভাষণ দেন।[১১]

ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলমান প্রজাদের বিবাহ বা নিকাহ উপলক্ষে রাজ্যসরকারকে কাজিযানা বা কাজাই নামে নির্দিষ্ট কর দিতে হত। এই রীতি প্রকৃষ্টরূপে সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে

১২৯১ ত্রিপুরাব্দের ২৯শে শ্রাবণের একটি নির্দেশ দেখা যায় যে রাজ্যসরকার ঐ কর বিষয়ে বিচার বিবেচনা করছিলেন। "কজাই মহালের বর্তমান কর অধিক হওয়াতে মুসলমান প্রজাগণের যে কষ্ট হইতেছে তা বলা বাহুল্য। উক্ত সালে সরকারী বার্ষিক ৩০০ তিনশত কি সাড়ে তিনশত টাকার উর্দ্ধে আয় হয় না। এই অল্প আয়ের সহিত মুসলমান প্রজা সমূহের কষ্ট তুলনা করিতে গেলে উক্ত মহাল এবালিস করাই আপততঃ ভালবোধ হয় সন্দেহ নাই।"[১১] এই উপলব্ধি মহারাজ বীরচন্দ্রের আমলের কিন্তু কোন শাসকই সাহস করে এই প্রাচীন প্রথা নানা কারণে বাতিল করতে পারেন নি। বীরবিক্রম ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের ২৯শে অগ্রহায়ণ এক রোবকারী দ্বারা এই প্রথার অবসান ঘটান। -"এ পক্ষের মুসলমান প্রজাগণের দেয় বিবাহের নজর কাজিয়ানা ফিস অতঃপর আর সরকারে গ্রহণ করা হইবে না এবং তদনুযায়ী প্রচলিত নিয়মাবলী সংশোধিত বা রহিত হইবে"[১২] এই কু-প্রথার অবসান ঘটিয়ে বীরবিক্রম নিজের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ শাসকদের divide and rule নীতি অনুসারে ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ , পারিস্পরিক ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা চলেছিল। ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের (১৯৪১ ইং) একটি বিশেষ ঘটনা ঢাকা জেলাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সারা পৃথিবী কাঁপছে সে সময়ে বীরবিক্রমের মাতা অরুন্ধুতি মহারানীর মৃত্যুতে রাজ্য শোকাহত ঠিক তখনই ঢাকা জেলার রায়পুরা ইত্যাদি গ্রামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকাব প্রায় ১৫০০০ শরণার্থী ত্রিপুরায় প্রবেশের জন্য আখাউড়া স্টেশনে জমায়েত হয়। তদান্তিন বাংলার প্রাদেশিক সরকার এই হিন্দু প্রজাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের নিরাপদ আশ্রয় দিতেও অপরাগ হয়। সে সময়ে একদিন বীরবিক্রম মহাবানী রাজমাতার শ্রাদ্ধবাসরে অনুষ্ঠিত ধর্মকৃত্যে রত ছিলেন তখনই আখাউড়ার ষ্টেশন মাস্টার মিঃ টেইলর এসে স্টেশনে জমায়েত শরণার্থীদের সংবাদ এবং তাবা ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে উদ্যোগী জানালে বীরবিক্রম তৎক্ষনাৎ রাজমন্ত্রী ও সচিবদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজধানীর অফিস, আদালত বিদ্যালয় সমূহের দরজা শরণার্থীদের জন্য খুলে দিতে এবং তাদের পর্যাপ্ত খাবারের বন্দোবস্তের নির্দেশ দেন। তাঁর এই অপূর্ব মানবিক কাজে চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ইউনাইটেড প্রেসের পরিচালক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত - শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্তকে ১৭ই এপ্রিল ১৯৪১ তারিখে চিঠিতে জানান— All roads lead to Tripura now and all eyes directed towards its wonderful ruler with reverence and love Tripura has done and has extorted the admiration of the whole country May the flag of Tripura fly a loft for all the time to come .... I am affraid you are all extremely busy with His Highness who is personally succouring the 'Daridranarayan'. I do not thereafter propose to prolong my letter but shall be delighted to have a line in reply."[১৩] রায়পুরের ঘটনা ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দের চৈত্রমাসে ঘটেছিল। রাজ্যে এ ব্যাপারে শান্তিরক্ষা করতে এবং অসাম্প্রদায়িকতার গৌরব উজ্জ্বল ত্রিপুরার ঐতিহ্য সংরক্ষণ কল্পে বীরবিক্রম ১লা বৈশাখ ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে এক রোবকারী দ্বারা ত্রিপুরাবাসীদের আহ্বান জানান।

অভাবনীয় ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে আজ যে সব আশ্রয়হীন নরনারী, বালক বৃদ্ধ এ রাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছে, আজ এই নববর্ষে মনুষ্যচিত সমবেদনার সহিত তাহাদের কথা স্মরণ করিতেছি এবং আমি আশা করি তাহারা সকলেই অচিরে পুনরায় স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় সুস্থিত হইবে। এই প্রাচীনতম ত্রিপুরাজ্যের পবিত্র ইতিহাস চিরদিন অসাম্প্রদায়িকতার গৌরবে উজ্জ্বল-এবং ত্রিপুরশ্বেরগণের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিপন্নকে আশ্রয়দানের পূণ্য কাহিনীতে পরিপূর্ণ।— এই বৃহৎ মানব সমাজের সকল বিপন্ন ও আশ্রয়প্রার্থীই আমার দৃষ্টিতে সমান। ব্যবহার ক্ষেত্রে এই সমতা রক্ষার্থে আমি ও আমার গভর্ণমেন্ট চির সচেতন। এ রাজ্যের সর্বসাধারণকে তাহাদের চিরন্তন সদ্ভাবের মহান ঐতিহ্য স্মরণ করাইয়া আজ নববর্ষে আমি তাহাদিগকে ঐক্য ও প্রীতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আহ্বান করিতেছে।

বর্তমানে এ রাজ্যের আশ্রিত অসংখ্যক দুর্গতকে সেবা সাহায্য ও সান্ত্বনাদানে এবং নানা প্রকারে উহাদের অবস্থার উন্নতি বিধানে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াস আমার বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছে। আমি আমার হিন্দু মুসলমান প্রজাবর্গের এই মনুষ্যচিত আচরণে গর্বিত। জগদীশ্বর আমার সর্বশ্রেণীর প্রজা ও আশ্রিতবর্গের মৈত্রী ও শুভবুদ্ধিকে অক্ষয় করুন,ইতি।" [১৫] বাংলার গভর্ণর স্যার জন হারবার্ট মহারাজ বীরবিক্রমকে লেখা তাঁর ১১ই এপ্রিল ১৯৪১খ্রীষ্টাব্দের পত্রে "Expressed his sincere appriciation of the measure adopted and thanked the Maharaja as well as all concerned for rendering valuable assisstance to and for arranging the safety and comfort of the refugees"[১৬] বীরবিক্রম ১লা বৈশাখ তারিখের বার্তাটিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের ২৭শে বৈশাখ একটি প্রীতি বর্দ্ধক সমিতি গঠন করেন যাতে সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ কোনরূপ গন্ডগোল না বাধে।"এ রাজ্যের ইতিহাস চিরকাল অসাম্প্রদায়িকতার গৌরবে সমুজ্জ্বল। তথাপি বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর পরস্পরের প্রীতি সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির ভাব সর্বদাই সর্বোতভাবে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এ রাজ্যেরও উক্ত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ও যোগ্য লোকদ্বারা প্রীতিবর্দ্ধক সমিতি গঠিত হওয়া পরিষদ সমীচীন মনে করেন।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথের নিকট ও মহারাজার সহৃদয়তা ও কর্মকুশলতার সংবাদ পৌঁছিল। রোগশয্যায় শায়িত কবি তাঁর আদরের ত্রিপুরেশ্বরের কাজের জন্য খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন এবং অভিভূত হয়েছিলেন যা ব্যক্ত হয়েছে তাঁকে "ভারত ভাস্কর' উপাধি প্রদান কালে তাঁর লিখিত বক্তব্যের মধ্যে "আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে যখন বুঝলেম বর্তমান মহারাজা অত্যাচারিত পীড়িত বহুসংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে অসামান্য বদান্যতার সঙ্গে আশ্রয় দান করেছেন, তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তার বংশগত রাজ উপাধি আজ বাংলার সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হল"।[১৮]

ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সম্প্রদায়গত পারস্পরিক ঘৃণাবোধ বেড়ে সহনশীলতার মাত্রা শূন্যে পৌঁছেছিল। এইরূপ অবস্থায় মুসলিম লীগ ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ ইং তারিখে Direct Action Day ঘোষণা করে এবং এর ফলে কোলকাতায় দাঙ্গা বাঁধে।

নোয়াখালি জেলা ও ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে ১৪ই অক্টোবর তারিখে বৃহৎ হিন্দুনিধন যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। বহুলোক নিহত হয় এবং বহুলোক পিতৃ পুরুষের ভিটে জমিজমা পরিত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে। রাজ্য সরকার উদ্বাস্তু চাপে বিব্রত হলেও রাজার নির্দেশে আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যের জন্য কমিটি গঠন করে এবং উদ্বাস্তুদের আশ্রয় প্রদান, খাদ্যসরবরাহ ও সেবা যত্ন করে।" ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চল হইতে প্রত্যহই বহুসংখ্যক আশ্রয় প্রার্থী আজ কয়দিন যাবৎ রাজধানীতে উপস্থিত হইতেছে। তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষন এবং অত্যাবশকীয় ব্যবস্থার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ সহ একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচায্য।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্য—কুমার শীল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, সত্যরঞ্জন বসু, সুখময় সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রলাল সিংহ, দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দে, মহেন্দ্র চন্দ্র সাহা।

কমিটি আশ্রয়প্রার্থীদের কলেজ বিল্ডিং-এ অবস্থানের ব্যবস্থা করিবেন।

আশ্রয়প্রার্থীদের আবশ্যকীয় চাউল এক হাজার মণ পর্যন্ত কমিটির নির্দেশমত শ্রী শ্রী যুক্ত সরকারী নির্দ্ধারিত দরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র সাহা ও শ্রীযুক্ত উষারঞ্জন মজুমদার সরবরাহ করিবেন। মিউনিসিপ্যালিটি ও চিকিৎসা এবং পুলিশ গং বিভাগের মন্ত্রী বাহাদুর আশ্রয় প্রার্থীদের যথাযোগ্য সাহায্যকল্পে কমিটির অনুরোধ অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন।" এই নির্দেশ ৩০ শে আশ্বিন ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের প্রচারিত হয়েছিল।[১৯]

যদিও ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালী পরিদর্শন করেন এবং সেখানে সামগ্রিক শান্তি ফেরাতে চেষ্টা করেন এবং হিন্দুদের আশ্বস্ত করেন নিজ নিজ বাসভূমে ফিরে আসতে কিন্তু গান্ধীজীর আহ্বানে অনেকে ফিরে গেলেও অনেকেই আবার ত্রিপুরাতেই থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।[২০] মহারাজ বীরবিক্রমের এই অবদানের কথা ইতিহাসে স্বীকৃতি পেয়েছে-" Maharaja formed a welfare Committee of the refugees six big huts were built by Maharaja for them and a large sum of money was spent for this purpose. It should be noted in this Conection that when Communal frenzy overtook different parts of undivided India,Tripura cautiously guarded herself from falling Victim to it"[২১]

এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে কত সংখ্যক লোক সে সময়ে ত্রিপুরাতে থেকে গিয়েছিল। সেন্সাস রিপোর্ট থেকে একটু আন্দাজ করা যেতে পারে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল ৫,১৩,০১০ এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৩৯,০২৯ জনে। [২২] যদিও এরপরেও সমতল বঙ্গে দাঙ্গা হয়েছে এবং উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে এবং ১৯৫০ সালের শরণার্থীদের মধ্যে যারা এখানে থেকে গিয়েছিল তারাও ১৯৫১সালের জনগণনার মধ্যে পড়েছিল। বীরবিক্রম ঐ রূপ বাস্তুত্যাগীদের যারা নিজ বাসভূমে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক এবং ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দের অর্থাৎ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দেই নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন- "ভিন্ন রাজ্য হইতে আগত বাসিন্দাগণ - যাহারা এ রাজ্যে স্থায়ী প্রজা হইয়া বসবাস করিতে ইচ্ছুক এবং ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর যে সকল লোক স্থায়ী প্রজা হইবার প্রার্থনা করিবে তাহাদিগকে সরকার

হইতে Naturalization Certificate প্রদান করিয়া রাজ্যের স্থায়ী প্রজা স্বরূপে গ্রহণ করিবার বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থাদি হইতে পারে তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত মন্ত্রীবাহাদুর মন্তব্য সহ প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।” [২৩] বলা বাহুল্য রাজার অভিরুচি মত ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তারফলেই পরবর্তীকালে চাকলা রোশনাবাদ সহ রাজ্যের পার্শ্বের ব্রিটিশ জেলাগুলির দাঙ্গা পীড়িত হিন্দুরা এ রাজ্যে বসবাসের সুযোগ ও অধিকার পেয়েছিল। বীরবিক্রমের নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং পরিপোষণের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাজ্যের বৌদ্ধ প্রজাদের প্রীতার্থে তিনি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আগরতলাতে একটি বৌদ্ধ মন্দির স্থাপন করেন যার নাম বেণুবন বিহার। মন্দিরের উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে তিনি বান্দরবন ও রামগড় থেকে বৌদ্ধ পুরোহিত তথা শ্রমনদের এবং ঐ ধর্মের অনেক গণ্যমান্য পৃষ্টপোষকদের আমন্ত্রণ করে রাজধানীতে আনেন এবং তাঁদের স্বাধীনভাবে নিজস্ব ধর্মচারণের আশ্বাস ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। কোন কোন ঐতিহাসিক ঐ বুদ্ধমন্দির নির্মাণ কে "to put a check to the tribal's desire to embrace Christianity, the Maharaja gave impetus to Buddhism and founded a Buddha temple at Agartala in 1946 known as 'Benuvana Behar",[28] অন্য পন্ডিত লিখেছেন- There were practically no Christians in the state until the Christian Missionarees become active among the tribal people Cristian Missions were up and doing from the very beginning of the 20th Century. Their proselytizing zeal stopped at nothing As a result there were as many as 2600 Christians in the state in 1931. There was no Hindu Mission in the state But a Bhuddhist Mission came forward to counter act the activities of the chrisitan Missionaries. The Maharaja was not in a position to antagonise the Christian Missionaries as they were backed by the higher officials of the British Indian Government. He therefore, extended all possible help to the Buddhist Missionaries",[২৫]

ব্যাপারটি একটু আলোচনা করা যায়। তাদের যুক্তির সারবত্তা কতটা তা বিচার করা দরকার। একথা সত্য যে ত্রিপুরাতে কতিপয় ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মরিয়মনগরে বাস করত। তারা পর্তুগীজ বংশজাত, ত্রিপুরার রাজাদের সেনাবাহিনীর মধ্যযুগীয় প্রতিনির্ধিদের বংশধর। তাদের ব্যাপারে প্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় শম্ভচরণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে। তবে তারা সংখ্যায় নগন্য এবং অত্যন্ত হীন অবস্থায় ছিল বলে গ্রন্থাকার মত প্রকাশ করেছেন।[২৬] ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিরানী চার্চ নামে একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চ ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যান্ড ব্যাপটিস্ট মিশনারী কর্তৃক একটি প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৮ খ্রীঃ উহার কর্তৃত্ব ত্রিপুরা ব্যাপটিষ্ট মিশনারী নামে অরুন্ধুতিনগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মিশনারীগণ অরুন্ধুতিনগরে একটি ডিসপেনসারী এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ডিসপেনসারী হাসপাতালে উন্নীত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা একটি M E স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ঐ সব মিশনারীরা উপজাতিদের মধ্যে নানারকম অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাত, অর্থসাহায্য করত এবং অবশ্যই ধর্মান্তকরণ করত।[২৭] এই মিশনের প্রতিষ্ঠা বীরবিক্রমের অজ্ঞাতসারে হয়নি, অরুন্ধুতিনগরের জমি তাদের দেয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর আদর্শ অনুযায়ী তাদের কাজে বাধা দেননি। অবশ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং তার ফলাফল নিয়ে

তখনও কেউ বিশেষ ভাবত না। ত্রিপুরা রাজ্যে বীরবিক্রমের পূর্বে ও তার সময়ে বৌদ্ধও খৃষ্টান জনসংখ্যা নিম্নসারণী থেকে জানা যেতে পারে।[২৮]

সাল	বৌদ্ধসংখ্যা	খ্রীষ্টানসংখ্যা
১৯০১	৫৯৯৯	১৩৭
১৯১১	৫৯৯৭	১৩৮
১৯২১	১০,১৪৭	১৮৬০
১৯৩১	১৪,১৪৭	২৫৯৬
১৯৪১	৭,৭২৪	৩২৮
১৯৫১	১৫৪০৩	৫২৬২

উল্লেখযোগ্য যে বীরবিক্রমের কাল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কেবলমাত্র মগ, চাকমা উপজাতিগণ বৌদ্ধধর্মাচরণ করত এবং কুকি ও লুসাই জনগণের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখা যায় কিন্তু আজকালকার মত ত্রিপুরী, রিয়াং, গারো বা হালামগণ তখনও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। উপরোক্ত তথ্যে জানা যাচ্ছে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বোক্ত ত্রিপুরা রাজ্যে খ্রীষ্টান ছিল যদিও জনসংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। পূর্বেবই উল্লেখ করেছি যে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ৫,১৩,০১০ জনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে খ্রীষ্টান জনসংখ্যা মাত্র ৩২৮ জন। তা নিশ্চয়ই নগন্য কিন্তু বৃদ্ধির হার নগণ্য নয় সেজন্য ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মোট জনসংখ্যা ৬,৩৯০২৯ জনের মধ্যে খ্রীষ্টান সংখ্যা ৫২৬২ জন,১৯৩১ সনের ভাষাগোষ্ঠী লোকদের মধ্যে চাকমা ৫২২০ জন কুকিভাষী ১৪৭০ জন, হালামভাষী ১০,৩৭০ জন, গারোভাষী ২৭০৪০ জন এবং লুসাইভাষী ২০০০ জন দেখা যায়।[২৮] মগভাষী লোকদের সে সময়কার সংখ্যা জানা যায়নি। অপরপক্ষে বৌদ্ধ জনসংখ্যার বৃদ্ধি লক্ষ্যনীয়, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৭৭২৪ জন থেকে বেড়ে ১৯৫১ সালে ১৫৪০৩ জন দাড়িয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বীরবিক্রম তাদের দ্রুতবৃদ্ধির গতি লক্ষ্য করেছিলেন, ব্রিটিশ আমলাদের মিশনারীদের প্রীতি উপেক্ষা করতে না পারলেও এরূপ কোন ইঙ্গিত তিনি দেন নি যে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাজ তাঁর অপছন্দ, কাজেই তিনি তাঁর নিজস্ব জীবন দর্শন অনুযায়ী অরুন্ধুতিনগরে যদি মিশনারীদের জমি দিয়ে থাকেন তাহলে রাজ্যের এক বৃহত্তর বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর জন্য মন্দির স্থাপন করে তাঁর জীবন দর্শনের পথেই হেঁটেছেন।

-ঃ পাদটীকা ঃ-

১। দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, আগরতলা, ১৯৭৬ইং পৃঃ ৩, ৪, ৫ দ্রষ্টব্য পরে রাজগী।

২। তদেব ঃ পৃঃ ৯

৩। তদেব ঃ পৃঃ ১২

৪। তদেব ঃ পৃঃ ১২

৫। তদেব ঃ পৃঃ ১২

৬। Goswami D.N. : Temples of Tripura. Agartala 2003, P.15
৭। রাজগী : পূ.উ, পৃঃ৫৬
৮। তদেব : পৃঃ ৫৭
৯। তদেব : পৃঃ ১৬৫
১০। গণচৌধুরী জগদীশ : ত্রিপুরার ইতিহাস, আগরতলা,২০০০, পৃঃ ১৮০।
১১। তদেব :পৃঃ ১৮০
১২। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন : ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, আগরতলা-১৯৭১ পৃঃ ৩৭ পরে (গেজেট সংকলন)।
১৩। রাজগী :পূ. উ. পৃঃ ১০৯-১১০।
১৪। চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, আগরতলা ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ
১৫। রাজগী :পূ. উ.পৃঃ ৭৭ ।
১৬। Administration Report of Tripura (1940-1943)-P.10.
১৭। রাজগী :পূ. উ.পৃঃ১১০
১৮। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা : পূ.উ.পৃঃ১৫৩
১৯। গেজেট সংকলন : পূ.উ.পৃঃ ১৭৫-১৭৬।
২০। Menon K.D : Tripura Distract Gazetter, Agartala 1975,P.137.
২১। Choudhury N R : Tripura through Ages, New Delhi, 1983 P.60
২২। Menon K.D. : Op.Cit P.127
২৩। রাজগী : পূ.উ. পৃঃ ২৩৭
২৪। Choudhury N.R : Op.Cit P.60
২৫। Sen Tripura : Tripura in Transition, Agartala 1970. P.4
২৬। Mukherjee S.C. Travels and voyages between calcutta and Independant Tripura 1887. Calcutta
২৭। Menon K.D. Op. Cit P.P. 381-82
২৮। গণচৌধুরী জগদীশ : পৃঃ ২৫০
২৯। Menon K.D. Op. Cit. P.139

বীরবিক্রম স্বায়ত্ব শাসন

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ঃ

১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে শ্রাবণ এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় যে আগরতলা শহরের বাসিন্দাদের নিজ নিজ বাসগৃহ ও বাসগৃহের পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আলো বাতাস পূর্ণ রাখতে সমস্ত প্রকারের জঙ্গল উচ্ছেদ করতে এবং অন্যান্য বৃক্ষসমূহ ছোট করতে বা সমূলে উৎপাটন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে কূপ, পুস্করিনি, রাস্তা ও পয়ঃপ্রণালী ও পরিস্কার রাখতে নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে।[1]

রাজধানী প্রসারিত হবার ফলে এবং ক্রমোন্নতি ও কালের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দের ২৭শে আশ্বিন এক আদেশ বলে মিউনিসিপ্যালিটির কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২ জন করা হয় এবং পরিষেবিত এলাকা মোট ৬টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সদস্য নিজ নিজ ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের ভোটে নির্বাচিত হবে এবং বাকী ৬ জন সদস্য রাজমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হবে। অধিবাসীদের মধ্যে যারা কম পক্ষে ৫ টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেয় বা মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে রাজ সরকারের ভূমির খাজনা দেয় অথবা ভূমির খাজনা ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স মিলে কম পক্ষে ৫ টাকা দেয় তারা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে কমপক্ষে একুশ বৎসরের হলে ভোট দিতে পারবে। কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান নির্বাচিত সদস্যগণ নির্বাচিত সদস্যগণ নির্বাচন করবে। রাজমন্ত্রী চেষ্টা করবেন ১৯৩২ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইনের বিধান অনুযায়ী ভোট প্রণালী ও কমিটির কার্যক্ষমতা প্রভৃতি ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা আইন প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করবেন। মিউনিসিপ্যালিটির আয়তন বৃদ্ধি ও ৬টি ওয়ার্ডের সীমারেখা নির্ধারণের ব্যবস্থা করবেন।[2]

তারপরেই দেখা যায় মিউনিসিপ্যালিটি আয় [illegible] বার জন্য রাজসরকার কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন (১) আগরতলা আখাউড়া স [illegible] চলকারী গাড়ীর উপর ট্যাক্স বসান। নির্দিষ্ট ষ্টেট কার ব্যতীত অন্য সব প্রাইভেট ও [illegible] গাড়ী যেমন মোটর, বাস, ট্যাক্সি ও লরি লোকজন ও মালপত্রসহ যাতায়াতকারী [illegible] রের জন্য। চার আনা করের আওতায়

আনা হয়। খালি গাড়ী ট্যাক্সের আওতার বাইরে রাখা হয়। ড্রাইভার হেন্ডিম্যানদের কর মকুব করা হয়। রাজমন্ত্রীকে ট্যাক্স আদায়ের জন্য টিকিটের ফর্ম প্রচার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।[৫] অনুরূপভাবে সরকারী ঘোড়ার গাড়ী ব্যতীত অন্যসব প্রাইভেট ও ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী মাল সহ গমনাগমনকালে যাতায়াতের প্রতিবারের জন্য এক আনা ৬ পাই ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয়। কোচ ম্যান ও সহিসদের ভাড়া থেকে রেহাই দেয়া হয়। এক্ষেত্রেও টিকিটের ফরম রাজমন্ত্রীকে তৈরী করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। (৩) মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থানে গরু ও মহিষের গাড়ী চলাচলের উপর ট্যাক্স পূর্ব থেকেই ছিল। ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দের এক আদেশ বীরবিক্রম ঐ ট্যাক্স বৃদ্ধি করে বার্ষিক ৪ টাকা ধার্য করেন।[৫] (৪) ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দের এক আদেশে দেখা যায় আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর বিবরণ বিশুদ্ধভাবে পঞ্জীকরণের নির্দেশ। (৫) আগরতলা পৌর এলাকাতে সাইকেল চালাতে গেলে লাইসেন্স গ্রহণ করার বিধান ছিল। বীরবিক্রম ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দের এক আদেশ বলে লাইসেন্স গ্রহণ অত্যাবশ্যক করেন এবং আদেশ অমান্যকারীদের অনধিক ৫ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডের বিধান করেন। মিউনিসিপ্যালিটিকে স্বাবলম্বী করার জন্যই ঐ সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। (৭) পৌরএলাকা মধ্যস্থ খোয়াড়ে আবদ্ধ পশুদিগের জন্য জরিমানা ও রাখালী খরচ আদায় করার প্রথা পূর্বেই ছিল। কিন্তু উক্ত হারে জরিমানার অর্থ দিয়ে পশুদের আহারাদি দিয়ে সংরক্ষণের অসুবিধা হয়। সেজন্য ২ রা বৈশাখ ১৩৫৩ ত্রিং সনে এক আদেশ বলে বীরবিক্রম পশুর মালিকদের জরিমানা হার স্থির রেখে রাখালীর হার বৃদ্ধি করেন।[৫]

নগর সমিতি ঃ রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বিশেষ করে বিভাগীয় শাসন কেন্দ্রসমূহে মিউনিসিপ্যালিটি অনুকরণে 'নগর সমিতি' গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন বীরবিক্রম। ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দের ১৬ ই আশ্বিনের রোবকারীতে ঘোষণা করা হয়—" অদূর ভবিষ্যতে বিভাগীয় নগবসমূহে স্থানীয় অবস্থাদির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এক একটি নগর সমিতি গঠন করা হউক। প্রত্যেক সমিতিতে মোট সভ্য সংখ্যার মধ্যে স্থানীয় জনসাধারণের নির্বাচিত দ্বি-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি থাকিবে এবং বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক সমিতির সভাপতিরূপে কার্য্য নির্বাহ করিবেক। এতৎসম্বন্ধে শ্রীযুত মন্ত্রীবাহাদুর আবশ্যকীয় নিয়মাদি প্রণয়ন করিবেন।"[৬] বলা বাহুল্য নগর সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা উল্লেখ না করলেও নির্ধারিত সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সভ্য অবশ্যই সরকার মনোনীত সভ্য হবেন বলে সহজেই অনুমান করা যায়। এভাবে নাগরিক পরিষেবা মফঃস্বল শহরে বিস্তার করতে প্রয়াসী হলেও বীরবিক্রমের মূল উদ্দেশ্য যে ছিল কর আদায় তা একেবারে বাতিল করা যায় না।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ ঃ আগরতলা পৌর বাজারে ভোগ্যপণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্দিষ্ট হার স্থির করা ছিল তা আমরা ১৩২৪ ত্রিং সনের এক আদেশে জানতে পারি। কোন দোকানদার নির্দিষ্ট মূল্যের অধিকমূল্য এখন করলে দন্ড দেওয়া হত। কিন্তু বীরবিক্রমের আমলে যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও পৌর বাজারের বিক্রয়যোগ্য পণ্যের জন্য এরূপ কোন আদেশ পাওয়া যাচ্ছে না।

আগরতলা টাউন ইমপ্রুভম্যান্ট কমিটি ঃ রাজধানী আগরতলা শহরের উন্নতিকল্পে বীরবিক্রম ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ২১ শে ফাল্গুন এক আদেশ জারী করে শ্রী প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মহারাজকুমার দূর্জয় কিশোর, কুমার ব্রজলাল দেববর্মা, মহারাজ কুমার হেমন্ত কিশোর, উজীর সাহেব কমলকৃষ্ণ, ঠাকুর ললিত মোহন, দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, স্টেট ইঞ্জিনীয়ার ও সদর কালেক্টারকে সভ্য করে আগরতলা টাউন ইমপ্রুভম্যান্ট কমিটি গঠন করেন। প্রমদা রঞ্জন ভট্টাচার্য্য চিফ সেক্রেটারীর কাজের অতিরিক্ত

কাজরূপে ঐ কমিটির প্রেসিডেন্টের কাজ করবেন এবং তাকে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করার জন্য রাজস্ব, ফরেষ্ট ও পূর্তমন্ত্রীর ক্ষমতা অর্পন করা হয়। কমিটির জন্য আলাদা অফিস, প্রয়োজনীয় স্টাফ এবং যে কোন বিভাগ থেকে কাগজ নক্সা, ম্যাপ, যন্ত্রাদি তলব করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৩৫৭ ত্রিং সনের বাজেটে এই খাতে ৫০,০০০ টাকা ধার্য করা হয়। শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্তকে বোর্ডের সেক্রেটারী এবং ঠাকুর ললিত মোহনকে জয়েন্ট সেক্রেটারী রূপে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁদের মেম্বারদের সঙ্গে মিলে কার্য প্রণালী মেম্বারদের ক্ষমতা ও কর্তব্যাদি সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করার নির্দেশ ও দেখা যায়।[৮]

আগরতলা শহরের এলাকা নির্ধারণ ঃ উপরোক্ত আদেশের ৭ দিনের মধ্যেই ২৭ শে ফাল্গুন, ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দে এক আদেশ বলে বীরবিক্রম আগরতলা শহরের এলাকা নির্ধারণ করেন। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ কেন্দ্র থেকে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ৫ মাইল পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত স্থান ইমপ্রুভম্যান বোর্ড এবং উহার প্রেসিডেন্টের এলাকাভুক্ত গণ্য হবে বলে নির্ধারণ ঐ ঘোষণায় দেখা যায়।[৯] শহরের আকার বড় করাই বীরবিক্রমের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এসব কাজ শুরু হতেই মৃত্যু তাঁকে কাছে টেনে নেয় তাই পরিকল্পিত বৃহৎ শহর আগরতলা তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

-ঃ তথ্যনির্দেশ ঃ-

১। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন	ঃ স্টেট গেজেট সংকলন,পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ৩৫৫।
২। ঐ	ঃ গেজেট সংকলন, পৃঃ ৩৫৮।
৩। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ রাজগী, পৃঃ ৪৭৯-৮০।
৪। ঐ	ঃ রাজগী ঃ পৃঃ ৪৮০-৮১।
৫। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন	ঃ স্টেট গেজেট সংকলন পৃ ৩৫৯।
৬। ঐ	ঃ ঐ, পৃ ঃ ১৫০।
৭। ঐ	ঃ ঐ, পৃঃ ৫৭।
৮। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ রাজগী পৃঃ ৩৮৪-৩৮৫।
৯। ঐ	ঃ রাজগী, পৃঃ ৩৪৯-৩৫০।

বীরবিক্রম ঃ কলারসিক

ত্রিপুর জনগোষ্ঠী স্বভাবতঃই কলা-প্রিয়। তাদের নায়কগণ ও স্বয়ং কলাবিদ্যা চর্চা করতেন এবং কলাবিদদের পোষণ করতেন। বীরবিক্রমের উর্দ্ধতন পিতৃপুরুষগণ কলাবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত রচনা, সঙ্গীত পরিবেশন, প্রভৃতি বিষয়ে তাদের দক্ষতা সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁদের প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তাঁদের মধ্যে কেউবা উৎকৃষ্ট চিত্রকর, জাত শিল্পীর মত তুলি রঙের ছোয়ায় অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। কেউবা ফটোগ্রাফী শিল্পের পথিকৃৎ। কাব্য রচনা, কাব্যরস আস্বাদন এবং সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও তাঁদের বিচরণ ছিল অবাধ। নিজেরা সাহিত্য রসিক বলে সাহিত্য মুদ্রণ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ ছিল অসীম। বস্তুতঃ বেশ কিছু সংখ্যক বঙ্গীয় কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের অনুকম্পায় সাহিত্যকর্ম প্রকাশ করতে পেরে ছিলেন। পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ত্রিপুর রাজগণ লুপ্ত প্রায় প্রাচীন গ্রন্থাদি পুণরায় মুদ্রণ করিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির বিকাশে ও সংরক্ষণে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। ঐ সব মহান কলারসিকদের বংশধর বীরবিক্রমও তাঁদের ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম নন। যদিও তাঁর সমস্ত কীর্তি সমূহ বর্তমানে আমাদেব হাতে নেই তবু যে সব সামান্য সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি নিজেও যেমন ছিলেন কলাবিদ, কলারসিক তেমনি ছিলেন কলাবিদদের পৃষ্ঠপোষক।

বীরবিক্রম সঙ্গীতানুরাগীর। নিজে সঙ্গীত রচনা করতেন, সুর সংযোজন করতেন এবং গাইতেন। বিকচ চৌধুরী মহাশয় বীরবিক্রমের রচিত গীত ও একটি সঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন।

মধু মাধবী সারং - কাওয়ালী

চমকন লাগে তেরী বিন্দিয়া, সৈঁইয়া

উড়ত অম্বর লালে বাদর,

বিজুরী চমকে তেরী বিন্দিয়া, সৈঁইয়া

ঘটঘন গজরত দফা ডাম্বর,

বরষে বারি পিচকারী রাঙ্গিয়া, সৈঁইয়া।।[১]

হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিশেষ জ্ঞান এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে পারঙ্গম না হলে গানের রাগ, সুর ও

তাদের নাম বর্ণনা করে গান রচনা করতে পারতেন না। এ গান অবশ্যই তাঁর সংগীতে দক্ষতার পরিচয় বহন করে। এ গানটি তাঁর রচিত 'হোলী' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। নিজের প্রচার চান না বলে তিনি গ্রন্থে নিজের নাম প্রকাশ করেননি। কিন্তু একান্ত প্রিয় আপনজনদের লেখকের স্থানে নিজের নাম সাক্ষর করে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন বলেই আজ আমরা তাঁর কীর্তি জানতে পারছি ।

তাঁর পিতা বীরেন্দ্র কিশোর সেতার ও এস্রাজ খুব ভাল বাজাতেন। বীরবিক্রমও সেতার ও এস্রাজ বাজাতেন, তাঁর হাত ছিল খুব মিষ্টি। গ্রামোফোন কোম্পানী কোন এক সময়ে তাঁর বাজনার রেকর্ড করেছিল। কিন্তু তাদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি রেকর্ডগুলি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাজারে ছাড়তে রাজী হননি।[২] তাঁর রাজকীয় গরিমাবোধ তাঁকে বাধা দিয়েছিল অন্তরের প্রিয় জিনিস থেকে অর্থ উপাজন করতে। সঙ্গীতের প্রতি এই সহজাত আকষর্ণের ফলে সেকালে অনেক শিল্পীদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরার সুসন্তান ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। এছাড়াও ইনায়েৎখাঁ, মাজাফর খাঁ, মজিদ খাঁ, আদিম বক্স, মুন্না খাঁ প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বীরবিক্রম কিশোর। ত্রিপুরার অন্যতম সঙ্গীতবিদ ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণ বীরবিক্রমের সঙ্গীত সাধনার অন্যতম প্রিয় সঙ্গী ছিলেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বীরবিক্রম মহারাজকে কি রকম শ্রদ্ধা করতেন তাব উল্লেখ পাওয়া যায় ঠাকুর অনিল কৃষ্ণকে লেখা ওস্তাদের পত্রাবলীতে। এক চিঠিতে ওস্তাদ আলাউদ্দিন একস্থানে লিখেছেন-''আমার অন্নদাতা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের শ্রীচরণ কৃপায় আশির্বাদে (আশীর্বাদে) আদর জস (যশ) সম্মান পাইতেছি'' আরেক স্থানে লিখেছেন- '' শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের শ্রীচরণে সেবকের কুটি২ (কোটি) প্রণাম জানাইবেন, এ অধম মহারাজার কুসন্তান, অধম সন্তানের ক্রোটী (ত্রুটি) মার্জনা কবিতে নিবেদন করিবেন।''[৩] এ প্রসঙ্গে গেজেটিয়ার উল্লেখ করছে যে বীরবিক্রম অনেক গান রচনা করেছিলেন কিন্তু বেশীর ভাগই মুদ্রিত হয়নি। কিছু গান মুদ্রিত হলেও এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো বর্তমানে অবলুপ্ত হয়েছে।[৪]

নাট্যশাস্ত্রে বীরবিক্রমের অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। তিনি নাটক রচনা করতেন। নাটকের মধ্যে চাঁদ কুমুদিনী ও শ্রীবাধাকৃষ্ণের লীলা বিলাস' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।'শ্রী রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস'১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার 'ত্রিপুরা হাউস' মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল এবং সেখানকার নাট্যামোদী সুধীবর্গ ও গুণীজনের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। বীরবিক্রম 'জয়াবতী' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন। এই নাটক আগরতলাতে মঞ্চস্থ হয়েছিল।[৫]

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব পরিভ্রমণের সময়ে বীরবিক্রম Memorandum of world tour নামে একটি বৃহৎ পুস্তকের পান্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন। বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবালীর বর্ণনা এবং বিশদ ভ্রমণ বৃত্তান্তের বর্ণনা করে লেখা ঐ পান্ডুলিপি ভ্রমণ বৃত্তান্তের একটি চমৎকার নিদর্শন হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল, এমন কি গ্রন্থটির ভূমিকাও তিনি লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে নানা কারণে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়নি। পুস্তকটির পান্ডুলিপি মহারাজের একান্ত সচিব শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত নির্মাল্য দত্তের নিকটে রক্ষিত আছে।[৬]

কলা শাস্ত্রের বিভিন্ন দিকে তার অবাধ গতায়ত ছিল। আজকাল যা ইনটিরিয়ার ডেকোরেশন

নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেই ঘর কিভাবে সাজালে তা দেখতে সুন্দর ও মনোরম হবে তাও বীরবিক্রম বিশেষভাবে জানতেন। ঘটনাটি ১৯৪৪ সালের। ত্রিপুরার প্রখ্যাত শিল্পী, কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কলেজ সংলগ্ন আবাস গৃহে তাঁর স্টুডিও দেখাবার জন্য মহারাজকে আমন্ত্রণ জানান। অনেক ছবি, উডকাট, নানারকম শিল্পীসৃষ্টি দেখাবার পর ছবি তোলার আয়োজন করা হল। কিন্তু রমেন বাবুর নির্বাচিত স্থানটি বীরবিক্রমের পছন্দ হল না। তখন কোথাকার অর্ডার পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মস্ত বড় একটা তৈলচিত্র রমেনবাবু শেষ করে ও সদ্য ফ্রেম করিয়ে ঘরের একপাশে দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রেখেছিলেন। মহারাজের অভিপ্রায় অনুসারে ঐ ছবিটিকেই মোড় ঘুরিয়ে ব্যাক গ্রাউন্ড করে ফটোগ্রাফ তোলা হল। মহারাজ রমেনবাবুকে বললেন-"বিশ্বভারতীর কলাভবনের গঙ্গাধারাটি রবীন্দ্র স্মৃতি বহন করিয়া কলিকাতার আর্ট স্কুলের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। গঙ্গাতীরেই আজকের ছবি তোলা গেল।"[৭]

১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে (১৯৩১খ্রীষ্টাব্দে) ২৫ শে বৈশাখ কলকাতার টাউন হলে বিশ্বকবির ৭০ তম জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যে শিল্প প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা হয়েছিল তার দারোদ্ঘাটন করার জন্য কলকাতার সুধিবৃন্দ মহারাজকে আমন্ত্রণ জানালে বীরবিক্রম সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, লিখিত ভাষণ তৈরী করেন এবং অনুষ্ঠানের পূর্বদিনে তাঁর লেখাটি কবিকে দেখাবার জন্য জোড়াসাঁকোতে কবির নিকট দূত মারফৎ প্রেরণ করেন। মহারাজের লেখা পড়ে কবি বিশেষ সন্তুষ্ট হন।[৮] মহারাজের লেখার মধ্যে উৎকৃষ্ট রচনা দেখেছিলেন বলেই কবি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দে (১৯৩৮খ্রীষ্টাব্দে) পুরীতে অবস্থান কালে পুরী রবীন্দ্র জয়ন্তি উৎসব অনুষ্ঠানেব উদ্‌বোধনের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে বীরবিক্রম উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন। সমুদ্র বেলাভূমিতে ক্লার্ক হল সভাগৃহে উক্ত অনুষ্ঠান হয়েছিল। ৪ঠা আষাঢ় অর্থাৎ ১৮ ই জুন তারিখে পুরী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও পুরী সঙ্গীত সম্মিলনী কর্তৃক পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহারাজের শুভাগমন উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আমন্ত্রিত প্রখ্যাত পন্ডিত ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহারাজের বিদ্যানুরাগ, দানলীলতা, আশ্রিত বাৎসল্য আর সর্বোপরি রবীন্দ্রানুরাগের বিশেষ উল্লেখ করে জয়ন্তী উৎসব উদ্‌বোধনের অনুরোধ জানালেন।[৯] এই ঘটনা প্রমাণ করে যে তাঁর কলা জ্ঞান ও কলাবিদপ্রীতি ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্য ও বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করে ভারতের অন্যান্য স্থানেও পৌঁছেছিল।

১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দে ২৫শে চৈত্র তারিখে কুমিল্লা শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বাবিংশ অধিবেশন উপলক্ষে কর্মকর্তাগণ বীরবিক্রমকে ঐ সম্মেলন উদ্বোধন করার আহ্বান জানান। সাহিত্যে তাঁর অধিকার না থাকলে কর্মকর্তাগণ কখনই তাঁকে ওখানে আমন্ত্রণ জানাতেন না। বস্তুতঃ তাঁর ভাষণটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের এক অপূর্ব কীর্তি। এই ভাষণের মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করেছেন যে সুধীবৃন্দ অযোগ্য ব্যক্তিকে উদ্বোধন করার জন্য আহ্বান করেন নি।

—" আজ যে গুরুভার আপনারা স্নেহপরবশ হইয়া আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন তাহা বহন করিবার শক্তি কিম্বা যোগ্যতা আমার নাই। আমি নিজে সাহিত্যিক নই কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং মমত্ববোধ বশতঃ সমগ্র বঙ্গদেশীয় সাহিত্যিকগণের সংশ্রবে আসিবার এই আহ্বানকে আমি অস্বীকার করিতে পারি নাই। অধিকন্তু আমার পরম ভক্তিভাজন স্বর্গত পিতা

পিতামহ, প্রপিতামহগণের বিপুল সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্য রসিকদের প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শনের কাহিনী এই গুরুভার বহন করিতেও আমাকে শক্তি ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছে।

সাহিত্য স্বপ্নকে রূপদান করে, কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করে এবং ভাবকে বিকশিত করে সাহিত্যও মৃত অতীতকে জীবন দান করে বর্তমানকে পরিচালিত ও সংগঠন করে এবং বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে সৃজন করে সাহিত্য জাতিকে অমরত্ব দান করে, তাই সাহিত্যের পূজাই গৌণ ভাবে অমরত্বের উপাসনা। সেই সাহিত্যের ঋত্বিক যাহারা, তাহারা জাতির নমস্য। আমি তাই আপনাদিগকে আন্তরিক সম্বর্ধনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। ....

বাংলার কৃষ্টি, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ত্রিপুর রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। কৃত্রিম ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য বৃহত্তর ত্রিপুরা তথা সমগ্র বাংলার প্রতি মমত্ব পোষণ করিয়া আসিতেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা আপনারা অবগত আছেন। তথাকার যাবতীয় সরকারী কার্য্য একান্তভাবে বাংলা ভাষায় পরিচালিত হইয়া থাকে। তথাকার শিলালিপি , তাম্রলিপি, অনুশাসন, মুদ্রা,মোহর প্রভৃতিতে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বাংলা সাহিত্য অধুনা পূর্বাপেক্ষা অনেকই ব্যাপকতার পথে অগ্রসর হইতেছে। আজ দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান সঙ্গীত প্রভৃতি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আমাদের সম্মুখে বহু দীর্ঘ পথ রহিয়াছে, বর্তমানে জগতে মানবের বহুমুখী চিন্তাধারা এখন আর অল্পে সন্তোষ্ট নহে। সাহিত্যের আসরে সর্বপ্রকার চিন্তাধারাকে রূপ প্রদান করিয়া ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। আমাদের প্রগতিশীল মানবক্ষুধাকে উপযুক্ত খাদ্য প্রদান করিয়া শান্ত করিতে পারে এই প্রকারের বহুমুখী সাহিত্য সৃষ্টি আজ প্রয়োজন। .....

আমি আর আপনাদিগের মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করিতে চাইনা, আসুন ভাষা জননীকে বন্দনা পূর্বক মধুমাসে আমরা আজ সম্মেলনের এই শুভ উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী হই। ভগবান আমাদের সহায় হইবেন।''

এই ভাষণে বীরবিক্রমের গদ্যরচনার দক্ষতা বিশেষ করে লক্ষনীয়। গান কবিতা লিখে, নাটক রচনা করে তিনি যেমন সুনাম অর্জন করেছিলেন, গদ্য রচনা করলেও তেমনি সুনাম অর্জন করতেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

১৩৪৯ ত্রিপুরাব্দের ৫ই চৈত্র কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ত্রিপুরার শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন বীরবিক্রম। উদ্দেশ্য ছিল ত্রি পুরার সহজাত উত্তম শিল্পকর্ম সম্পর্কে প্রতিবেশী রাজ্য সমূহের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। [১১] শিল্পী হিসাবে শিল্পকার্য ভালবাসতেন বলেই বীরবিক্রম এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য এর পশ্চাতে বাণিজ্যিক ভাবনাও কাজ করেছিল কারণ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব শিল্পদ্রব্যের প্রচারে ও প্রসারে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা বীরবিক্রমই পরীক্ষা করেছিলেন কলকাতার মত বৃহৎ বাজারে। শিল্পীকে সম্মান জানান যে প্রশাসনের কর্তব্য, যা আজ শিল্পীদের দক্ষতার ভিত্তিতে ভারত সরকার আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানে দেখা যায়, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এরূপ সম্মান জানাবার প্রথা বীরবিক্রমই সূচনা করেছিলেন। কোলকাতার প্রদর্শনীতে কর্মবীর অবিনাশ সেনকে সম্মান ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে বীরবিক্রম বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরার কলাকুশলীদের আনয়নের চেষ্টা করেন।

- ঃ তথ্যনির্দেশ ঃ-

১। চৌধুরী বিকচ ঃ রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা , আগরতলা ২০০১ পৃঃ ৯৩ দত্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ঃ সুরের ঝর্ণাতলে, ত্রিপুরা প্রসঙ্গে, ১৯৭৫, পৃঃ ৮৭।

২। চৌধুরী বিকচ ঃ পূ. উ.পৃঃ ৯৪।

৩। ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মার নিকট আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পত্রাবলী, গোমতী, ১৯৭৪, প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, পৃ ঃ ৯।

৪। মেনন কে. ডি. (সম্পা) ঃ ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ার, পৃঃ৩৪২।

৫। Chowdhury N.R ঃ Tripura through Ages .p.60

৬। চৌধুরী বিকচ ঃ পূ. উ.পৃ ঃ ৯৩।

৭। চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পূ.উ পৃঃ১৪৪-৪৫।

৮। গ্রন্থের বীরবিক্রম ও রবীন্দ্রনাথ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৯। চট্টোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা পৃঃ১৫৪

১০। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন দত্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃঃ১০৭-১০৮

১১। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ ত্রিপুরার ইতিহাস পূ.উ.পৃঃ ১৯০।

বীর বিক্রম ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বীরবিক্রমের আমলেই (১৯২৩ -১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য পার্বত্য ত্রিপুরার শাসকরূপে রাজ্যের অভ্যন্তবে ও রাজ্যের বাইরে ত্রিপুরার জমিদারীতে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে তাঁকে। একদিকে ব্রিটিশ সরকারের বিরূপতা অর্জন না করা অপরদিকে প্রজাদের না চটান, এই দু-মুখোনীতি নিয়ে তাঁকে পরিচালনা করতে হয়েছে রাজ্য প্রশাসন। সে সময়কার মূখ্য ঘটনাবলী এবং ঐ সব ঘটনাবলী প্রতিক্রিয়া, রাজ্য প্রশাসনের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা আলোচনার বিষয়বস্তু।

ব্রিটিশ জেলা ত্রিপুরা ত্রিপুরা রাজ্যের জমিদারীব অন্তর্গত। ১৯৩১খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার সদর কুমিল্লাতে ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ত্রিপুরা রাজ্যের এক্স অফিসিও পলিটিক্যাল এজেন্ট বিপ্লবীদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। ত্রিপুরা দরবার তৎক্ষণাৎ-এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে এবং মৃতের আত্মার সদ্গতির প্রত্যাশায় রাজ্যের অফিস, আদালত স্কুল প্রভৃতি ৩দিনের ছুটি ঘোষণা করে।[১] ছাত্রসংঘ নামে একটি বিপ্লবী দলের গোপন কার্যালয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই দল বঙ্গীয় অনুশীলন সমিতির সমর্থক। এই ছাত্রসংঘ দেহচর্চার জন্য সরকারী সাহায্য পুষ্ট ছিল।[২] কিছুদিন পরে ছাত্রসংঘ বিভক্ত হয়ে যায় এবং কিছু সভ্য ভাতসংঘ তৈরী করে। তারা বঙ্গীয় অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর বিপ্লবী সংস্থার সমর্থক ছিল। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষুদ্র সংগঠন গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন স্থানে যেমন মিলন সংঘ, মাতৃসংঘ ইত্যাদি।[৩] এই সমস্ত দলগুলির উপর অনুশীলন সমিতি ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বিপ্লবীদের প্রভাব খুব বেশী পড়েছিল। যার ফলে অনুন্নত শ্রেণীর লোকজন এবং মহিলারাও গোপনে বিপ্লবাত্মক কাজে অংশ গ্রহণ করত। ভ্রাতৃ সংঘ এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে চৈত্র (১৩৪২ ত্রিপুরাব্দে) ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটির নিকটে অবস্থিত একটি বন্ধকী সুদের কারবারীর দোকানে ডাকাতি ঘটে। ডাকাতগণ নগদ অর্থ ও গহনাদি নিয়ে যায়। অনুশীলন সমিতির ঢাকা শাখার সতীশ পাকড়াশীর ৫ জন অনুগামী বিপ্লবী

এই ডাকাতি করে। তিন জন ধরা পড়ে এবং বিশেষ ট্রাইবুনালে তাদের বিচার হয়। ব্রিটিশ সরকার তাদের বিচার কার্য কুমিল্লাতে সম্পন্ন করতে চায় যেহেতু বিবাদীরা ব্রিটিশ প্রজা কিন্তু বীরবিক্রম রাজী হননি কারণ ঘটনা ঘটেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। কারাবাস শেষ হলে তাদের ব্রিটিশ ভারতে ফেরৎ পাঠান হয়েছিল।[৬] এই ডাকাতির তিন বিপ্লবীরা হচ্ছেন ধরখড়, কসবা নিবাসী শচীন্দ্র চন্দ্র দত্ত, কুমিল্লা নিবাসী পবিত্র পাল এবং টঙ্গীবাড়ী, দূতশাহী নিবাসী কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী। পুলিসের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পরে তাঁরা ধৃত হন। বিচারে কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তীর ৯ বৎসরের এবং অপর দুইজনের ৭ বৎসরের কারাদণ্ড হয়েছিল।[৭] অন্যস্থানেও এরূপ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। তিনসুকিয়া মেইলে ডাকাতির অস্ত্র জনৈক মিলন সংঘের সদস্য রাজ পরিবারের এক সদস্যের নিকট থেকে চুবি করেছিল এবং রাজকীয় অস্ত্রাগাব থেকেও কিছু রিভলভার ও রাইফেল লোপাট করা হয়েছিল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনকারীদের একটি গোপন পত্র ত্রিপুরাতে আসে। পত্রখানা হায়দ্রাবাদ ও মহীশুর রাজ্যের লোকদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। এই পত্রে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করতে এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করতে আহ্বান জানান হয়েছিল। এই পত্রের প্রভাব ত্রিপুরা রাজ্যে পড়ে এবং বিপ্লবীরা সাধারণ লোকেদের ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করতে আবেদন করে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পলিটিক্যাল এজেন্ট জানায় যে সোনামুড়া বিভাগে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছে, গণ বন্ধ (Strike) হচ্ছে। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন শুরু হয়েছে, এবং কোন কোন স্থানে সশস্ত্র হিংসামূলক আন্দোলন শুরু হয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে ডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ঠাকুর ললিত দেববর্মা, উকিল আনন্দ পাল এবং অন্যান্য অনেকে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে।[৮] ফলে ধরপাকড় শুরু করা হয় এবং সন্দেহভাজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জেলে পোরা হয়, কিছু লোককে Detention Camp-এ রাখা হয়, কিছু লোকেদের অন্তরীণ (intern) করা হয় রাজনৈতিক আটক বন্দী (detenue) হিসেবে, যারা ব্রিটিশ ভারতে পালিয়ে গেছিলেন তাঁদের ধরা হয় এবং কিছু সংখ্যককে আন্দামানে দ্বীপান্তর করা হয়।[৮] ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাংলা সরকার অভিযোগ করেন যে বীরবিক্রমের আত্মজন অরুণ কর্তার একটি রাজনৈতিক এবং সাধারণ অপরাধীদের দল আছে। তার ব্রিটিশ ভারতে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালায়। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে যে তারা মহারাজার অস্ত্রাগারের বন্দুক ধার করে ব্যবহার করছে। পলিটিক্যাল এজেন্ট দুর্বত্তদের ধরবার জন্য রাজ্য পুলিশ বিভাগের সহায়তা চায়।[৯] ১৯৩২খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পলিটিক্যাল এজেন্ট জানায় যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কিছু বিদ্রোহী ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে আছে। অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীরাও রাজ্যে লুকিয়ে আছে। দেওয়ানকে অনুরোধ করা হয় পার্বত্য সর্দারদের নির্দেশ দিতে যাতে তারা এরূপ সন্দেহ ভাজন লোক দেখলেই সপ্তাহান্তিক রিপোর্টে জানায়।[১০] দেওয়ানকে সরাসরি অনুরোধ জানানো ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের শক্তি প্রদর্শন বলে বিবেচিত হতে পারে। ব্রিটিশ সরকারের এরূপ চাপে ত্রিপরা দরবার বাধ্য হয়ে ঠাকুরদের নিয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সভা করে এরূপ সন্ত্রাসের নিন্দা করে। স্থির করা হয় এসব সন্ত্রাসের বিরোধীতার জন্য ঠাকুর যুবকদের নিয়ে একটি ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা হবে। সভাতে গৃহিত প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি বাংলা সরকারের নিকট পাঠান হয়।[১১]

সাধারণ লোকের নিকটে মহারাজার ব্যবহার ও কাজ অপ্রত্যাশিত হলেও এটা বিবেচনা করতে হবে যে মহারাজার নিকটে দু-কুল রক্ষা করার জন্য অন্য কোন উপায় ছিল কিনা।

(ক) ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহের দৃষ্টি থেকে পরিবারের লোকজনদের রক্ষা করা কেন না ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খুবই তাড়া দিচ্ছিল। (খ) সে সময়ে বীরবিক্রম রাজ্যের আর্থিক অবস্থা পুণর্গঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকটে সহজ সুদে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণে চেয়েছিলেন। বাংলা সরকার উক্ত আবেদনের উপর ৯ লক্ষ টাকা দিতে সুপারিশ করে ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করলে ভাইসরয় রাজী হননি, ফলে সেই উদ্যোগ বাতিল হয়ে যায়। এর অব্যবহিত পরেই পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবিভাগের কমাণ্ডার জেনারেল ম্যাকমুলানের সেনা বিভাগের কমাণ্ডার ইন চিফ্‌কে লেখা একটি পত্রের বিষয়বস্তু ভাইসরয়ের গোচরে আসে। ঐ পত্রে জেনারেল ম্যাকমুলান জানান যে উপরোক্ত ধার না দেবার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম বন্ধ করার প্রক্রিয়াতে সহায়তা করতে অসুবিধা হচ্ছে কারণ চট্টগ্রাম বা অন্যান্য অঞ্চলে রাজ্যসীমার লাগোয়া অঞ্চলেই সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বেশী ঘটছে। ভাইসরয় রাজ্যের আবেদন পুর্নবিবেচনা করে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম দমন করার জন্য ৯ লক্ষ টাকার ঋণ অনুমোদন করেন।[১২] এভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সর্বদাই ত্রিপুরাকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আগরতলাস্থ পলিটিক্যাল এজেন্টের বাংলা হস্তান্তর নিয়েও এরূপ প্রশ্ন উঠে এবং সেক্ষেত্রেও ভারত সরকারের ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয়।

১৯৩৬ -৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি পাবার পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন প্রকাশ্য, পূর্বেকার ন্যায় গোপন আন্দোলন নয়। সূচনা যদিও উহা একেবারে রাজ্যভিত্তিক ঘরোয়া আন্দোলন বলে মনে করা যেতে পারে কিন্তু ক্রমশঃ এই আন্দোলন জাতীয় মূল আন্দোলনের স্রোতে মিশে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের Govt of India Act. এর ফলে ভারতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনেব জোয়ার আসে এবং সেই জোয়ারে ত্রিপুরাও ভেসে যায়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয় ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদ।[১৩] শচীন্দ্র লাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, উমেশ লাল সিংহ, আশু মুখার্জী, হরিগঙ্গা বসাক, শান্তি দাশগুপ্ত প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এই সংগঠন গঠন করেন এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করেন। গণপরিষদ ২০ দফা দাবী পেশ করে কার্যকলাপ সূচনা করে। দাবীগুলির মধ্যে তৈথুংপ্রথা বিলোপ, কিছু সামন্ততান্ত্রিক কর বিলোপ যেমন ঘরচুক্তি, ঘাসুরীকর প্রভৃতি, সমস্ত রাজনৈতিক কাজকর্মের উপর থেকে নিষেধজ্ঞা প্রত্যাহার, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারা কৃষকদের সংগঠিত করে এবং ধ্বনি তোলে চাষীর জন্য জমি চাই (Land for tillers), জুমচাষীদের জমি চাই, ভূমিহীন চাষীদের জমি চাই ইত্যাদি। তাদের আন্দোলন জনমানসে সাড়া জাগায় এবং আন্দোলন ক্রমে জোরদার হতে থাকে।[১৪] আগরতলার রামনগর গ্রাম থেকে পাঁচশত মুসলমান পরিবারকে উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে গণপরিষদ আন্দোলন করে। কিন্তু তাদের ঐ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল কেন না উচ্ছেদিত ঐ সব পরিবার রাজ সরকারের নিকট থেকে কাণি প্রতি জমির জন্য ৯০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ কবেছিল।[১৫] ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উমাকান্ত একাডেমী ও তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রছাত্রী তাদের স্কুলের সামনে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করে। তাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল শচীন্দ্র লাল সিংহকে এক বৎসরের জন্য রাজ্য থেকে বহিস্কার করা হয়

এক ঘোষণা দ্বারা ঃ "Where as it appears that ex detenue Sachindra lal Singha, son of Dindayal Singha of Agartala, has for some time past been making seditious and inflamatory speeches in different parts of the state which are calculated to promote dissatisfaction, harted and ill will among the people against the Government of the State and where as it is neassary to put a stop to his mischivious activities in the state, It is hereby ordered that the said Sachindra lal Singha be externed from the state for a period of one year for the present."[১৬] আরও কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ৬ মাসের জন্য রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল।

রাজ্য থেকে বহিস্কৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রাজ্যের সীমার নিকবর্তী চাকলা রোশনাবাদে বিভিন্ন সভা সমিতি করতে থাকে। তাঁরা সে সময়ে রোশনাবাদের প্রজাদের নিয়ে ঘাসুরী কর অব্যাহতি আন্দোলনের সূচনা করে। প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজাকে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জঙ্গলে গরুমোষ চড়াবার জন্য বৎসরে ৮ আনা করে ঘাসুরী কর দিতে হত। এই আন্দোলনে প্রায় ৪ হাজার লোক উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে সমবেত হয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে দাবী জানায়। কিন্তু তাদের দাবী পূরণ করা হয়নি এবং আন্দোলন ও ফলপ্রসু হয়নি। বরঞ্চ সীমান্ত বক্তৃতা সভা সমাবেশ করে উত্তেজনা ছড়াবার অভিযোগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিসের হস্তে সমর্পন করে। রাজ সরকার তাঁদের আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিনা বিচারে আবদ্ধ রাখে। শচীন্দ্র লাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, উমেশলাল সিংহ, আশু মুখার্জী ও অন্যান্যদের এভাবেই কারাবাস ঘটে। বীরেন দত্তকেও ঐ সময়ে গ্রেপ্তার করে কারাবদ্ধ করা হয়েছিল। রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। রাজ্যের খবর বাইরে পাঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু আন্দোলন ক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বহু স্ত্রী-পুরুষ আন্দোলনে যোগ দেয়। প্রশাসন যত কড়া মনোভাব গ্রহণ করতে থাকে, আন্দোলনও ততবেশী জোরদার হতে থাকে জনপ্রিয় সরকার গঠনের দাবীতে। রাজ্য গণ পরিষদ All India State Peoples Conference-এর সংস্থা। এই সংস্থার সদস্যগণ রাজ্যের চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে যদিও তাঁদের বাগানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।[১৭] আগরতলার হরিজনরাও এই আন্দোলন সমর্থন করে। অন্যান্য সংস্থাও যেমন ত্রিপুরা রাজ্য জন মঙ্গল সমিতি, হিতসাধনী সভা প্রভৃতিও দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবী জানায় মহারাজার রক্ষণাবেক্ষনে (aegis)। এই আন্দোলন ক্রমশঃ চাকলা রোশনাবাদেও ছড়িয়ে পড়ে।

চাকলা রোশনাবাদের কৃষকদের ঘাসুরী ও দা-চুক্তি কর প্রদান ব্যতীত ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বীরবিক্রম তাদের খুশী করার জন্য ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চাকলারোশনাবাদ প্রজা সম্মেলন করেছিলেন এবং বকেয়া তিন বছরের খাজনা মাপ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু চাকলার প্রজাগণ তাদের নেতাদের মুক্তির দাবী করলে সম্মেলন তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেয়া হয়। এই প্রজা মণ্ডলী ত্রিপুরা রাজ্যগণ পরিষদে যোগদান করে এবং রাজ-প্রশাসনের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এই আন্দোলন এত দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে যে মহারাজা কিছু প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ খ্রীঃ প্রজামণ্ডল আইন পাশ

করেন। ঐ আইনে হিন্দু, মুসলমান ও ত্রিপুর ক্ষত্রিয়দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে নির্বাচন করার ব্যবস্থা করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলি ঐ সাম্প্রদায়িক বিভাজন অগ্রাহ্য করে এবং নির্বাচন বয়কট করে। ক্ষুব্ধ রাজ্য প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজ্যের নেতাদের ধৃত করে এবং রাজ্য থেকে বহিস্কার করে এবং অন্যান্যদের আবদ্ধ করে। ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হয়েছিল বীরেন দত্তের নেতৃত্বে। ১৯৩৬-৩৭ এর আন্দোলনের সময়ে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাবার পরে ত্রিপুরা রাজ্যগণ পরিষদ, ত্রিপুরা ষ্টেট কংগ্রেস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় যদিও রাজ্যে তখনও পর্যন্ত সরকারী ভাবে ত্রিপুরা ষ্টেট কংগ্রেস দল গঠিত হবার কোন ঘোষণা পাওয়া যায় না। অনেক রাজনৈতিক কর্মীদের ধরপাকড় করা হয়, অন্তরীণ করা হয় এবং অবশেষে বঙ্গদেশে জেলে পাঠান হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের গণ পরিষদের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ যোগাযোগের কোন সাক্ষ্য ঐ সময় পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ১৯৩৯খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার মালিকন্দাতে গান্ধীজির অবস্থান কালে ত্রিপুরার এক প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাদের সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সংগ্রাম চালাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতেই রাজ্যে মিটিং মিছিল করা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হয়। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ প্রভাব ফেলে। অসংখ্য লোক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে, কারাবরণ করে এবং রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২খ্রীষ্টাব্দে রাজ সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, সমস্ত রাজ্য ও জেলা কংগ্রেস কমিটি সমূহ বে-আইনী ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করে।[১৮] কারণ Indian Criminal Act. ২য় ভাগ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত হয়েছিল, তারই বলে রাজ সরকার এই ঘোষণা করে। রাজ্য জুড়ে অনেক ধরপাকড় করা হয় এবং ৫ জন ডেটিনিউকে বঙ্গদেশে বিদায় করা হয়। খবর পাওয়া যায় যে মহারাজার সেনাবাহিনীর কিছু লোক ও এই রাজনৈতিক ঝড়ের মোকাবেলায় অবাধ্য হয়েছিল।[১৯] ইতিমধ্যে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রিয়াং বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে যা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আন্দোলনকে বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত করে অত্যন্ত কঠোর ভাবে দমন করা হয়েছিল।

এই অবস্থা চলতে থাকে ১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের বে-আইনী সমাবেশ ও মিছিল শোভাযাত্রা বন্ধ করার অধিকার বলবৎ থাকে। রাজ্যের নেতৃবন্দ মুক্তি পান। ১৯৪০-৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর রাজ সরকারের অত্যাচার পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নজরে আসে। তিনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর বীরবিক্রম কিশোর এক পত্রে জানান "I am informed that many members of the Tripura Rajya Gana Parisad and the Tripura State Congress have for a long time been in prison without trial. Wheather they are prisoners of the

Bengal Government or Tripura State, I do not know. Further information has reached me that treatment of the prisoners is exceedingly bad and some of them have been suffering from serious illness.

Further I understand that since the begining of 1940, all meetings and processions and other demonstration have been banned in the state and that civil liberty of any kind does not exist" [20] পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে পণ্ডিত নেহেরু প্রকৃত সংবাদই পেয়েছিলেন এবং রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। জবাবে বীরবিক্রম কিশোর ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৫খ্রীষ্টাব্দে জানান-As regards the allegations before you I regreat to say that they are entirely gross misrepresentation of facts. Only 6 persons were in detention as security prisoners, some at the instance of the provincial Government and they were in British prison for most of the time before being transferred to the state. All of them except one whose case is under further examination have been released. So for I know treatment meted to the prisoners has always been in conformity with the prescribed rules and no case of maltreatment is in my knowledge. Regarding the ban on civil liberty, I am not aware of the imposition of any except a war time ban on the congress which has already been withdrawn besides usual permission required for holding of meeting etc of political nature."[২১] এখানে দেখা যাচ্ছে যে বীরবিক্রম ও নেহেরুকে সত্যি ঘটনা চেপে গিয়েছিলেন। রাজ্যের নেতৃবৃন্দের (গণ পরিষদ, জনমঙ্গল সমিতি) বিনা বিচারে আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা, সাধারণ নাগরিকদের উপর অত্যাচার ও বিনা বিচারে আটকের ঘটনা সমূহ তিনি চেপে গিয়েছিলেন। ১৯৪৫ খ্রীঃ গড়ে উঠেছিল আব্দুল বারিকের (গেদু মিঞার) আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়া। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল মুস্‌লমানদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রের অখণ্ডতার মান উন্নয়ন করা। তাঁরা বের করেছিলেন 'নব জাগরণ' নামক পত্রিকা যার সম্পাদক ছিলেন গুলাম নবী। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে "ত্রিপুরা রাজ্য মোসলেম প্রজা মজলিশ।" আরমান আলী মুনশী ও উদয়পুরের ফরিদ মিঞা ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান সংগঠক। প্রতিষ্ঠানগুলির নাম এ ক্ষত্রে উল্লেখ করা হল এজন্য যে গেদু মিঞার প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক সংগঠন হলেও বীরবিক্রমের পরবর্তীকালে রাজ্য রাজনীতিতেও এক সংকটাপন্ন কালে মাথা গলিয়েছিল।

১৯৪৫ সালেই গড়ে উঠেছিল রাজ্য জনশিক্ষা সমিতি। এডভাইসারী কমিটির সভাপতি হৃদয়রঞ্জন দেববর্মা, সহ সভাপতি ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মা, বীরেন দত্ত, অঘোর দেববর্মা, দশরথ দেববর্মা, নীলমণি দেববর্মা, সুধণ্য দেববর্মা প্রমুখ সমিতির সদস্যগণ রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে প্রাইমারী স্কুল বাড়ী গড়ে রাজ মন্ত্রী ব্রাউন সাহেবের সহায়তায় রাজার অনুমোদন লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সদস্যদের অনেকেই বামপন্থী রাজনীতির ধারক ও বাহক এবং পরবর্তীকালে তাঁরা প্রকাশ্যেই রাজনৈতিক নেতারূপে ত্রিপুরা - মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন।

১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে থেকেই ব্রিটিশ ত্রিপুরাজেলার সদর কুমিল্লা শহর থেকে সাম্যবাদের ধ্যান ধারণা পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে। উমাকান্ত একাডেমীর কতিপয় ছাত্রবৃন্দ একটি ক্ষুদ্র সংগঠন (cell) গঠন করে অন্য ছাত্রদের মার্ক্সীয় দর্শন শিক্ষনে সচেষ্ট হয়। বীরেন দত্ত, অনন্ত দে, প্রেমাশু চৌধুরী, নিমাই দেববর্মা, উষারঞ্জন দেববর্মা, শান্তি দত্ত, কানু সেন, নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তকে, রবি দত্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ ঐ (cell) এর সদস্য ছিলেন।[২২] একটি ক্ষুদ্র দল কুমিল্লা শহরে যায় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং পি. সি. যোশীর নেতৃত্বে কিশান সংগঠনের নির্বাচনের মিটিং এ যোগদান করে। যোশী তাদের ত্রিপুরায় ফিরে এসে বিভিন্ন সংগঠনের নামে ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ করতে নির্দেশ দেন। অঘোর দেববর্মা ও সুধণ্য দেববর্মা সে সময়কার দুইজন বিখ্যাত কর্মী ছিলেন।[২৩] ত্রিপুরা রাজ্য কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বীরবিক্রমের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে এবং সেজন্য ঐ পার্টি বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হল না।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল জন্মগ্রহণ করে। জন মঙ্গল সমিতির কিছু প্রাক্তন সদস্য, জনশিক্ষা সমিতির সদস্যগণ এবং কিছু স্বাধীন মতালম্বী ব্যক্তিদের নিয়ে এই মণ্ডল গড়ে উঠে। যোগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা উহার সভাপতি এবং বীরচন্দ্র দেববর্মা সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণের দ্বাবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা। বীরেন দত্ত ও সুধণ্য দেববর্মা ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডলের প্রতিনিধিরূপে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত প্রজামণ্ডলের অধিবেশনে যোগদান করেন। তারা 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' নামে একটি বুলেটিন প্রকাশ করতেন। ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদের দুইজন সদস্য ও ঐ অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন।[২৪] ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নিয়মতান্ত্রিক রূপে ত্রিপুরা রাজ্য রাজ্য কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়। যদিও ১৯৪০ সালেই রাজ্য কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল কিন্তু সে সময়ে তা পূর্ণ কার্যকরী ছিলনা। ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদ ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসে মিশে যায়। শচীন্দ্র লাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, উমেশ লাল সিংহ, শান্তি দাশগুপ্ত, হরিগঙ্গা বসাক, তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শচীন্দ্রলাল সিংহকে সভাপতি ও উমেশ লাল সিংহকে সম্পাদক পদে নির্বাচন করেন। উহা তখন আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি জেলা একক রূপে কাজ শুরু করে।[২৫] ১৯৪৬ খ্রীঃ মহাত্মাগান্ধীর নোয়াখালীতে অবস্থানকালে শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ, উমেশ লাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর অস্পৃশ্যতা বর্জন, চরকা আন্দোলন কার্যক্রমের উপর জোর দেন এবং রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবী জানান।

ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ইতিমধ্যে দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। বীরবিক্রম সচেতন শাসক হিসেবে ভবিষ্যতের গতি প্রকৃতি উপলব্ধি করে ব্রিটিশ ভজনার পরিমান ধীরে ধীরে কমিয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ভজনায় মনোনিবেশ করেন। অবশ্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও তখন ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা ও কূটনতিতে বিশেষ ব্যস্ত বলে এবং এ ব্যাপারে দেশীয় রাজন্যকুলের ভূমিকা নগন্য বিবেচনা করে তাদের প্রতি খুব একটা খর দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে গান্ধীজি নোয়াখালীতে এলে বীরবিক্রম কিশোর তাঁর পক্ষ থেকে সেক্রেটারীকে পাঠিয়ে গান্ধীজিকে ত্রিপুরায় পদার্পন করার আমন্ত্রন জানান।[২৬] এক্ষেত্রে বীরবিক্রমের মনোভাব পরিবর্তন লক্ষনীয়। গান্ধীজি অবশ্যই রাজার অনুরোধে ত্রিপুরা রাজ্যে আসেননি। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেই

Indian National Army-র দুইজন অফিসার দেবনাথ দাস ও হাসান রেশভী সহ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় আগরতলায় আসেন। রাজা তাঁদের শুভাগমনে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন সহকারে অভ্যর্থনা এবং তাঁদের সঙ্গে নিভৃত আলোচনাকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং সেই সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করেন।[১১]

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানীতে উপজাতিদের এক সম্মেলন করা হয়। এই সম্মেলনে 'ত্রিপুর সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রতিষ্ঠানকে বীরবিক্রম কিশোর স্বীকৃতি দেন এবং উহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল উপজাতিদের স্বার্থরক্ষা করা এবং ত্রিপুরা উপজাতিদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে বীরবিক্রম কিশোরের মৃত্যুর পরে বিশেষ করে ১৯৪৮খ্রীষ্টাব্দে কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হবার ফলে ত্রিপুর সংঘ রাজ্য রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা হারায় কারণ গণমুক্তি পরিষদ পার্বত্য অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের প্রভাব যথেষ্টরূপে প্রতিষ্টা করতে সমর্থ হয়েছিল।

বীরবিক্রমের কালে (১৯২৩-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সংগ্রামের প্রতি বীরবিক্রমের মনোভাব উপলব্ধি করতে হলে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা আবশ্যক।

(ক) ত্রিপুরা রাজ্যের তিনদিকে ব্রিটিশ জেলা ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও শ্রীহট্ট এবং ঐসব জেলার অধিবাসীবৃন্দ প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী এবং তারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ও অহিংস উভয় প্রকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। ঐ ব্রিটিশ জেলাগুলির অনেকাংশ ও ত্রিপুরা জেলার সর্বাংশ ত্রিপুরার রাজাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐসব অঞ্চলের প্রজাদের নিয়মিত দেয় করে রাজ্য প্রশাসন চলত। সুদীর্ঘকালব্যাপি রাজা প্রজার সম্পর্কে ফাটল ধরলে রাজ্যের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। তারা রাজনৈতিক কার্যকলাপ করে শাস্তি এড়াতে সীমান্ত অতিক্রম করে রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত এবং উল্টোদিকে রাজ্যের রাজনৈতিক কর্মীরাও ধরপাকড় এড়াতে জমিদারীতে প্রবেশ করত এবং সেখানকার লোকজনের সাহায্য পেত। এরূপ পরিস্থিতিতে উভয়স্থানের রাজনৈতিক কর্মীদের কাজকর্মের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বীরবিক্রম প্রজাদের অসন্তোষ্ট করতে চাইতেন না তাই হয়তো তাদের ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব নমনীয় ছিল। (খ) অপরদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রবল শক্তিশালী, তাদের নির্দেশ পালন না করা বা তাদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা ত্রিপুরার মত ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের পক্ষে অসম্ভব। তাই যথা সম্ভব তাদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে তাদের তোষামোদ করে বীরবিক্রম নিজ স্বার্থ সিদ্ধির পথ খুঁজে ছিলেন। (গ) রাজ্যের অভ্যন্তরে কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে তাঁর নিজের কিছু কিছু আত্মীয় স্বজন, কিছু কিছু সরকারী পদাধিকারী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কাজ করত এবং সংগ্রামীদের সাহায্য ও উৎসাহ জোগাত। নিজের আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারে অভিযোগ ব্রিটিশ পক্ষ থেকেই এসেছিল। নিজের আত্মীয়দের রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় তাঁর হস্তে ছিল না কারণ ব্রিটিশরা ক্রমেই রাজ্য শাসনে হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করেছিল। (ঘ) একেবারে শেষের দিকে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাবতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কূটনৈতিক

তৎপরতা শুরু হবার ফলে বাস্তববাদী বীরবিক্রম কিশোর উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের কূটনীতিতে দেশীয় রাজণ্যবর্গের ভূমিকা নগন্য। ব্রিটিশদের মূল লক্ষ্য তখন সাম্রাজ্য সংরক্ষণ নয়, সাম্রাজ্য বিভাজন করে চিরস্থায়ী বিবাদের সূচনা করা। বীরবিক্রম সেজন্য ব্রিটিশদের তোয়াজ করা ক্রমে কমিয়ে নিরপেক্ষ থাকার ভান করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগোযোগ করতে শুরু করেন ভবিষ্যতে ত্রিপুরা রাজ্যকে সুরক্ষিত করার অভিপ্রায়ে। ১৯৪০খ্রীঃ ভারতীয় ইউনিয়ানে যোগদানের যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন তারই প্রস্তুতি শুরু করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে নিজ অভিমত জ্ঞাপন করেন। প্রস্তুতি হিসাবে গিরিজা শঙ্কর গুহকে ভারতের সংবিধান রচনা পরিষদের সদস্য রূপে মনোনীত করে ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে পাঠান। (ঙ) একেবারে ব্যক্তিগতভাবে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা দলের প্রতি বীরবিক্রম কিশোর প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়েছিলেন এমন সাক্ষ্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। উপজাতি স্বার্থ রক্ষার্থে তার নিজ দল গঠন ও তাঁর মৃত্যুর পরে অকর্মন্য হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় যদিও ঐ সংগঠন সর্ব-উপজাতি মিলে তৈরী করেছিল এমন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

তথ্যনির্দেশ

১। Sur, H. K — British Relation with the state of Tripura, Agartala 1986, P. 175
: T. S A R : 1931-32, P.5

২। বসু সত্যরঞ্জন ঃ ত্রিপুরার বিপ্লবীদের স্মৃতি, ত্রিপুরার কথা, ১৪ই আগস্ট, ১৯৫৭ পৃঃ ৫।

৩। ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিকথা, নাগরিক, ২৩শে জুলাই, ১৯৬৩ খৃঃ পৃঃ ৩।

৪। Sen Tripura Chandra : Tripura in transition, Agartala, 1970, P. P. 57-58

৫। Menon K D (Ed.) . Tripura District Gazether, Agartala. P, 124 G. K. M. K. : Vigilence Dept 1932, Bundle 52, Sl. No. 17

৬। Menon K. D. (Ed.) : Abid, 124

৭। Sur. H. K. : Op. cit. P. 176

৮। Menon K. D. (Ed.) : OP. cit. P. 125

৯। Sur. H. K. : OP. cit. P. 176-177

১০। Sur H. K. :· Abid, P. 177

১১। Agartala Secretariate. Pol. B. 6. Confedential file no. 2. P. P. 50, 68 75, 85, 94

১২। Sur H. K. : Abid P. P. 178, 179

১৩। Sur H. K. : OP. cit. P. 180

১৪। Memon K. D : OP. cit. P. 125

১৫। Sen Tnpura OP cit P 22

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন : গেজেট সংকলন, পূ উ. পৃঃ ১৫৩

১৭। Sen Tnpura OP cit P 22

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন : গেজেট সংকলন, পূ উ পৃঃ ১৬৫

১৯। Memon K D OP cit P 127 quoted from Singh S L P 6

২০। Agarta la Secretariate B 52 S-9 Detention of members of T C C and ban on congress processions and mestings as quoted by H K Sur at P 211

২১। Agartala Secretariate B 52 S-9 on the above subject as quoted by H K Sur at P 217

২২। Choudhury N R Tripura through Ages, Agartala, 1983 P 76

২৩। Sen Tripura OP cit P 84

২৪। Choudhury N R OP cit P 76

২৫। Abid OP cit PP 77

২৬। Sen Tripura OP cit PP 25, 70

২৭। Sur H K OP cit P 182

বীরবিক্রম ঃ চন্দ্র-বংশী ক্ষত্রিয়

ত্রিপুরার রাজাগণ নিজেদের হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় পুরাণখ্যাত বিখ্যাত নৃপতি যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুর বংশধর বলে মনে করতেন। নিজেদের বিশ্বাস তাঁরা রাজকীয় ঘোষণা, দলিল পত্রাদি, মন্দিরের শিলালিপি প্রভৃতিতে উল্লেখ করতেন তা ত্রিপুরাব ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ১৩৮০ শকাব্দে মহামাণিক্যেব ঘোষণায় চন্দ্রবংশের উল্লেখ পাই প্রথমে[১] আর শেষ উল্লেখ দেখতে পাই এই বংশের কার্যত শেষ নৃপতি স্যার বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের ঘোষণাতে ও।[২] যদিও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ, পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিদগন তাঁদেব এই দাবী নসাৎ করেছেন কারণ তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছেন ত্রিপুরার রাজাগণ ইন্দোমঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভারতের পূর্বাঞ্চলের ভারতীয়করণ সম্পন্ন হয়েছে ব্রাহ্মন্য ধর্মের আত্মসাৎ এর ফলে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে মহামাণিক্যের কালে। সেজন্যই ১৩৮০ শকাব্দের ঘোষণাতে ত্রিপুরা রাজ নিজেকে চন্দ্রবংশজ যযাতির বংশধর বলে দাবী করেছেন, যেমন হয়েছে কোচবিহারে শিব বংশজাত রাজা, অসমে ইন্দ্র বংশজাত রাজা, মণিপুরে মহাভারত খ্যাত পাণ্ডু পুত্র অর্জুনের বংশজাত রাজা ইত্যাদি। কিন্তু ত্রিপুরার রাজগণ পণ্ডিতদের অভিমতে দমে যান নি। প্রাচীন যুগের কথা অনৈতিহাসিক ধরলেও ১৩৮০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন দণ্ড একই বংশের ব্যক্তিদের হাতে ছিল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত যখন বীরবিক্রম পরলোক গমন করেন যা ভারতের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। পণ্ডিতদের মত মান্য করেও যদি ধরে নেয়া যায় যে ত্রিপুরার রাজারা যযাতির বংশজাত ক্ষত্রিয় তাহলে তাঁরা ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে উত্তর ও মধ্যভারতে অবস্থিত তাঁদের ক্ষত্রিয় আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি কেন? উত্তরে বলা যায় যোগাযোগের অন্যতম সূত্র বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন সেকালে রাস্তাঘাটের অপ্রতুলতা ও ভারতের এক প্রান্তে জঙ্গলময় পার্বত্য রাজ্যে বাস করে তা সম্ভব ছিল না। সেজন্য তাঁরা নিজেদের বা ত্রিপুরী জাতীয় আদিবাসী সম্প্রদায় থেকেই কন্যা নির্বাচন করে, নিজেদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রেখে, তাঁকে বিবাহ করে রাণীর সম্মান দিয়ে নিজেদের বংশধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। যেমন অমর মাণিক্য রাজা, রাণী পার্বত্য রমনী অমরাবতী।[৩] এভাবেই চলে আসছিল দীর্ঘকাল। ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় ২য় রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৭৮৫-১৮০৪ খ্রীঃ) পূর্বাঞ্চলীয় নব্য ক্ষত্রিয়দের মধ্যে

মণিপুরে রাজা ও প্রজা একসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাচরণের ফলে তারা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ লাভ করে। রাজধর মাণিক্য মণিপুরের রাজা রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রের কন্যা হরিশেশ্বরীকে বিবাহ করে এক নতুন সংস্কৃতির পত্তন করেন।[৩] তারপর থেকে ত্রিপুরা রাজ অন্তঃপুরে নব্য ক্ষত্রিয় আসাম ও মণিপুরের রাজ কন্যাগণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ মণিপুরী কন্যাগণ ও রাজবধূ হয়ে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে এবং একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করে। নব্য ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে ত্রিপুবার এই যোগাযোগ রাধাকিশোর মাণিক্য অবধি চলতে থাকে। বস্তুতঃ রাধাকিশোর মাণিক্য হচ্ছেন ত্রিপুরার প্রথম রাজা যার মাতা মণিপুরী কন্যা রাজেশ্বরী দেবী।[৪] এভাবে তাঁরা নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় রাখলেও কিন্তু তাঁরা উত্তর পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের স্বীকৃতি পান নি। রাধাকিশোরের পিতা বীরচন্দ্র মাণিক্য জাতি আন্দোলনের সূচনা করে নিজেদের এবং পঞ্চ ত্রিপুরীদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকৃতি বঙ্গদেশীয় লোকদের কাছে থেকে আদায় কবতে ব্যর্থ হন।[৫] বীবচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচিতির ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বীরচন্দ্রের ভদ্রতা, সহৃদয়তা এবং সৌজন্যমূলক ব্যবহার বালক কবিকে এতই মুগ্ধ করে যে কবি বলেছেন -" আমি অভিজাত বংশের মহিমার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম।"[৬] রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ক্রমে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যেই তৎকালীন খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ রাধাকিশোরের নিরভিমানতা ও গুণগ্রাহীতায় আকৃষ্ট হলেন। রাধাকিশোর আজীবন আশুতোষ চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাটোরের জগদীন্দ্র নাথ, ঠাকুরবাড়ীর সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, লর্ড সিংহ, বাজেন্দ্র লাল মিত্র, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, দ্বারকা নাথ চক্রবর্তী ও বহু সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গ ও পরিপোষণ লাভ করেছিলেন। "ইহাদের সহায়তায় নানা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা তাঁহার সৌজন্যে বঙ্গ হৃদয় জয় করিলেন, ত্রিপুরার খ্যাতি চাবিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।"[৭] রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজাগণ ইন্দোমঙ্গোলীয় কি বাঙালী বিচার করেন নি, তাঁদের ব্যবহারেই তাঁদের ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তার প্রমাণ রাধাকিশোরের পুত্র ব্রজেন্দ্র কিশোরকে (লালু কর্তা) লেখা তাঁর পত্র -"বৎস তুমি ক্ষত্রিয়, তাহা কদাপি বিস্মৃত হইয়ো না .... ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে - দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়া শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি।"[৮] রাধাকিশোর নিজে চন্দ্রবংশ জাত ক্ষত্রিয়ত্বের স্বাভিমানে পরিপূর্ণ ছিলেন। তাঁর একান্ত সচিব ও সুহৃদ কর্ণেল মহিমচন্দ্রও ছিলেন একই ধারণার পথিক। ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কাজে মহিমচন্দ্রের নিযুক্তির ফলে, ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজে নিজেদের অবস্থান, মর্যাদা ও খ্যাতির প্রকৃত স্বরূপ তিনি বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে রাজা এবং মহিমচন্দ্র নিজেদের সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপায়িত করতে পূর্ণ উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রবীন্দ্র সান্নিধ্য ত্রিপুরাকে করেছে বিখ্যাত, ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুরার অবস্থান ও ক্ষত্রিয়ত্বের অবদান উপলব্ধি করতে শুরু করেছে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গদেশের অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের প্রতিক্রিয়া মারফৎ। কূটনীতি বিশারদ রাধাকিশোর মহিমচন্দ্রের উদ্যোগে, নব্য ক্ষত্রিয় মণিপুরী রাজকন্যা ত্রিপুরার পাটরাণী করার প্রথা বাদ দিয়ে; নেপালী ক্ষত্রিয়, পূর্বতন উত্তরপ্রদেশবাসী, পদ্মজঙ্গ বাহাদুরের কন্যা প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরের এবং ঢোলপুরের ক্ষত্রিয় তালুকদারের কন্যার সঙ্গে ব্রজেন্দ্র কিশোরের বিবাহ দেন।[৯] এর ফলে ত্রিপুরীদের ক্ষত্রিয়ত্ব অনেক পাকা হল এবং জঙ্গদের স্বীকৃতির ফলে পরবর্তী কালে ত্রিপুরার রাজা আর কোন ত্রিপুরী বা

মণিপুরী রমনীকে ত্রিপুরার পাটরাণী রূপে গ্রহণ করেন নি। বিবাহে রবীন্দ্রনাথও সাদর নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কিন্তু পুত্রের অসুস্থতার জন্য সশরীরে যোগ দিতে পারেন নি কিন্তু উপহার পাঠিয়ে নববধূকে আশীর্ব্বাদ ও স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।· তারপরেও বীরেন্দ্রকিশোর প্রভাবতী দেবীর ভগ্নী অরুন্ধুতি দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরের মাতৃদেবী এই নেপালী ক্ষত্রানী অরুন্ধুতী দেবী।

পিতা এবং পিতামহ ক্ষত্রিয়ত্ব পাকা করে গেলেও বীরবিক্রম ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের একবারে উপরের দিকে আরোহণ করার স্বপ্ন দেখতেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করতে যথেষ্ট চেষ্টা করে সফল হন। প্রপিতামহ বীবচন্দ্র প্রচেষ্টিত ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ গঠন করে রাজ্যের অভ্যন্তরে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি কবেন এবং নূতন নূতন উপজাতি সম্প্রদায়দের ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে রাজ্যে ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা বাড়াতে চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। শেষতম প্রচেষ্টা নিজের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ১১ই আশ্বিন ১৩৫৬ ত্রিং সনের ঘোষণা, যার দ্বারা তিনি নোয়াতিয়া সম্প্রদায়কে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজে অন্তর্ভূক্ত করেন।·· পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বীরবিক্রম মহারাজের প্রথমা মহারাণী লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী বলরামপুরের ক্ষত্রানী এবং দ্বিতীয়া মহারাণী হচ্ছেন মধ্যপ্রদেশের পান্না রাজ্যের ক্ষত্রাণী কাঞ্চনপ্রভা। নিজে উত্তর ও মধ্যভারতে দ্বার পরিগ্রহ করে যেমন সে সব এলাকাব প্রাচীন ক্ষত্রিয়দেব নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছেন তেমনি ভগ্নী এবং অন্যান্য আত্মীয় কন্যাদের উত্তর ও মধ্যভারতের ক্ষত্রিয় রাজকুলের বধূ রূপে স্থাপন কবতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতায় সুশিক্ষিত বীরবিক্রম চা-চক্র কূটনীতি ব্যবহারও প্রয়োগ করেন। ভারতীয় রাজন্য বর্গদের এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের চা পানে ও ভোজনে আপ্যায়িত করতে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের কি পরিমান অর্থ ব্যয় কবেছিলেন তার হিসাব আমরা জানিনা তবে নিম্ন তালিকা থেকে তা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত এই চা-চক্র কূটনীতির (tea party politics) বর্ষ ধবে বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ -

১৯৩২ খ্রীঃ- ২৪শে থেকে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত দেশী রাজন্য মণ্ডলীর (Chambers of princes) মহাসম্মেলন বসে দিল্লীতে। বীরবিক্রম ঐ মহাসম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯৩৩ খ্রীঃ - নভেম্বর মাসে বীরবিক্রম কলিকাতা যান, সেখানে বাংলাব গভর্ণর, ভারতের ভাইসরয় এবং জার্মানীর রাজদূতের সঙ্গে দেখা করেন। সে সময়ে জার্মান জাহাজ Karlsruhe বিশ্ব পরিক্রমা করছিল। সেই জাহাজ কলিকাতায় বন্দরে এলে জার্মান রাজদূতের আমন্ত্রনে ৯ই ডিসেম্বর বীরবিক্রম জাহাজ পরিদর্শন করেন।

১৯৩৪ খ্রীঃ - মে জুন মাসে ত্রিপুরার রাজদম্পতির মুসৌরীতে অবস্থানকালে অনেক দেশীয় রাজন্যবর্গকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন। উপস্থিত নরেন্দ্র বর্গের মধ্যে কাপুর থালা, রাজপিপলা, ঢোলপুর, আলোয়ার, সরিলা, বংশী, চিঙ্গেরা প্রভৃতি স্থানের রাজাগণ উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই ৫ই ডিসেম্বর থেকে রাজা একমাস কলিকাতায় বাস করেন। সে সময়ে অনেক বড় বড় ভোজের আয়োজন করেন। ঐ সব ভোজে বাংলার গভর্ণর, ডেপুটি গভর্ণর, ভাইসরয়, আমেরিকা, ইটালী, জাপান, জার্মানী, ফরাসী প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রদূতগণ আমন্ত্রিত ছিলেন। এ ছাড়া খয়ড়াগড়, কাপুরথালা,

ময়ুরভঞ্জ, কোচবিহার, ত্রিবাঙ্কুর, পান্না, ঢোলপুর, ইন্দোর, ভূটান, জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের আমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করেন।

১৯৩৫ খ্রীঃ - ১৭ই মার্চ তারিখে কালিকাতার টিপারা হাউসে বিশাল ভোজে আমন্ত্রণ করলেন ময়ুরভঞ্জ, খয়ড়াগড়, বামরা, তালচর, খরসান, কবার্ধা, ধনকানেল, দশপল্লা, খন্দপাড়া, নীলগিরি প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজাদের। তাঁদের পরিতৃপ্তি সহকারে আপ্যায়ন করা হয়।

ঃ আগষ্ট মাসে (১৬ই ভাদ্র ১৩৪৫ ত্রিং) রাজা শিলং নগরে ত্রিপুরা ক্যাসেল এ আসামের গভর্ণরকে ভোজে আপ্যায়িত করেন।

ঃ ২১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় টিপারা হাউসে রাজা ভোজের আয়োজন করেন। অন্যান্য দেশীয় রাজাদের সঙ্গে বাংলার গভর্ণরকে ভোজে আপ্যায়িত করেন।

১৯৩৬ খ্রীঃ- শীতকালে রাজদম্পতি কলিকাতায় অবস্থানকালে ভোজের আয়োজন করেন। ঐ ভোজে ভাইসরয়, বাংলার গভর্ণর, অনেক দেশীয় রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন।

ঃ ১৮ই ডিসেম্বর জার্মান রাষ্ট্রদূত মহারাজকে এডলফ হিটলারের এক সুন্দর প্রতিকৃতি উপহার দেন।

ঃ ২৮শে-২৯শে ডিসেম্বর দিল্লীতে রাজন্য মণ্ডলীর এক সভা বসে। সভার উদ্দেশ্য ছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করবে কি না সে বিষয়ে আলোচনা বীরবিক্রম মন্ত্রী জ্যোতিষচন্দ্র সেনকে নিয়ে এ সভাতে যোগদান করেন।

১৯৩৭ খ্রীঃ- ২রা জানুয়ারী কলিকাতর টিপারা হাউসে মহারাজ দুই শতেরও বেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোজে আপ্যায়িত করেন। গোয়ালিয়ার ও কোচবিহারের রাজ পরিবার ঐ ভোজে আমন্ত্রিত ছিলেন।

ঃ ৬ই জানুয়ারী বাংলার গভর্ণরের প্রতিনিধি ত্রিপুরার রাজা কর্তৃক ভোজে আপ্যায়িত হন।

ঃ ৭ই জানুয়ারী বাংলায় গভর্ণরকে ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

ঃ ৮ই জানুয়ারী গোয়ালিয়র রাজাকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

ঃ ২৬শে অগ্রহায়ণ থেকে ২৮শে পৌষ ১৩৪৭ ত্রিং সনে রাজা কলিকাতায় অবস্থান করেছিলেন। সে সময়ে তিনি বিশাল ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অন্ততঃ ২৫০ জন আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। বিশিষ্ট অতিথিরা হচ্ছেন বরোদা, জয়পুর, পান্না, কোচবিহার, ভবনগর, বামরা, ময়ুরভঞ্জ, বোনাই, খন্দপাড়া, খয়ড়াগর, নীলগিরি, নয়াগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজ পরিবার এবং তৎসহ বাংলার গভর্ণর ও ভারতের নৌসেনাপতি।

১৯৩৮ খ্রীঃ- গ্রীষ্মকালে রাজপরিবার শিলং-এ অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে আসামের গভর্ণর ও উচ্চপদস্থ বহু রাজপুরুষদের মহাবাজা ভোজে আপ্যায়িত করেন। ২৫শে নভেম্বর বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত দেশীয় রাজন্যমণ্ডলীর সভায় যোগদান করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঃ ২৯ শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ক্ষত্রিয় মহাসভার অধিবেশন। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রূপে মহারাজা বীরবিক্রম সেই সভাতে বিশেষ অতিথি রূপে আমন্ত্রিত হন এবং অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষণে সকলকে অভিভূত করেন।

১৯৩৯ খ্রীঃ- ২৭শে জানুয়ারী ভাইসরয় এক পত্রযোগে প্রস্তাবিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিপুরা যোগদান করবে কিনা জানতে চাইলে বীরবিক্রম ইতিবাচক উত্তর দেন।

১৯৪০ খ্রীঃ- মে মাসে বীরবিক্রম পূর্বাঞ্চলীয় রাজন্য সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। মে ও জুন মাসে কলিকাতার টিপারা হাউসে ভারতীয় রাজন্য মণ্ডলীব বৈঠক বসেছিল।

ঃ ১৫ ই ডিসেম্বর কিরীট বিক্রমের যৌবরাজ্য অভিষেক উপলক্ষ্যে আগরতলায় পান্না, ঢোলপুর, ভবনগর, ময়ূরভঞ্জ, খয়ড়াগড়, শক্তি, বারিয়া, পাতিয়ালা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজপরিবার বিশেষ সম্মানিত অতিথিরূপে আগরতলায় সৎকৃত হয়েছিলেন।

১৯৪১ খ্রীঃ- জানুয়ারী মাসে পূর্বাঞ্চলীয় রাজন্যমণ্ডলীর বৈঠক কলিকাতায় টিপারা হাউসে অনুষ্ঠিত হয় এবং জুলাই মাসে ত্রিপুরা হাউসেই ভারতীয় রাজন্য সভার বৈঠক বসেছিল। ৪ঠা আগস্ট বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত রাজন্যসভার বৈঠকেও বীরবিক্রম যোগদান করেন।

১৯৪২ খ্রীঃ- ১২ই মার্চ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজন্য মণ্ডলীর সভায় রাজা যোগদান করেন।

ঃ সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের বৈঠকে বীরবিক্রম যোগদান করেন।

১৯৪৩ খ্রীঃ- ১৪ই নভেম্বর বাংলার গভর্ণরের আয়োজিত ভোজে বীরবিক্রম যোগদান করেন।

ঃ ২৫ শে নভেম্বর টিপারা হাউসে রাজা ভোজের আয়োজন করেন। সেই ভোজে বাংলার গভর্ণর সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

১৯৪৪ খ্রীঃ- ৬ই ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা হাউসে রাজা কর্তৃক প্রদত্ত ভোজে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

ঃ ১০ ই ফেব্রুয়ারী বাংলার গভর্ণর কর্তৃক প্রদত্ত ভোজে রাজা যোগদান করেন।

ঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাজা কর্তৃক প্রদত্ত ভোজে সেনাপতি অংশগ্রহণ করেন।

ঃ ১৪ ই নভেম্বর শিলং -এ ত্রিপুরা ক্যাসেল এ রাজা পাতিয়ালার সেনাবাহিনীকে ভোজে আপ্যায়িত করেন।

ঃ ১৫ ই নভেম্বর পাতিয়ালার সেনাবাহিনী কর্তৃক আয়োজিত ভোজে বীরবিক্রম আপ্যায়িত হন।

১৯৪৫ খ্রীঃ- ৫ই মে জার্মানী আত্মসমর্পন করে, মিত্র পক্ষ আনন্দিত, ২৯শে শিলং -এ ত্রিপুরা ক্যাসেল এ রাজা ভোজ দেন।

ঃ ২৫ শে জুলাই আসামের রাজ্যপাল রাজাকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন।

১৯৪৬ খ্রীঃ- ২৭শে জানুয়ারী কলিকাতার টিপারা হাউসে রাজা বিশাল ভোজের আয়োজন করেন। এই ভোজে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, ব্রিটিশ শাসকবর্গ ও সেনাপতিগণ আপ্যায়িত হন।

ঃ ২৯ শে জানুয়ারী কলিকাতা ক্লাবে আয়োজিত সরকারী ভোজে রাজা আমন্ত্রিত হন এবং অংশগ্রহণ করেন।

ঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলার গভর্ণর কর্তৃক আয়োজিত ভোজে বীরবিক্রম অংশগ্রহণ করেন।

ঃ মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে আয়োজিত বিজয় উৎসবে বীরবিক্রম যোগদান কবেন। G. B E. সম্মানপদ প্রাপ্ত হন।

ঃ ৯ই মার্চ ভাইসরয়ের আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

১৯৪৭ খ্রীঃ- ১৭ই মে বীরবিক্রম ইহলোক ত্যাগ কবেন।

বীরবিক্রম তাঁর চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয়ত্বের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ভারতীয় দেশীয় রাজণ্যবর্গের সঙ্গে মেলামেশা করে নিজেদের উন্নত মানসিকতা ও প্রাচুর্য্য দেখাতে চেষ্টা কবেন। আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করেন পান্না, বলরামপুর, জয়পুর, কোটলা, বাবিয়া, নেপাল, ভবনগর, উদয়পুর, প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয় রাজপরিবারের সঙ্গে যারা পূর্ব থেকেই ক্ষত্রিয় বলে মান্যতা পেত। তাঁদের আত্মীয় করার অর্থ তাঁদের স্বীকৃতি আদায় করা। এ কাজে তিনি সফল হযেছিলন। এজন্য তাঁকে চা-চক্র কূটনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল যার হিসেব আমরা জানি না। কিন্তু এত সুচতুরভাবে তিনি এই অর্থ ব্যয় করেছিলেন যে তিনি তাঁর নিকটাত্মীদের কাছ থেকে বা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ থেকে কোন বাধা পান নি। বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের ভজনা করার কালে তিনি ব্রিটিশদের বাদ দেন নি। ফলে বলা যেতে পারে এই কৌশলে তিনি ব্রিটিশদের মুখ বন্ধ করেছিলেন। এসব চা-চক্র, মেলামেশা, ঔদার্য্য প্রদর্শন প্রভৃতির বিনিময়ে তিনি ১৯৪০ খ্রীঃ পূর্বাঞ্চলীয় দেশীয় রাজ্য সমূহের রাজ্য মণ্ডলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর আমলের প্রত্যেক প্রশাসনিক বিবরণীতে তাঁকে চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় বলে প্রচার করা হয়েছে। বাজ্যে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের লোকেদের ক্ষত্রিয়করণ করে সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন নি যে কেবলমাত্র জাতে উঁচু ঘোষণা করলে কোন পিছিয়ে পরা সম্প্রদায়ের উন্নতি হতে পারে না যদি না তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা না হয়। জীবন যাত্রার মানের উন্নতি না হলে জাত ধুয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। এই কূটনৈতিক সংগ্রাম করে যে স্বীকৃতি তিনি আদায় করেছিলেন তা কতদিন টিকে ছিল? যে ধীশক্তির বলে বীরবিক্রম কাঙ্খিত সম্মান ও মর্যাদা আদায় করেছিলেন, ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রে যোগদানের ঘোষণা করে যে প্রজ্ঞাবোধ ও দূর দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, চন্দ্রবংশের মায়া মৃগের পেছনে ধাওয়া করা তাঁর কি সেই দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে? আধুনিক যুগে বাস করে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, আধুনিক উচ্চমনষ্ক লোকেদের সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করে, পৃথিবী পরিক্রমা করে তাঁর মনের গহনে সেই পূর্বজদের সংস্কার কি করে বেঁচে ছিল তা ভাবতে অবাক লাগে।

তার মৃত্যুর পরে তাঁরই নির্দেশিত পথে ত্রিপুরা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। অনগ্রসর ভারতীয়দের অগ্রসর করবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ভারতীয় জনগণের যে শ্রেণী বিভাগ করে

তাতে তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের তালিকা তৈরী করা হয়। এই শ্রেণীর নাগরিকদেব বিশেষ সুযোগ সুবিধা, শিক্ষা ক্ষেত্রে, চাকুরীর ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদান কবতে শুরু করলে ত্রিপুরার বাজন্য কুলের আত্মীয় স্বজন, পঞ্চ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সম্প্রদায সকলে এই স্বীকৃতি মান্য করে, চন্দ্রবংশ জাত ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ করে, সাধারণ উপজাতি তফশিলি রূপে সুযোগ সুবিধা ভোগ কবতে শুরু করে। এই চন্দ্র বংশ জাত ক্ষত্রিয়ত্বের কফিনে শেষ পেবেকটি ঠুকেন বীরবিক্রমের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কিরীট বিক্রম কিশোব যখন তিনি পূর্ব ত্রিপুরা তপশীলি উপজাতি সংবক্ষিত কেন্দ্র থেকে লোক সভার সদস্য পদে নির্বাচন প্রার্থী হন ১৯৬৭ সালে এবং নির্বাচিত ও হন। অর্থাৎ কিরীট বিক্রম নিজেই লিখিতভাবে জানিয়েছেন তিনি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত। এভাবেই চন্দ্র বংশের পূর্ণবাহুগ্রাস সম্পন্ন হয়। ত্রিপুরাব লোকের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ত্রিপুবাব রাজাদেব ভালবাসত, শ্রদ্ধা কবত। তারা কখনই চন্দ্রবংশ কি সূর্য বংশজাত ভেবে শ্রদ্ধা করেন নি যুগযুগান্ত ধরে। কাজেই বলা যেতে পারে বীরবিক্রম কিশোর-ই ত্রিপুরার শেষ চন্দ্র বংশী নৃপতি।

তথ্যনির্দেশ

১। ত্রিপুবা সরকার : বাজমালা পৃঃ ১

২। বন্দ্যোপাধ্যায সুপ্রসন্ন : গেজেট সংকলন, পৃঃ ১৭০

৩। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নাবাযণ : আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ বীরচন্দ্র মাণিক্য, ২০০৭ পৃঃ ৫৩।

৪। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নাবাযণ : রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা, আগরতলা ২০০১, পৃঃ ২১।

৫। সিংহ কৈলাস চন্দ্র : রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, পৃঃ উ পৃঃ ১৮৫।

৬। গঙ্গোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, ১৯৬১ পৃঃ ১৩।

৭। তদেব : ঐ, পৃঃ ২৪।

৮। তদেব : ঐ, পৃঃ ৩৩। প্রবাসী, আশ্বিন সংখ্যা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

৯। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ : আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য ২০০৫, পৃঃ ৩১।

১০। গঙ্গোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পৃঃ উ. পৃঃ ২১.

১১। গণ চৌধুরী জগদীশ : ত্রিপুরার ইতিহাস পৃঃ উ. পৃঃ ২০১